মার্টিন লুথার কিং নির্বাচিত রচনা

এ কথাটা কিং নিজে বুঝেছিলেন ও সবাইকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। একটা বিশেষ ঐতিহাসিক পটভূমিকায় তাঁর ভাবনাচিন্তা স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। এ যুগে সামাজিক দ্বন্দ্বের কয়েকটি প্রধান রূপ লক্ষ্য করা যায়। এক হল শ্রেণীদ্বন্দ্ব, মার্কসীয় চিন্তায় যেটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। পরাধীন দেশগুলিতে দেখা গেছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম। আরো আছে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের ভিতর বর্ণের ভিত্তিতে বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ। বর্ণের ভিত্তিতে সাম্যের জন্য যে সংগ্রাম তারই সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ছিল মার্টিন লুথার কিং-এর। এর সঙ্গে শ্রেণী সংগ্রামের এক জায়গায় একটা বড় পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যটা বুঝে নেওয়া দরকার।

শোষকশ্রেণীর বিনাশ চাই, এই কথাটা শ্রেণীসংগ্রামের প্রবক্তারা একদিন জোর দিয়ে বলেছিলেন। শোষকশ্রেণীর হৃদয়ের পরিবর্তন চাই, এমন কথা তাঁরা বলেন নি, বরং এটাকে তাঁদের অবাস্তব চিন্তা বলেই মনে হয়েছে। এবার বর্ণভিত্তিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে আসা যাক। কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের জন্য সাম্য চাই, ন্যায় চাই, একথা মানবহিতৈষীরা বলবেন। কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের বিনাশ চাই, এই রকম ধ্বনি সমর্থন-যোগ্য নয়। মার্কিন দেশে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গকে পাশাপাশি থাকতেই হবে। এক-পক্ষের বিনাশের দ্বারা নয়, বরং উভয়পক্ষের ভিতর পারস্পরিক সদিচ্ছার ভিত্তিতেই সেখানে নতুন সমাজগঠনের কাজ করতে হবে। মার্টিন লুথার কিং-এর অন্তর্দৃষ্টি এই বাস্তবেই প্রোথিত। এইখানে দাঁড়িয়েই তিনি গান্ধীর চিন্তার সেইসব মূল্যবান উপদেশ নতুন করে বুঝেছেন, সমগ্র মানবজাতির জন্য যার মূল্য অসীম।

গান্ধীর ধ্যানধারণার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যাকে বলা যেতে পারে স্থানীয় বা জাতীয় ঐতিহ্যে চিহ্নিত। ভিন্ন দেশে বা ভিন্ন ঐতিহ্যে সেসব গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। কিং-এর ভিতর দিয়ে আমরা স্থানীয়তা থেকে মুক্ত ভিন্ন এক গান্ধীকে পাই। আর এইভাবেই গান্ধী ও মার্টিন লুথার কিং উভয়েই হয়ে ওঠেন সারা বিশ্বের আত্মীয় ও সম্পদ।

অনুবাদের ভিতর দিয়ে কিং-এর ভাবনাচিন্তাকে এ দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার সার্থকতা এইখানেই।

পৃথিবীকে অন্যায় থেকে সহসা মুক্ত করা যাবে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রয়োজন, সংগ্রাম চলবে। কিন্তু কোনো সরল শ্রেণীদ্বন্দ্বের নিয়ম এখানে খাটবে না। সংগ্রাম চলছে এমন এক সমাজে যেখানে মানুষ বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত, যেখানে বর্ণে ধর্মে ভাষায় বিচ্ছিন্নতা অনপনেয়। গান্ধী ও মার্টিন লুথার কিং জানতেন যে, সংক্রামক ব্যাধির মতোই হিংসা সীমানা মেনে চলে না। এক প্রান্তের হিংসা অন্যপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে, এক রকমের হিংসা অন্যরকমের হিংসায় রূপান্তরিত হয়। আর এইভাবে অন্যায় দীর্ঘায়ু হয়। হিংসা দিয়ে হিংসাকে ঠেকানো যায় না, অন্যায়কেও নয়।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অহিংসাকে তাই নীতি বলে মেনে নেওয়া কর্তব্য। হিংসাকে সম্পূর্ণ দূর করা কঠিন, একথা কিং জানতেন। তবু

অনুবাদকের কথা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কালো মানুষদের নাগরিক অধিকার অর্জনের সংগ্রামকে যিনি অহিংস গণসংগ্রামে রূপান্তরিত করে সাফল্যের পথে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি হলেন মার্টিন লুথার কিং। স্বল্পপরিসর জীবনে একজন মানবতাবাদী সাহসী সংগ্রামী মানুষ হিসাবে এমন বিশ্বজোড়া খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা খুব কম লোকের ভাগ্যে জুটেছে। মার্টিন লুথার কিং-এর প্রসঙ্গ উঠলে স্বভাবতই মহাত্মা গান্ধীর কথা এসে যায়। কারণ কিং তাঁর অহিংস সংগ্রামের নীতি ও কৌশল গান্ধীর কাছ থেকেই নিয়েছেন। সর্বোপরি গান্ধীর জীবন দর্শন তাঁকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল। বস্তুত পশ্চিম দুনিয়ায় গান্ধীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ এতবড় সংগ্রামী জননেতা আজ পর্যন্ত বিশেষ দেখা যায়নি। তাই বিশেষ করে ভারত-বাসীর পক্ষে মার্টিন লুথার কিংকে জানার এবং বোঝার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

মার্টিন লুথার কিং-এর জীবনী এবং তাঁর রচনাবলী পড়তে গিয়ে আমার মনে হ'ল তাঁর সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় বিশেষ কোন লেখা নেই এবং ভাষান্তরের মাধ্যমে তাঁর বিভিন্ন রচনা ও ভাষণে উন্মোচিত তাঁর চিন্তাভাবনা এবং ধ্যানধারণা বাঙালী পাঠক সমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়ার যৌক্তিকতা ও সার্থকতা রয়েছে। এ কথা মনে রেখেই কিং-এর কিছু রচনা ও ভাষণের অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। এই অনূদিত সংকলনে তাঁর যে-সমস্ত রচনা ও ভাষণ গ্রথিত হয়েছে সেগুলি Nissim Ezekied-সম্পাদিত 'Martin Luther King Reader' বইটিতে সংকলিত হয়ে আছে। কিং-এর লেখায় এখানে সেখানে উদ্ধৃত কবিতাংশসমূহের মৎকৃত বাংলা অনুবাদ আমার অধ্যাপক ডঃ সুবোধরঞ্জন রায় দেখে দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন। প্রখ্যাত চিন্তাবিদ এবং বিদগ্ধ লেখক অধ্যাপক অম্লান দত্ত মহাশয়ের মূল্যবান ভূমিকাটি পাঠকের কাছে গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা নিঃসন্দেহে বাড়িয়ে দিয়েছে। এজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

পশ্চিমবঙ্গ গান্ধী মেমোরিয়াল কমিটির পক্ষ থেকে গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন কমিটির সম্পাদক এবং বাংলা ভাষায় গান্ধীজীর জীবনী এবং গান্ধী-চিন্তনের উপর বহু পুস্তক-পুস্তিকার রচয়িতা শ্রীভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর প্রচেষ্টার পেছনে বিশেষ সমর্থন ছিল কমিটির সভাপতি ডঃ অরবিন্দনাথ বসু মহাশয়ের। তাঁদের দু'জনকে এবং সেই সংগে গান্ধী মেমোরিয়াল কমিটির সদস্যাবৃন্দকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

নরেন্দ্রনাথ সেন

সূচীপত্র

মার্টিন লুথার কিং

সংক্ষিপ্ত জীবনী

রেভারেন্ড্ মার্টিন ল্থার কিং, জুনিয়র পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে ১৯৬৯ সালে আততায়ীর গুলিতে তাঁর নিধন কাল পর্যন্ত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা হিসাবে সমগ্র বিশ্বে পরিচিতি এবং প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। জাতিগত সাম্য প্রতিষ্ঠার এই গণসংগ্রামে তিনি মহাত্মা গান্ধীর অহিংস প্রতিরোধ নীতি সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর এই অহিংস সংগ্রাম বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করে যখন ১৯৬৪ সালে তাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। বলা বাহুল্য আমেরিকার নিগ্রোদের মধ্যে রাল্ফ্ ব্রাঞ্চের পর তিনিই দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি এই দুর্লভ পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিত হয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৫ বছর এবং নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে তিনি কনিষ্ঠতম।

মার্টিন ল্থার কিং-এর পূর্বেও বহু ব্যক্তি এবং দল নাগরিক অধিকার নিয়ে বিস্তর কাজ করেছেন, লড়াইও করেছেন। কিন্তু তাঁর মত এমন ব্যাপক এবং সংহত আকারের সফল অহিংস সংগ্রাম আর কোন নিগ্রো তথা আমেরিকাবাসী করেননি এবং কি-স্বদেশে, কি-বিদেশে কৃষাঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গ মানুষদের মধ্যে মার্টিন ল্থার কিং হয়ে উঠেছিলেন নাগরিক অধিকার আন্দোলনের মূর্ত প্রতীক।

১৯২৯ সালের ১৫ই জানুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া রাজ্যের অন্তর্গত আটলান্টাতে কিং-এর জন্ম হয় দক্ষিণের একটি নিগ্রো ধর্মযাজক পরিবারে। তাঁর পিতা এবং মাতামহ উভয়েই ছিলেন ব্যাপ্টিস্ট ধর্মপ্রচারক। একজন মেধাবী ছাত্র হিসাবে ১৫ বছর বয়সে আট্লান্টার মোর হাউস্ কলেজে তিনি ভর্তি হন এবং ১৯৪৮ সালে বি. এ ডিগ্রি নেন। এরপর পেনসিলভানিয়ার চেস্টারে ক্রোজার থিওসফিক্যাল সেমিনারীতে তিন বছর অধ্যয়ন করেন এবং অবশেষে বোস্টন বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে ধর্মতত্ত্বে (থিওলজি) ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

ছাত্রাবস্থাতেই কিং মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা, চিন্তাধারা এবং অহিংসা দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হন এবং ক্রমে এর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। পরবর্তীকালে গান্ধীর অহিংস প্রতিরোধ নীতি তিনি যুক্তরাষ্ট্রের জাতিপৃথকীকরণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে সাফল্য অর্জন করেন।

ওয়াল্টার রাওচেনবুচ (Walter Rauschenbusch) এবং রাইনহোল্ড্ নাইয়েবুরের (Rainhold Nieburh) দার্শনিক তত্ত্ব তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারেনি। এবং তাঁর কথায় "বৌদ্ধিক এবং নৈতিক দিক থেকে যে তৃপ্তি বা সন্তোষ আমি পাইনি বেন্থাম এবং মিলের হিতবাদ থেকে, মার্কস এবং লেনিনের

বিপ্লববাদ থেকে, হবসের 'সামাজিক চুক্তি' তত্ত্ব থেকে, রুশোর 'প্রকৃতির কাছে ফিরে যাও' এই আশাবাদ থেকে এবং নীটশের 'অতি মানব' দর্শন থেকে, তা কিন্তু পেয়ে গেলাম গান্ধীর অহিংস প্রতিরোধ দর্শনের মধ্যে। আমার এই প্রত্যয় জন্মাল যে এটিই হচ্ছে একমাত্র নীতিসিদ্ধ এবং বাস্তবসম্মত বলিষ্ঠ পন্থা।" তাঁর নিজস্ব দর্শনের ব্যাখ্যা করে তিনি আরও বলেছেন, "আমি বিশ্বাস করি একটি সংগ্রামী অহিংস পদ্ধতিতে যেখানে ব্যক্তি মানুষ অন্যায্য সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে অবস্থান বিক্ষোভ, আইনানুগ ব্যবস্থা, বয়কট, ভোট এবং হিংসা-বিদ্বেষবর্জিত অন্য যে-কোন উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে।"

বোস্টনে অবস্থান কালে কিং-এর যোগাযোগ ঘটে নিউ ইংল্যান্ড কনজারভ্যাটরিতে সঙ্গীতবিদ্যার ছাত্রী আলবামার মেয়ে কোরেটা স্কটের সঙ্গে। সেই পরিচয়ের সূবাদে ১৯৫৩ সালে তাঁরা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁরা হয়েছিলেন চার সন্তানের জনক-জননী। মণ্টগোমারীর আলাবামাতে ডেক্সটার অ্যাভেনিউ ব্যাপটিস্ট চার্চে কিং ছিলেন একজন যাজক। সেই সময় যে-ব্যাপারটি ঘটে তা তাঁর জীবনের মোড় অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়। ঘটনাটি এই। ১৯৫৫ সালের ১লা ডিসেম্বর একজন নিগ্রো রমণী শ্রীমতী রোজা পার্কস্ একটি চলন্ত বাসে শ্বেতাঙ্গদের জন্য সংরক্ষিত একটি সামনের আসনে বসেছিলেন এবং তিনি তা একজন শ্বেতাঙ্গ বাসযাত্রীকে ছেড়ে দিতে দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করেন। ফলে জাতিপৃথকীকরণ আইন লঙ্ঘনের জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গ রাজনৈতিক কর্মীরা যানবাহন বর্জন করার উদ্দেশ্যে 'মণ্টগোমারী ইম্প্রুভমেণ্ট অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করেন এবং কিং-কে তাঁদের নেতা মনোনীত করেন।

এই তরুণ নেতা দলের কাছে তাঁর প্রথম ভাষণে ঘোষণা করেন :

> প্রতিবাদ করা ছাড়া আমাদের আর বিকল্প কিছুই নেই। বহু বছর ধরে আমরা এক আশ্চর্য রকমের ধৈর্য দেখিয়েছি। কোন কোন সময়ে আমরা আমাদের শ্বেতাঙ্গ ভাইদের মনে এমন একটি ধারণার সৃষ্টি করেছি যে আমাদের প্রতি যে-রকম ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে যেন আমাদের সায় আছে। কিন্তু আজ রাতে আমরা এখানে এসেছি সেই ধৈর্য থেকে অব্যাহতি পেতে যা আমাদের স্বাধীনতা এবং ন্যায় বিচারের কম কিছুতে ধৈর্যশীল থাকতে দেয়।

লক্ষ্য করার বিষয় এই ভাষণে একটি নতুন উদাত্ত কণ্ঠস্বর সমগ্র জাতি শুনতে পেল, একটি নতুন প্রেরণাময় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবের সূচনা দেখা গেল এবং কালক্রমে নাগরিক অধিকার-কেন্দ্রিক সংগ্রামে যে একটি নতুন নীতি এবং পন্থা অনুসৃত হবে এমন একটি ইঙ্গিতও এর মধ্যে ছিল। মণ্টগোমারীর বাস বয়কট প্রসঙ্গে তাঁর অপর একটি উক্তি, "এই হচ্ছে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মাধ্যমে প্রতিবাদ যা নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তি-নির্ভর। মন্দের বিনিময়ে আমরা যা ভাল তাই

দেব। খ্রীষ্ট আমাদের উপায় দেখিয়েছেন এবং মহাত্মা গান্ধী দেখিয়েছেন যে এই উপায় কার্যকরী করা যায়।" যদিও এই অহিংস আন্দোলন চলা কালে কিং-এর বাড়ী ডিনামাইট দিয়ে প্রায় বিধ্বস্ত করা হয়েছিল এবং তাঁর পারিবারিক নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে পড়েছিল, তথাপি কিঞ্চিদধিক একবছর পরে মণ্টগোমারীতে যানবাহন থেকে জাতি বৈষম্য ব্যবস্থা রহিত করা হয়েছিল। কিং-এর নেতৃত্বে সেখানকার কৃষ্ণাঙ্গদের এটি ছিল প্রথম জয়।

মণ্টগোমারীতে গণ-আন্দোলনের সাফল্য কিংকে উদ্বুদ্ধ করে এই আন্দোলনকে জাতীয় স্তরে নিয়ে যেতে। তাই তিনি গঠন করেন 'সাদার্ন ক্রিশ্চিয়ান লিডারশিপ কনফারেন্স'। এই সংগঠনকে একটি জাতীয় প্ল্যাটফরম হিসাবে ব্যবহার করে কিং দেশের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালেন। তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল প্রধানত জাতি বৈষম্য নীতির প্রেক্ষিতে কৃষ্ণকায় মানুষদের নাগরিক অধিকার। তাঁর একটি উল্লেখ্য বিষয় ছিল এই ব্যাপারে সমৃদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের, বিশেষ করে শ্বেতাংগ সমাজের, বিস্ময়কর নীরবতা, ভীতি এবং ঔদাসীন্য। তাঁর বক্তব্য—প্রশ্নটি আদৌ বিশেষ সম্প্রদায়ের নয়, বরং সর্বাংশে এটি একটি জাতীয় সমস্যা। তাঁর কথায় "খ্রিস্টের মধ্যে ইহুদী বা জেণ্টিল নেই, নেই কোন অধীন বা স্বাধীন মানুষ, অথবা নিগ্রো কিংবা শ্বেতাংগ।" তিনি গিয়েছিলেন ঘানা এবং ভারতে এবং সেখানকার রাষ্ট্রপ্রধান এবং বিভিন্ন স্তরের নেতা ও কর্মীদের সংগে আলাপ আলোচনা হয়।

১৯৫৯ সালে ফেব্রুয়ারীতে কিং সস্ত্রীক ভারতভ্রমণে যান। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কিং দম্পতিকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানান। সেখানে গান্ধীর অনুগামীদের সংগে গান্ধীর অহিংস নীতি সম্বন্ধে তাঁর বিস্তারিত আলোচনা হয়। গান্ধীর উপর এর আগেও তিনি বিস্তর পড়াশুনা করেছেন। ফলে তাঁর এই প্রত্যয় আরও দৃঢ় হ'ল যে দুনিয়ার নিপীড়িত মানুষদের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হচ্ছে অহিংস প্রতিরোধ। তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি, "আমার নিজস্ব পটভূমি থেকে আমি পেয়েছি নিয়ন্ত্রণকারী খ্রিষ্টিয় আদর্শ।...গান্ধীর কাছ থেকে আমি পেয়েছি প্রয়োগ কৌশল।" শ্রীমতী কোরেটা কিং তাঁর 'মাই লাইফ উইথ্ মার্টিন লুথার কিং' গ্রন্থে তাঁদের ভারতভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন, "মার্টিন গান্ধীর অহিংসা ও সরল জীবনচর্যার আদর্শের প্রতি অধিকতর অনুরাগ নিয়ে ফিরে এসেছিল। সে সব সময় ভাবত কি করে সেইসব আমেরিকায় প্রযুক্ত হতে পারে।" কিন্তু তিনি দেখলেন ওই সবের মধ্যে এমন কিছু জিনিস আছে যা আমেরিকার বাস্তব অবস্থার সংগে খাপ খাইয়ে নেওয়া যাবে না এবং শেষ পর্যন্ত তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে না হলেও আধ্যাত্মিকভাবে তিনি গান্ধীর মত হবেন। তাঁর জীবনীকার স্টিফেন বি. ওট্সের জবানী থেকে জানা যায় যে কিং সংকল্প নিয়েছিলেন মহাত্মার অনুসরণে তিনি সপ্তাহে একদিন উপবাস করবেন এবং মৌন থেকে ধ্যান

করবেন। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা তিনি রাখতে পারেননি।···এই বিষয়ে টেলিফোন ঘণ্টাটি আমেরিকান গান্ধীর কি ভয়ানক শত্রুই না হয়ে উঠেছিল !

১৯৬০ সালে তিনি তাঁর নিজের সহর আট্‌লাণ্টাতে ফিরে গেলেন এবং সেখানকার এলিজাবেথ ব্যাপ্টিষ্ট্‌ চার্চে তাঁর পিতার সহযোগী যাজক হিসাবে নিযুক্ত হলেন। তখন থেকে তাঁর সময় বেশি অতিবাহিত হতে থাকে সাংগঠনিক কাজকর্মে। তিনি স্থানীয় কলেজ ছাত্রদের অবস্থান বিক্ষোভ সমর্থন করেন এবং মধ্যাহ্ন ভোজের সময় খাবার টেবিলে পৃথকীকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য ৩৩ জন ছাত্রসহ অক্টোবরের শেষাশেষি গ্রেপ্তার হন। তাঁর বিরুদ্ধে যদিও অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়, তথাপি কয়েক মাস আগেকার যান চলাচল সংক্রান্ত সামান্য অপরাধের ব্যাপারে প্রদত্ত সংশোধনমূলক মুচলেকা তিনি লঙ্ঘন করেছেন এই অজুহাতে তাঁকে জেলে পাঠান হ'ল। তাঁর এই মামলা এবং জর্জিয়ার আদালতে আইনের এই অপব্যবহার সমগ্র দেশে একটি বড় রকমের শোরগোল তুলেছিল এবং নানান মহল থেকে তাঁর নিরাপত্তা সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়, বিশেষ করে যখন প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার এ' ব্যাপারে কোন রকম হস্তক্ষেপ করলেন না। শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী জন. এফ. কেনেডির মধ্যস্থতায় তিনি ছাড়া পেলেন। ব্যাপারটি এমন ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল যে লোকের ধারণা—এর আট দিন পরে কেনেডি যে যৎসামান্য ভোটের ব্যবধানে নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন, তার কারণ বিপুল সংখ্যক কৃষ্ণাংগ ভোটদাতার ভোট তাঁর পক্ষে গিয়েছিল।

১৯৬০ থেকে ১৯৬৫-এই বছরগুলি ছিল কিং-এর জীবনের সেরা সময়। বলা যায় এই সময় তাঁর প্রভাব এবং জনপ্রিয়তা শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছিল। গণ আন্দোলনের ক্ষেত্রে সক্রিয় এবং সংগ্রামী অহিংসা এবং তার প্রয়োগ কৌশল দেশের সকল অংশের কৃষ্ণাংগ মানুষদের এবং উদারমনস্ক শ্বেতাংগদের অনুরাগ এবং আনুগত্য এনে দিয়েছিল। এমনকি প্রেসিডেণ্ট কেনেডি এবং প্রেসিডেণ্ট লিন্‌ডন জনসনের আমলে প্রশাসনিক সমর্থনও পাওয়া গিয়েছিল। তবে এখানে ওখানে ছোট-খাটো ব্যর্থতাও যে ছিল না তা নয়। ভারতে গান্ধী-আন্দোলনের কথা মনে রাখলে বোঝা যাবে যে একটা ব্যাপক একটানা আন্দোলনে সাফল্যের সংগে সংগে কিছু ব্যর্থতা থাকা অস্বাভাবিক নয়।

১৯৬৩ সালের বসন্তকালে আলাবামার বার্মিংহামে কিং খাওয়ার টেবিলে এবং যানবাহন ভাড়া করার ব্যাপারে জাতিগত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে-অভিযান শুরু করেন তা সমগ্র জাতির মনোযোগ আকর্ষণ করে যখন পুলিশ -কর্তৃক বিক্ষোভকারীদের প্রতি কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের উপর হোস্‌পাইপ দিয়ে আগুন ছিটিয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া বহু বিক্ষোভকারীর সঙ্গে কিংয়েরও কারাদণ্ড হয়। এদের মধ্যে শত শত স্কুলের ছাত্রও ছিল। অবশ্য বার্মিংহামের কিছু সংখ্যক কৃষ্ণাংগ যাজকের সমর্থন তিনি পাননি। কিছু সংখ্যক শ্বেতাংগ যাজক তাঁর তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন এবং কৃষ্ণাংগদের প্রতি বিক্ষোভ

সমর্থন না করার আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি প্রচার করেছিলেন। কিং এই সময়ে বার্মিংহাম জেল থেকে লেখা একটি চিঠিতে জোরালো ভাষায় তাঁর অহিংসা দর্শনের ব্যাখ্যা করেন। চিঠিতে তিনি লেখেন—

আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন : "কেন এই সংগ্রাম ? কেন এই অবস্থান বিক্ষোভ, গণ-অভিযান ইত্যাদি ? আলাপ-আলোচনা কি এসবের চাইতে ভাল পন্থা নয় ?" আপনারা ঠিক কথাই বলেছেন, আলাপ-আলোচনার পথে যাওয়াই ভাল। বস্তুত পক্ষে এটিই হচ্ছে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আসল উদ্দেশ্য। অহিংস প্রত্যক্ষ সংগ্রামের লক্ষ্য এমন একটি সংকট সৃষ্টি করা, এবং এমন উত্তেজনা জাগিয়ে তোলা যাতে যে-সমাজ বরাবরই আলোচনায় বসতে অস্বীকার করছে, তাকে সমস্যার মুখোমুখি হতে বাধ্য করা হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্যাটিকে নাটকীয়ভাবে তুলে ধরা যাতে এটিকে উপেক্ষা করা না যায়। ···দুঃখজনক অভিজ্ঞতার মধ্যে আমরা জানি যে অত্যাচারী কোনদিন স্বেচ্ছায় স্বাধীনতা দেয় না, উৎপীড়িতদের এটি দাবী করা অনিবার্য হয়ে পড়ে।

বার্মিংহাম আন্দোলনের শেষের দিকে শান্তিপূর্ণ পরিবর্তন আনবার জন্য বিভিন্ন শক্তিসমূহকে সংহত করার এবং দেশ ও বিশ্বের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের জাতিগত সমস্যার সমাধানের প্রয়োজনীয়তাকে নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যে কিং নাগরিক আন্দোলনের অন্যান্য নেতাদের সংগে নিয়ে ওয়াশিংটন অভিযান সংগঠনের কাজে ব্রতী হন। ১৯৬৩ সালের অক্টোবরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত দুই লক্ষ্যেরও অধিক লোক ওয়াশিংটনে লিংকন্ স্মৃতিসৌধের সামনে সমবেত হয় সকল মানুষের জন্য সমান আইনানুগ ন্যায়বিচারের দাবী জানাতে। এই সভাতেই কিং তাঁর 'আমার স্বপ্ন' (আই হ্যাভ্ য়্যা ড্রিম্) এই বিখ্যাত ভাষণটি দিয়েছিলেন। বাইবেলীয় বাগ্‌বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ তাঁর এই উদাত্ত ভাষণ সমবেত মানুষদের উদ্দীপিত করে তুলেছিল। তাঁর ভাষণের মর্মার্থ হ'ল—একদিন সমগ্র বিশ্বের মানুষ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-দেশ নির্বিশেষে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবে। সেদিন তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছিল তাঁর এই স্বপ্ন : একদিন জর্জিয়ার লাল পাহাড়ের উপর বিগত দিনের ক্রীতদাসদের সন্তানেরা এবং পূর্বতন ক্রীতদাস মালিকদের সন্তানেরা একত্রে এক টেবিলের চারদিকে ভাই-ভাই হয়ে উপবেশন করবে।

এইসব প্রবল আন্দোলন সমগ্রজাতির উপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করে এবং তার ফলশ্রুতি স্বরূপ ১৯৬৪'র নাগরিক অধিকার আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনে ফেডারেল গবর্নমেন্টকে প্রকাশ্য স্থানে, যানবাহনে এবং চাকরি বা নিয়োগের ক্ষেত্রে জাতিগত পৃথকীকরণ রদ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে অসলোতে কিংকে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। শান্তি পুরস্কার গ্রহণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, "···বছরের পর বছর গড়িয়ে যাবে যখন সত্যের প্রখর আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে আমাদের এই অত্যাশ্চর্য যুগ—কি

নারী কি পুরুষ সবাই জানবে এবং শিশুদের শেখানো হবে যে আমাদের আছে একটি সুন্দর দেশ, আছে উৎকৃষ্টতর জনগণ, আছে অধিকতর উদার সভ্যতা, কেননা ঈশ্বরের এইসব বিনম্র সন্তানেরা ন্যায়পরায়ণতার স্বার্থে ত্যাগস্বীকারে তৎপর ছিল।"

১৯৬৫ সালের মার্চে যুক্তরাষ্ট্রীয় ভোটাধিকার আইন পরিবর্তনের দাবীতে কিং-এর নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ অভিযান আলাবামার সেল্‌মা থেকে মন্টগোমারীর সরকারী দপ্তরের দিকে এগিয়ে যায়। এই আন্দোলন থেকে বিরত থাকার জন্য ফেডারেল সরকারের আবেদন এবং আদালতের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে কিং বিক্ষোভকারীদের নিয়ে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু পুলিশের প্রচণ্ড বাধার মুখে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। বিক্ষোভ পরিত্যক্ত হ'ল। ফলে তরুণদের এক অংশের কাছে কিং ধিক্কার এবং সমালোচনার পাত্র হয়ে উঠলেন। তাঁকে 'অতি সাবধানী' বদনাম দেওয়া হয়। নাগরিক অধিকার আন্দোলনে উগ্রবাদীদের বিরোধিতা-দানা বেঁধে ওঠে। বিশেষ করে দক্ষিণের বড় বড় সহরের ব্যস্ত অঞ্চলে তাঁর অহিংস নীতির কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে। তিনি বারবার বলেছেন যে অহিংসা কোন মিরাকল্ দেখাতে পারে না। কিন্তু অনেকে তাই আশা করেছিল। বলে রাখা ভালো যে এ ধরনের পরিস্থিতি ভারতে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সংগ্রামের ক্ষেত্রেও বার বার দেখা গিয়েছে। সংগ্রামী অহিংসা প্রতিরোধ তথা সত্যাগ্রহ, ধৈর্য, সাহসিকতা, সহিষ্ণুতা, প্রতিপক্ষের প্রতি-বিদ্বেষহীনতা, প্রেমের শক্তি ইত্যাদির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। দৈহিক শক্তির বিরুদ্ধে নৈতিক এবং আত্মিক শক্তির প্রয়োগই সত্যাগ্রহের মূলকথা। সেখানে বিরোধী পক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও আপসের পথ সব সময় খোলা থাকে। তাই জংগীবাদীরা তো বটেই, এমনকি—সাধারণ লোকেরাও অহিংস সংগ্রাম নীতির মৌল শক্তি এবং প্রয়োগ কৌশল সম্বন্ধে সম্যক অবহিত এবং সচেতন না হলে সত্যাগ্রহীকে অনেক সময় ভুল বোঝা হয়, তাঁকে অতি নরম, অতি সাবধানী বলে দোষারোপ করা হয়, এমনকি তাঁকে বিদ্রূপও করা হয়। যেমন সময় সময় গান্ধীর বেলায় এমনটি হয়েছে, তেমন কিং-এর বেলায়ও হয়েছে। তবে ভুললে চলবে না যে তিনি তাঁর পথ বা প্রত্যয় থেকে কখনও সরে আসেননি, সংকল্প থেকে বিচ্যুত হননি, জাতিবৈষম্যগত অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পিছপা হননি। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে অহিংস গণ-আন্দোলন চালাতে গিয়ে তিনি নানাভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন, অত্যাচারে জর্জরিত হয়েছেন। ১২ বার তিনি কারারুদ্ধ হয়েছেন, তাঁর বাড়ীতে দু'বার বোমাবাজী করা হয়েছে। বারবার তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে হত্যার হুমকি দেখানো হয়েছে। এমনকি আততায়ীর ছোরার আঘাতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন, যার ফলে তাঁর প্রায় মৃত্যু হতে যাচ্ছিল।

যা হোক, প্রধানত আন্দোলনের চাপে পড়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ১৯৬৫ সালে ভোটাধিকার আইন পাশ করেন।

১৯৬৭ সালের ৪ঠা এপ্রিল নিউইয়র্কের রিভার সাইড্ চার্চে এক ভাষণে এবং ১৪ই এপ্রিল ওই সহরের এক বিশাল জনসমাবেশে কিং ভিয়েতনাম যুদ্ধের তীব্র বিরোধিতা করেন। এর আগেও তিনি এই যুদ্ধের নিন্দা করেছিলেন। এর ফলে তিনি সরকারের বিরাগভাজন হন এবং কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের একাংশও তাঁর বিরুদ্ধবাদী হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে তিনি আন্দোলনের পরিধি প্রসারিত করেন এবং দারিদ্র্য, বেকারি ইত্যাদি সমস্যাও আন্দোলনের আওতায় নিয়ে আসেন। সংগ্রামের লক্ষ্য এবং বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি নতুন করে ভাবতে শুরু করেন। তিনি বুঝতে পারেন যে শুধু কতকটা, এলোমেলোভাবে এখানে কিছু—ওখানে কিছু জোড়াতালি দেওয়া পরিবর্তনের মাধ্যমে বেশিদূর এগোন যাবে না, আশানুরূপ ফলও কিছু মিলবে না। দরকার সামাজিক কাঠামোর আগাগোড়া বদলানো, সামাজিক-মূল্যবোধের বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

ওয়াশিংটনে গরীব লোকদের একটি বড় অভিযান সংগঠনের পরিকল্পনা নিলেন কিং। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। কারণ তার আগে তিনি টেনেসি রাজ্যের মেম্‌পিসে যান সেখানকার স্বাস্থ্যকর্মীদের ধর্মঘট সমর্থন করতে এবং তাতে সহায়তা দান করতে। সেটা ছিল ১৯৬৮ সালের বসন্তকাল। সেখানে ৪ঠা এপ্রিল সকাল বেলায় তিনি হোটেলের বারান্দায় কয়েকজন সঙ্গীসহ দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময় হঠাৎ আততায়ীর গুলিতে তিনি লুটিয়ে পড়েন, তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৯ বছর। ১৯৬৯ সালের ১০ই মার্চ জেম্‌স্ আর্ল্ রে নামে একজন দক্ষিণী শ্বেতাঙ্গ কিংকে খুন করার অপরাধ স্বীকার করে। বিচারে খুনীর ৯৯ বছর জেল হয়।

এইভাবে ক্রূরতম হিংসার অপঘাতে অহিংসার পূজারী এই অনন্য সাধারণ সংগ্রামী, মানবতাবাদী মানুষটির জীবনদীপ নির্বাপিত হয়ে গেল। কিন্তু ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে রইলেন। আমেরিকার মানুষও তাঁকে ভোলেনি। গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে এ যুগের এই মহান মানুষটিকে তারা আজও স্মরণ করে। ১৯৮৬ সালে প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগন একটি আইন বলবৎ করেন যার দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর জানুয়ারীর তৃতীয় সোমবার মার্টিন লুথার কিং-এর জন্মদিন হিসাবে ছুটির দিন বলে ঘোষিত হয়েছে, কেননা কিং ছিলেন সেই মানুষ যিনি "আমেরিকাকে চিরদিনের জন্য বদলে দিয়ে গেছেন।" উল্লেখ করা যেতে পারে যে এর আগে আমেরিকা অনুরূপ সম্মান দেখিয়েছে কেবলমাত্র যীশুখ্রীষ্ট, কলম্বাস, জর্জ ওয়াশিংটন এবং আব্রাহাম লিংকনের প্রতি।

নরেন্দ্রনাথ সেন

অহিংসার পথে তীর্থযাত্রা

(পিলগ্রেমেজ টু নন্‌-ভায়োলেন্স্‌)

চিন্তা এবং মননের দিক থেকে অহিংসার পথে আমার তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন প্রায়ই উঠে থাকে। এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে হ'লে আটলান্টায় আমার অল্প বয়সের দিনগুলিতে ফিরে যেতে হবে। জাতি পৃথকীকরণ নীতি এবং তার আনুষঙ্গিক পীড়নমূলক ও বর্বরোচিত কার্যাবলীর প্রতি একটা ঘৃণা এবং বিতৃষ্ণার মনোভাব নিয়ে আমি বড় হয়ে উঠেছি। যে-সব স্থানে নিগ্রোদের নৃশংস-ভাবে পিটিয়ে মারা হয়েছিল আমি সে-সব স্থানের উপর দিয়ে হেঁটে গেছি। রাতের বেলায় নিগ্রোবিরোধী কিউ-ক্লাক্‌স্‌-ক্ল্যানের হিংস্র দাপট আমি স্বচক্ষে দেখেছি। এবং এও দেখেছি আদালতে বিচারের নামে কি মর্মান্তিক অবিচার নিগ্রোদের প্রতি করা হয়েছে। এই সবকিছুই আমার ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশের পেছনে কাজ করেছে। ফলে একরকম বিপজ্জনকভাবে আমি প্রায় সমস্ত শ্বেতাঙ্গ মানুষের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে বর্ণবৈষম্যগত অবিচার এবং অর্থনৈতিক অবিচার—একটি আরেকটি থেকে আলাদা কিছু নয়। যদিও আমি ছিলাম এমন একটি পরিবারের ছেলে যে-পরিবারের মোটামুটি আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল, তথাপি আমার খেলার সাথীদের এবং প্রতিবেশীদের আর্থিক নিরাপত্তার অভাব এবং নিদারুণ দারিদ্র্য আমার মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলত। যখন আমার বয়স কুড়ির নীচে, সেই সময় আমি কারখানায় কাজ করেছি আমার পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আমার বাবা চাননি আমি বা আমার ভাই এ'রকম একটি কারখানায় শ্বেতাঙ্গদের পাশাপাশি পীড়নমূলক অবস্থার মধ্যে কাজ করি। ওই কারখানায় শ্বেতাঙ্গ এবং নিগ্রোদের নিয়োগ করা হ'ত। এখানে যে অর্থনৈতিক অবিচার চলছিল আমি তা প্রত্যক্ষ করেছি এবং এও অনুভব করেছি যে এখানে শ্বেতকায় শ্রমিকরাও কৃষ্ণকায়দের মত শোষিত হচ্ছে। আমাদের সমাজে যে বিভিন্ন ধরণের অবিচার চলছে, প্রথম জীবনের এই সকল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমি সে সম্বন্ধে গভীর-ভাবে সচেতন হয়ে উঠেছি। সুতরাং ১৯৪৪ সালে আটলান্টার মোর হাউস কলেজে ভর্তি হওয়ার আগেই বর্ণবৈষম্যগত এবং অর্থনৈতিক অবিচার আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে ভাবিয়ে তুলেছিল। মোর হাউসে ছাত্রাবস্থায় থোরোর (Thoreau) 'এসেই অন্‌ সিভিল ডিসোবিডিয়েন্‌স্‌' (Essay on Civil Disobedience) বইটি প্রথম পড়ি। মন্দ সমাজব্যবস্থা তথা শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করার ধারনাটি আমাকে বড় আকৃষ্ট করল, আমার মনকে নাড়া দিল। তাই বইটি বহুবার পড়লাম। চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে অহিংস প্রতিরোধ তত্ত্বটির সংগে আমার এই প্রথম পরিচয়।

১৯৪৮ সালে ক্রোজার থিওলজিক্যাল সেমিনারিতে যোগ দেওয়ার আগে পর্যন্ত বুদ্ধিগতভাবে সামাজিক অন্যায় নির্মূল করার কোন উপায় বা পদ্ধতির সন্ধান আমি করিনি। যদিও আমার প্রধান অনুরাগ ছিল ধর্মতত্ত্ব এবং দর্শনশাস্ত্রের প্রতি, তথাপি প্রখ্যাত সমাজ-দার্শনিকদের লেখা বই পড়ার জন্য আমি প্রচুর সময় ব্যয় করেছি। আমি ওয়াল্টার রাওচেনবুচ' (Walter Rauschenbusch)-এর 'ক্রিশ্চিয়ানিটি এন্ড্ দ্য সোস্যাল ক্রাইসিস্ (Christianity and the Social Crisis) বইটি পড়ি। বইটি আমার চিন্তাধারার উপর একটি স্থায়ী ছাপ রেখে যায় এবং প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতার নিরিখে যে সামাজিক বিষয়গুলি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল তার একটি ধর্মীয় ভিত্তি আমি খুঁজে পাই। অবশ্য কোন কোন বিষয়ে রাওচেনবুচের সঙ্গে আমি একমত হ'তে পারিনি। আমার ধারণা তিনি 'অবশ্যম্ভাবী অগ্রগতি' (inevitable progress) এই উনিশ শতকীয় বিশ্বাসের শিকার হয়ে পড়েছিলেন। যার ফলে মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে তিনি একরকম ভাসা-ভাসা ভাবে আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। তাছাড়া তিনি যেন অনেকটা বিপজ্জনকভাবে ঈশ্বরের রাজ্যকে একটি সামাজিক এবং আর্থনীতিক ব্যবস্থার সঙ্গে অভিন্ন ভেবে বসেছিলেন। ঐ ধরনের চিন্তা-প্রবণতার দ্বারা চার্চের প্রভাবিত হওয়া সমীচীন নয় মোটেই। কিন্তু এই সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও রাওচেনবুচ্ খ্রিস্টীয় চার্চের সপক্ষে একটি বড় কাজ করেছেন। কারণ তিনি যে বিষয়টির উপর প্রত্যয়িত বক্তব্য রেখেছিলেন, তা এই যে, যীশুর উপদেশমালা (Gospel) সার্বিক মানুষকে নিয়ে। মানুষের শুধুমাত্র আত্মা নয়, তার দেহও, মানুষের শুধু আত্মিক উন্নয়ন নয়, তার ব্যবহারিক, বস্তুগত উন্নতিও গস্পেলের আওতার আসে। বস্তুত রাওঁচেন্বুচের রচনা পাঠ করে আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে, যে ধর্ম কেবলমাত্র মানুষের আত্মিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকে, যে সামাজিক এবং আর্থ-নীতিক অবস্থা মানুষের আত্মাকে প্রতিনিয়ত আঘাত করে সে বিষয়ে যে ধর্ম উদাসীন, সেই ধর্ম আধ্যাত্মিক দিক থেকে মুমূর্ষু এবং একদিন তার বিলুপ্তি ঘটবে। যথার্থই বলা হয়েছে, 'যে ধর্ম শুধু ব্যক্তি মানুষকে নিয়ে থাকে, তার লয় অবশ্যম্ভাবী'।

রাওচেনবুচের রচনাবলী পড়া হয়ে গেলে পর আমি গভীর মনোযোগের সংগে বড় বড় দার্শনিকদের সামাজিক এবং নৈতিক তত্ত্বের উপর রচনাসমূহ পড়তে শুরু করে দিলাম, এঁদের মধ্যে প্লেটো, অ্যারিস্টটল থেকে রুশো, হ্বস্, বেন্থাম, মিল, লক্—সবাই আছেন। এই সমস্ত প্রথম শ্রেণীর দার্শনিকবৃন্দ আমার চিন্তা-ভাবনাকে উদ্দীপিত করে দিলেন। যদিও নানা বিষয়ে তাঁদের প্রত্যেককে আমার প্রশ্ন করার ছিল, তথাপি তাঁদের লেখা পড়ে আমি অনেক কিছু শিখেছি।

আমি স্থির করলাম—১৯৪৯ এর বড়দিনের ছুটি কার্ল্ মার্ক্সের লেখা পড়ে কাটার এবং কম্যুনিজম কেন বহু মানুষকে অনুপ্রাণিত করে তা বোঝার চেষ্টা করব। এই প্রথম বার আমি 'দাস ক্যাপিটাল' এবং 'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো' খুব

খুঁটিয়ে পড়ে দেখলাম। মার্ক্স এবং লেনিনের উপর কিছু কিছু ব্যাখ্যামূলক লেখাও পড়লাম। এইসব সাম্যবাদ-সংক্রান্ত লেখা পড়ে আমি এমন কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যার থেকে সরে আসার কোন কারণ আজ পর্যন্ত ঘটেনি। প্রথমত আমি তাঁদের ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করেছি। কম্যুনিজম স্পষ্টতই অনাধ্যাত্মিক এবং বস্তুতান্ত্রিক এবং তাতে ঈশ্বরের কোন স্থান নেই। এটা আমি মেনে নিতে পারিনি, কারণ একজন খ্রীস্টান হিসাবে আমি বিশ্বাস করি যে, নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী এমন এক সৃষ্টিশীল ব্যক্তিসত্তাবিশিষ্ট শক্তি আছে যা কিনা সকল বস্তুর ভিত্তি এবং মূল, এমন এক শক্তি যার বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। না, জড় শক্তি নয়, আত্মিক শক্তিই আসলে ইতিহাসের গতি নির্দেশ করে। দ্বিতীয়ত, সাম্যবাদের নৈতিক অপেক্ষবাদ বিষয়ে আমি ভিন্ন মত পোষণ করি। কেননা একজন সাম্যবাদীর দৃষ্টিতে ঐশী বিধান বলে কিছু নেই, নেই কোন বিশুদ্ধ নৈতিক নিয়মশৃংখলা বা কোন শাশ্বত অপরিবর্তনীয় আদর্শ। ফলে জবরদস্তি, হিংসা, নরহত্যা, মিথ্যাচার—এই সব কিছুই ঈপ্সিত 'স্বর্ণযুগে' পৌঁছে দেওয়ার পন্থা হিসাবে গ্রহণ এবং প্রয়োগ করা চলে। ঐ ধরনের অপেক্ষবাদ আমার কাছে ঘৃণ্য মনে হয়। রচনাত্মক উদ্দেশ্যসাধনে ধ্বংসাত্মক উপায় অবলম্বন নৈতিক দিক থেকে আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়, কেননা, উদ্দেশ্য-উপায়ের মধ্যে পূর্বনিহিত, একটি অপরটি থেকে অবিভাজ্য। তৃতীয়ত সাম্যবাদের আনুষঙ্গিক রাজনৈতিক একনায়কতন্ত্রের আমি ঘোর বিরোধী। সাম্যবাদে ব্যক্তিমানুষের চরম পরিণতি ঘটে রাষ্ট্রের দাসত্বে। সাম্যবাদীরা অবশ্য বলবেন যে রাষ্ট্র একটি সাময়িক, অন্তর্বর্তীকালীন বাস্তব ব্যবস্থা মাত্র এবং রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটবে শ্রেণীহীন সমাজের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু আসল লক্ষ্য হ'ল রাষ্ট্র, যা চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে, আর মানুষ হ'ল সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় বা হাতিয়ার মাত্র এবং কোন মানুষের অধিকার বা ব্যক্তিস্বাধীনতা যদি সেই লক্ষ্য-স্বরূপ রাষ্ট্রের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তবে সেই ব্যক্তিমানুষের নিশ্চিত বিলুপ্তি ঘটবে। তার মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ইচ্ছামত ভোটাধিকার প্রয়োগ, অথবা ইচ্ছামত খবর শোনা বা বই পড়ার অধিকার এই সব কিছুই সীমাবদ্ধ। বস্তুত কম্যুনিজমে মানুষ ব্যক্তিত্ববর্জিত হয়ে রাষ্ট্রশকটচক্রের নাটবল্টু মাত্র হয়ে পড়েছে।

ব্যক্তিস্বাধীনতার এই অপহ্নব আমার কাছে অত্যন্ত আপত্তিজনক। সেদিনকার মত আজও আমি এই দৃঢ় প্রত্যয়ে অবিচল আছি যে আসল লক্ষ্যবস্তু হ'ল মানুষ, কেননা মানুষ ঈশ্বরের সন্তান। রাষ্ট্রের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যই রাষ্ট্র। মানুষকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার অর্থ মানুষকে 'বস্তু' বিশেষে পরিণত করা, 'ব্যক্তি'র পর্যায়ে উন্নীত করা নয়। রাষ্ট্রকে চরম লক্ষ্যবস্তু করে মানুষকে রাষ্ট্রের স্বার্থে ব্যবহার করা চলবে না। মানুষ হয়ে থাকবে তার আন্তর উদ্দেশ্য সাধনে নিবেদিত।

সাম্যবাদ সম্বন্ধে আমার প্রতিক্রিয়া বরাবরই নেতিবাচক, এবং আমি এখনও এই মতবাদকে মূলত মন্দ বলেই মনে করি। অবশ্য এর এমন কতকগুলি দিক আছে, যার মোকাবিলা দরকার। ক্যান্টার বেরির আর্চবিশপ প্রয়াত উইলিয়াম টেম্পল সাম্যবাদকে খ্রীষ্টিয় ধর্মমত বিরোধী বলে উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা তিনি বলতে চেয়েছেন যে, সাম্যবাদ এমন কিছু সত্যকে আঁকড়ে ধরে আছে যেগুলি ধর্মবিশ্বাসের অতি আবশ্যকীয় অংগ। সাম্যবাদ সেই সব সত্যকে এমন কিছু ধারণা এবং রীতির সংগে মিশিয়ে ফেলেছে যা কোন সাচ্চা খ্রীষ্টান কর্তৃক গৃহীত বা আচরিত হতে পারে না। সামাজিক ন্যায়বিচারের বিষয়ে সাম্যবাদের ক্রমবর্ধমান প্রয়াস ছিল প্রয়াত আর্চবিশপের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জ প্রত্যেক খ্রীষ্টানের প্রতি, যেমনটি আমার প্রতিও। যতসব মিথ্যা ভান এবং মন্দ কার্য পদ্ধতি নিয়ে সাম্যবাদ শ্রেণীহীন সমাজের উপর জোর দেয় এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নিয়ে মাথা-ঘামায়। যদিও একান্ত দুঃখজনক অভিজ্ঞতা থেকে বিশ্বের মানুষ জানে যে বাস্তব ক্ষেত্রে সাম্যবাদ আসলে নতুন শ্রেণীসমূহ সৃষ্টি করেছে এবং অবিচারের একটি নতুন অভিধান তৈরি করেছে। দরিদ্র শ্রেণীর উপর অন্যায়-অবিচার সম্পর্কিত প্রতিবাদ একজন খ্রীষ্টানের প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ এজন্য যে খ্রীষ্টধর্মই হ'ল মূলত এই রকমের একটি প্রতিবাদ এবং তা যীশুর মত এমন উচ্চকিত ভাবে কেউ কখনো প্রকাশ করেনি। তাঁর কথায় "ঈশ্বরের আত্মা আমার উপর বর্তেছে, কেননা দরিদ্রের কাছে ঈশ্বরের বাণী পেঁছে দেওয়ার কাজে তিনি আমাকে নিযুক্ত করেছেন। আমাকে পাঠিয়েছেন ভগ্ন-হৃদয়ের দুঃখ মোচনের জন্য, অন্ধদের দৃষ্টি দানের জন্য, নির্যাতিতদের মুক্ত করার জন্য, ঈশ্বরের গ্রহনীয় বৎসর প্রচারের জন্য।"

আমি আধুনিক বুর্জোয়া কৃষ্টির মার্ক্সীয় সমালোচনার সুসংবদ্ধ উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। মার্ক্স পুঁজিবাদকে প্রধানত উৎপাদনক্ষম সম্পদের মালিকশ্রেণীর সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। মার্ক্সের ব্যাখ্যায় আর্থনীতিক শক্তিসমূহের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সামন্ততন্ত্র পুঁজিবাদের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে শেষপর্যন্ত সমাজতন্ত্রে পেঁছিবে এবং ইতিহাসের অগ্রগতির প্রাথমিক হাতিয়ার হচ্ছে পরস্পর বিরোধী স্বার্থবাহী বিভিন্ন আর্থিক শ্রেণীসমূহের সংঘর্ষ। স্পষ্টতই এই তত্ত্বে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অজস্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক, ধর্মীয় এবং মনস্তাত্ত্বিক জটিল বিষয় উপেক্ষিত থেকেছে, সেগুলি অগণিত সংস্থা এবং আইডিয়ার জন্ম দিয়েছে, যার সমাহার আজকের পাশ্চাত্য সভ্যতা। তাছাড়া মার্ক্স যে সময়কার পুঁজিবাদ নিয়ে লিখেছেন, তার সংগে আজকের দিনের আমেরিকার পুঁজিবাদের মাত্র আংশিক সাদৃশ্য আছে।

তাঁর বিশ্লেষণে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও মার্ক্স কিন্তু কতকগুলি মৌলিক প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। অল্প বয়স থেকেই প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদের আধিক্য এবং ভয়াবহ দারিদ্র্যের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান দেখে আমি উদ্বেগ বোধ করেছি। ধনী ও

দরিদ্রের মধ্যে এই ব্যবধান সম্বন্ধে আমি আরও গভীরভাবে সচেতন হয়েছি মার্ক্সের লেখা পড়ে। যদিও সমাজ-সংস্কারের মাধ্যমে আধুনিক আমেরিকান পুঁজিবাদ এই ব্যবধান বহুল পরিমাণে কমিয়ে এনেছে, তথাপি ধনবণ্টনের আরও উন্নততর ব্যবস্থার এখনো প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া মার্ক্স যে-বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন তা এই যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলে রয়েছে মুনাফা অর্জনের মনোভাব। পুঁজিবাদ মানুষকে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অনুপ্রাণিত করে, জীবনের মান নয়। বিপদটা এখানেই। আমাদের সাফল্যের পরিমাণ নির্ণয় করা হয় বেতনের মূল্যসূচক দিয়ে বা মোটর গাড়ীর আকার দেখে, মানুষের সেবা এবং মানুষের সংগে সম্পর্কের ভিত্তিতে নয়। তাই পুঁজিবাদও আমাদের বাস্তব জড়বাদের দিকে ঠেলে দেয় এবং সেটি কম্যুনিজম যে জড়বাদ প্রচার করে তার মতই সমান অনিষ্টকারী।

মোট কথা মার্ক্স ও অন্যান্য প্রভাবশালী ঐতিহাসিক চিন্তাবিদদের লেখা আমি পড়েছি দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে। তার মধ্যে আংশিক 'হাঁ' এবং আংশিক 'না' দুইই আছে। মার্ক্স যখন অধিবিদ্যামূলক জড়বাদ, নৈতিক আপেক্ষবাদ এবং একনায়কবাদ প্রচার করেছেন, তখন আমার প্রতিক্রিয়া একান্তভাবে নেতিবাচক। আবার যেখানে তিনি চিরাচরিত পুঁজিবাদের দুর্বলতা উন্মোচিত করেছেন, জনতার মধ্যে নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছেন, খ্রীষ্টিয় গীর্জার তথাকথিত সামাজিক বিবেকবোধকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন, সেখানে আমার প্রতিক্রিয়া পুরোপুরি ইতিবাচক।

মার্ক্সের রচনাসমূহ পাঠ করে আমার এই ধারণা হ'ল যে পরিপূর্ণ সত্য মার্ক্সবাদেও নেই, ঐতিহ্যবাহী পুঁজিবাদেও নেই। প্রত্যেকটিতে আছে আংশিক সত্য মাত্র। ঐতিহাসিক বিচারে পুঁজিবাদ সংঘবদ্ধ উদ্যোগের মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে তা দেখতে পায়নি। তেমনি মার্ক্সবাদও ব্যক্তিগত উদ্যোগের সত্যতা অনুধাবন করতে পারেনি। ঊনবিংশ শতাব্দীর পুঁজিবাদ জীবনের যে একটি সামাজিক রূপ আছে তা ধরতে পারেনি। অন্যদিকে মার্ক্সবাদ জীবনের যে একটি ব্যষ্টিরূপ এবং নিজস্বতা আছে তা তখনও দেখতে পায়নি, এখনও পাচ্ছে না। 'ঈশ্বরের রাজ্য' ব্যক্তিগত উদ্যোগের 'থিসিস্' নয়, আবার সামষ্টিক উদ্যোগের 'এণ্টিথিসিস্'ও নয়। কিন্তু এই দুই সত্যের সমন্বিত 'সিন্থিসিস্'।

ক্রোজারে অবস্থানকালে আমি ডঃ এ. জে. মাষ্টি-র (Dr. A. G. Muste) বক্তৃতা শুনে এই প্রথম শান্তিবাদের মুখোমুখি হলাম। কিন্তু তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়ের বাস্তবতা সম্পর্কে আমি মোটেই নিঃসন্দেহ হতে পারিনি। ক্রোজারের অনেক ছাত্রের মত আমারও নিশ্চিত ধারণা ছিল যে যুদ্ধ কখনও শুভ বা কল্যাণকর হতে পারে না। তবে নেতিবাচকভাবে যুদ্ধ এই অর্থে ভাল হতে পারে যে যুদ্ধ অশুভ শক্তির উদ্ভব এবং প্রসার রোধ করতে পারে। যুদ্ধ ভয়াবহ হলেও নাৎসী, ফ্যাশিষ্ট বা কম্যুনিষ্ট একনায়কতন্ত্রের চেয়ে বাঞ্ছনীয়।

এই সময়ে আমি সমস্যা সমাধানে প্রেমের শক্তি সম্বন্ধে প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। বোধ হয় নীট্শের দর্শনের প্রভাবে প্রেমের শক্তিতে আমার বিশ্বাস সাময়িকভাবে শিথিল হয়ে পড়েছিল। আমি তখন নীটশের 'দ্য জেনিওলজি অফ্ মর‍্যালস' (The Geneology of Morals)-এর অংশবিশেষ এবং সমগ্র 'দ্য উইল্ অফ্ পাওয়ার' (The Will of Power) পড়ছিলাম। 'জীবনটাই হ'ল কিনা শক্তির প্রকাশ'—নীট্শের তত্ত্বের মধ্যে শক্তিকেই গৌরবের আসনে বসানো হয়েছে এবং তাতে সাধারণ নীতিবোধের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়েছে। হীব্রু-খ্রীস্টিয় নীতিবোধ এবং আনুষাঙ্গিক করুণা ও বিনয়, পারলৌকিকতা এবং দুঃখবরণ বিষয়ে মনোভাব ইত্যাদি, নীট্শের মতে, দুর্বলতাকে গৌরব দান করা এবং নিছক প্রয়োজন এবং অক্ষমতাকে মহৎগুণ বলে জাহির করা। তিনি এমন 'অতিমানবের, কথা বলেছেন যে মানুষকে অতিক্রম করবে।' যেমন মানুষ বানরকে অতিক্রম করেছিল'।

এরপর একদিন বিকেলে ফিলাডেলফিয়া গেলাম। হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ডঃ মর্ডেসাই জনসনের ধর্মোদেশ শোনার জন্য। সেখানে তিনি 'ফেলোশিপ্ হাউস অফ্ ফিলাডেলফিয়া'র হয়ে ধর্মপ্রচার করছিলেন। ডঃ জনসন সবেমাত্র ভারত ভ্রমণ শেষ করে ফিরেছেন। মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও শিক্ষার উপর তাঁর বক্তৃতা শুনে আমি ভয়ানক কৌতুহলী হয়ে উঠলাম। মহাত্মা গান্ধীর বাণী আমাকে এমন গভীরভাবে চমকিত করল যে সভা থেকে বেরিয়ে এসে আমি গান্ধীর জীবনী ও কার্যাবলীর উপর আধ ডজন বই কিনে ফেললাম।

অনেকের মত আমিও গান্ধীর কথা শুনেছি বটে, কিন্তু কখনও যথোচিত গুরুত্বসহকারে তাঁর উপর পড়াশুনা তেমন করিনি। এখন যতই পড়তে থাকলাম, ততই আমি তাঁর অহিংস আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকি। বিশেষ করে সমুদ্রের দিকে তাঁর লবণ অভিযান এবং বহু সংখ্যক অনশন আমাকে মুগ্ধ করে। সত্যাগ্রহের ধারণা এবং মর্মার্থ আমার কাছে গভীর অর্থবহ হয়ে উঠতে থাকে। ('সত্য' বা ট্রুথ এক-অর্থে 'প্রেম', আর 'আগ্রহ' হচ্ছে 'শক্তি'। তাই সত্যাগ্রহের মানে হল 'সত্য শক্তি বা প্রেম শক্তি')। গান্ধী দর্শনের যতই গভীরে প্রবেশ করতে থাকি, ততই প্রেমের শক্তি সম্বন্ধে আমার সংশয় কেটে যেতে থাকে এবং সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে এর যে কি পরিমাণ শক্তি আছে এই প্রথম আমি তা উপলব্ধি করি। গান্ধীর সম্বন্ধে পড়াশুনা করার আগে আমার ধারণা ছিল যে যীশুর নীতিকথা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমার মনে হয়েছিল 'অন্য গাল এগিয়ে দাও' এবং 'শত্রুকে ভালবাস'—এই জাতীয় দর্শন শুধুমাত্র ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংঘর্ষের বেলায় বলবৎ হতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন গোষ্ঠী বা জাতির মধ্যে যখন সংঘর্ষ বাধে তখন আরও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। গান্ধীর উপর পড়াশুনা করে আমি যে কত ভ্রান্ত ছিলাম তা বুঝতে পারলাম।

গান্ধীই বোধ হয় ইতিহাসের পাতায় প্রথম মানুষ যিনি যীশুর প্রেমের নীতিকে ব্যক্তিমানুষদের মধ্যেকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্তর থেকে একটি প্রবল কার্য-কারী সামাজিক শক্তি হিসাবে বৃহত্তর ক্ষেত্রে উন্নীত করেছেন। গান্ধীর কাছে প্রেম ছিল সামাজিক এবং সামগ্রিক পরিবর্তন সাধনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। প্রেম এবং অহিংসার উপর গান্ধীর এতটা গুরুত্ব দেওয়ার মধ্যে আবিষ্কার করলাম সমাজ সংস্কারের সেই প্রক্রিয়া এবং কৌশল অনেকদিন ধরে যা আমি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।

বুদ্ধি এবং নীতিবোধের দিক থেকে যে তৃপ্তি বা সন্তোষ আমি পাইনি বেন্থাম ও মিলের হিতবাদ থেকে, হবসের 'সামাজিক চুক্তি' তত্ত্ব থেকে, রুশোর 'প্রকৃতির কাছে ফিরে যাও' এই আশাবাদ থেকে এবং নীট্শের 'অতিমানব' দর্শন থেকে, তা কিন্তু পেয়ে গেলাম গান্ধীর 'অহিংস প্রতিরোধ' দর্শনের মধ্যে। আমার এই প্রত্যয় জন্মাল যে নিপীড়িত মানুষের স্বাধীনতার সংগ্রামে এটিই একমাত্র নীতিসিদ্ধ এবং বাস্তবসম্মত বলিষ্ঠ পন্থা।

বুদ্ধিগত ভাবে অহিংসার দিকে আমার এগিয়ে যাওয়াটা কিন্তু এখানে শেষ হয়নি। ধর্মীয় বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের শেষ বছরে আমি রেইনহোল্ড্ নাইয়েবুরের (Rainhold Niebuer) লেখা পড়তে শুরু করলাম। নাইয়েবুরের লেখায় ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী এবং বাস্তবমুখী এমন সব উপাদান রয়েছে যা আমার মনকে নাড়া দিল এবং তাঁর 'সামাজিক নৈতিকতা' আমাকে এমনভাবে মুগ্ধ করেছিল যে আমি প্রায় একরকম বিনা বিচারে তিনি যা লিখেছেন তা গ্রহণ করার ফাঁদে পড়ে গেলাম।

প্রায় এই সময় আমি শান্তিবাদী ধ্যানধারণার উপর নাইয়েবুরের সমালোচনা পড়লাম। এক সময়ে নাইয়েবুর নিজেই শান্তিবাদীদের দলে ছিলেন। তিনি অনেক বছর ধরে 'ফেলোশিপ অফ্ রিকন্সিলিয়েশন্'-এর সভাপতি ছিলেন। ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকে শান্তিবাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে। শান্তিবাদের উপর তাঁর সমালোচনামূলক বিবৃতি তাঁর 'মর‍্যাল ম্যান্ এণ্ড্ ইমমর‍্যাল সোসাইটি' (Moral Man and Immoral Society) বইতে ছিল। এখানে তিনি এই যুক্তি দেখিয়েছেন যে সহিংস এবং অহিংস প্রতিরোধের মধ্যে কোনও সহজাত ও নৈতিক পার্থক্য কিছু নেই। এই দুই প্রণালীর সামাজিক ফলশ্রুতির মধ্যে পার্থক্য আছে বটে কিন্তু তাঁর মতে সেই পার্থক্যে তারতম্য আছে, প্রকারভেদ নেই। পরবর্তীকালে নাইয়েবুর এই যুক্তি দেখালেন যে, যখন অহিংস প্রতিরোধের দ্বারা সাফল্যের সঙ্গে একনায়কতান্ত্রিক নিপীড়নের প্রসার রোধ করার সম্ভাবনা থাকে না, তখন এই পন্থার উপর নির্ভর করাটা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক হবে। তাঁর মতে অহিংস প্রতিরোধ কেবল সফল হয় যে শ্রেণীর বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয় তাদের যদি কিছুমাত্র নীতিবোধ থাকে, যেমন বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে গান্ধীর সংগ্রামের ক্ষেত্রে ছিল। সবকিছুর শেষকথা হ'ল মানুষ—এই নীতির ভিত্তিতে নাইয়েবুর শেষে শান্তিবাদ প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর

দ্বিতীয়ত, মানুষের ব্যক্তিত্বের মূল্য এবং মর্যাদার যে একটি অধিবিদ্যক পটভূমি আছে তা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ডঃ ব্রাইটম্যানের মৃত্যুর ঠিক পূর্বে আমি তাঁর কাছে হেগেলীয় দর্শন পড়তাম। যদিও পাঠ্য বিষয়টি ছিল হেগেলের বিখ্যাত পুস্তক ফেনোমেনোলজি অফ্ মাইন্ড্ (Phenomology of Mind), তথাপি অবসর সময়ে আমি তাঁর ফিলজফি অফ্ হিস্টরি (Phylosophy of History) বই দু'খানিও পড়তাম। হেগেলের দর্শনে এমন কিছু কিছু বিষয় আছে যা আমি গ্রহণ করতে পারিনি। যেমন তাঁর সার্বভৌম আদর্শবাদ যুক্তির দিক থেকে আমার কাছে ত্রুটিপূর্ণ মনে হয়েছিল। এটি বহুকে একের মধ্যে বিলীন করে দেবে; কিন্তু তাঁর চিন্তাধারায় এমন দিকও আছে যা উদ্দীপিত করে। 'সত্য-সর্বাত্মক-বস্তু'—তাঁর এই বক্তব্য একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য সুসংবদ্ধ দার্শনিক রীতি। ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁর দ্বান্দ্বিক বিচারমূলক পদ্ধতি অনুসরণে আমি বুঝতে পারলাম যে উন্নয়ন আসে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

১৯৫৪ সালে আমার প্রথাগত শিক্ষা শেষ হয় এবং এই সমস্ত আপেক্ষিকভাবে পরস্পরবিরোধী বুদ্ধিগত প্রবণতাগুলি একটি সুস্পষ্ট সমাজদর্শনের রূপ নেয়। এই দর্শনের একটি প্রধান মতবাদ থেকে আমার এই প্রতীতি জন্মালো যে নিপীড়িত মানুষদের সামাজিক ন্যায় বিচার অর্জনের ক্ষেত্রে অহিংস প্রতিরোধ একটি প্রধান হাতিয়ার। অত্যাচারের প্রতিরোধ সম্বন্ধে এই সময় আমার ধারণা এবং মূল্যায়ণ ছিল নিতান্তই বুদ্ধিগত। এটিকে সামাজিক স্তরে ফলপ্রসূভাবে সংগঠিত করার কোন সুদৃঢ় মনোভাব আমার মধ্যে তখন ছিল না।

যখন আমি একজন ধর্মযাজক হয়ে মন্টগোমারী যাই, তখন কল্পনা করতে পারিনি যে পরবর্তীকালে এমন একটি সংকটের মধ্যে আমি জড়িয়ে পড়ব যেখানে অহিংস প্রতিরোধ প্রয়োগ করা চলবে। আমি প্রতিবাদ করিনি, এমনকি প্রতিবাদের প্রস্তাবও রাখিনি। যখন প্রতিবাদ শুরু হ'ল, তখন সচেতন বা অচেতনভাবে আমার মনে এলো যীশুর ধর্মোপদেশের কথা, প্রেম সম্বন্ধে তাঁর মহত্তম শিক্ষার কথা এবং গান্ধী নির্দেশিত অহিংস প্রতিরোধের কথা। যত দিন যেতে লাগল, অহিংসার শক্তি আমি বেশি করে উপলব্ধি করতে লাগলাম। প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে গিয়ে অহিংসা আমার কাছে শুধুমাত্র একটি প্রক্রিয়া হয়ে রইলো না, যেটিকে আমি বুদ্ধির দিক থেকে গ্রহণ করেছিলাম, এটি আমার কাছে হয়ে উঠল একটি জীবনচর্যা প্রণালী, জীবনদর্শন। অহিংসা সম্বন্ধে অনেক কিছু যা আমার কাছে বুদ্ধিগতভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, বাস্তবক্ষেত্রে সে-সবের সমাধান পেয়ে গেলাম।

মন্টগোমারী আন্দোলনে অহিংসা দর্শনের একটি সুস্পষ্ট ভূমিকা ছিল। তাই এই দর্শনের কয়েকটি মৌল বিষয়ের উপর কিছু আলোচনা বিজ্ঞোচিত হবে।

প্রথমত মনে রাখা ভাল যে অহিংস প্রতিরোধ কাপুরুষের পথ বা পন্থা নয়।

বুঝতে হবে যে এটা প্রতিরোধ, অন্য কিছু নয়। হিংসাকে ভয় করে বা হিংসা প্রয়োগের জন্য অস্ত্রশস্ত্র নেই বলে যে ব্যক্তি অহিংসার পন্থা অবলম্বন করে সে আসলে অহিংস নয়। এই জন্যেই গান্ধী প্রায়ই বলতেন যে যদি ভীরুতা হিংসার বিকল্প হয়, তবে যুদ্ধ করাই ভাল। সব সময়ই অন্য একটি বিকল্প আছে—সেই চেতনাবোধ থেকে গান্ধী এই উক্তি করেছিলেন। কোন ব্যক্তির বা জনগোষ্ঠীর অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণের প্রয়োজন নেই এবং অন্যায়ের প্রতিকারের নিমিত্ত হিংসার আশ্রয় নেওয়ারও দরকার হবে না। অহিংস প্রতিরোধের পন্থা রয়েছে। এই পথ কিন্তু শক্তিমানের পথ। এটি নিষ্ফল নিষ্ক্রিয়তা নয়। 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' কথাটি অনেক সময় যেন 'কিছু না করা' গোছের একটি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে, যেখানে প্রতিরোধকারী শান্ত এবং নিষ্ক্রিয়ভাবে অন্যায়কে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর কিছু নেই। কারণ অহিংস প্রতিরোধকারী এই অর্থে নিষ্ক্রিয় যে সে প্রতিপক্ষের উপর দৈহিক আক্রমণ থেকে বিরত থাকে, কিন্তু তার মন এবং আবেগ সর্বদা সক্রিয় থাকে এবং সে প্রতিপক্ষকে অন্যায় সম্বন্ধে সজাগ করার প্রয়াস পায়। দৈহিকভাবে এই পদ্ধতি নিষ্ক্রিয় বটে, কিন্তু আত্মিক দিক থেকে অত্যন্ত সক্রিয়। এটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নয়, এটি আসলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় অহিংস প্রতিরোধ।

অহিংসার দ্বিতীয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য এটি প্রতিপক্ষকে পরাজিত বা অপমানিত করতে চায় না, বরং তার সঙ্গে একটি বন্ধুত্ব এবং বোঝাপড়ার সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী হয়। অহিংস প্রতিরোধকারী অনেক সময় অসহযোগ বা বয়কটের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাবে, কিন্তু তার এই বোধ আছে যে এগুলি আসল লক্ষ্যবস্তু নয়। এগুলি হ'ল প্রতিপক্ষের মধ্যে একটি নৈতিক লজ্জাবোধ জাগিয়ে তোলার উপায়-মাত্র। লক্ষ্য হ'ল প্রতিপক্ষের হৃদয়ের পরিবর্তন এবং একটি সম্মানজনক আপোষ-মীমাংসা। অহিংসার ফলশ্রুতি একটি প্রেমভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা, আর হিংসার ফলশ্রুতি দুঃখদায়ক তিক্ততা।

অহিংস সংগ্রামনীতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য—এর আক্রমণের সরাসরি লক্ষ্য যতটা অন্যায় এবং অশুভশক্তি, অন্যায়কারী ততটা নয়। অহিংস প্রতিরোধকারী অশুভ শক্তিকেই পরাভূত করতে চায়, অশুভ শক্তির কবলে পড়ে যে অন্যায় করে তাকে নয়। অহিংস প্রতিরোধকারী যদি জাতিগত অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তাহলে তার স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যে টেনশন বিভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে নয়। যেমন আমি মন্টগোমারীর জনসাধারণকে বলতে চাই, টেনশন শ্বেতাঙ্গ এবং নিগ্রোদের মধ্যে নয়। এই টেনশন মূলত রয়েছে ন্যায়বিচার এবং অবিচারের মধ্যে। এই সংগ্রামে যদি জয়লাভ হয়, সে জয় কেবল ৫০ হাজার নিগ্রোর নয়, তা হবে ন্যায় বিচার এবং শুভ শক্তির জয়। আমরা অন্যায়কে পরাস্ত করতে বদ্ধপরিকর, অন্যায়কারী শ্বেতাঙ্গদের নয়।

অহিংস প্রতিরোধের চতুর্থ বৈশিষ্ট এই যে, এতে স্বেচ্ছায় দুঃখ-কষ্টকে বরণ

করে নেওয়া হয়, প্রতিশোধ গ্রহণের কথা ওঠে না। শত্রুর আঘাতের প্রত্যুত্তরে তাকে প্রত্যাঘাত করা হয় না। গান্ধী তাঁর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "স্বাধীনতা অর্জন করতে গিয়ে রক্তের নদী বয়ে যাবে, কিন্তু সেই রক্ত হবে আমাদেরই রক্ত।" অহিংস সংগ্রামী—হিংসার আঘাত সহ্য করবে, কিন্তু হিংসার প্রয়োগ থেকে বিরত থাকবে। কারাবরণকে সে এড়িয়ে চলবে না। জেলে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে সে জেলে যাবে 'যেমন করে বর কনে বাসর ঘরে প্রবেশ করে'।

কেউ হয়ত প্রশ্ন তুলতে পারে—"অহিংস প্রতিরোধকারীর মানুষকে স্বেচ্ছায় দুঃখ বরণের আহ্বান অর্থাৎ 'আর এক গাল এগিয়ে দেওয়ার' নীতির সামগ্রিক প্রয়োগের যৌক্তিকতা কোথায়?" এই প্রশ্নের উত্তর হ'ল অনার্জিত দুঃখবরণ মানুষকে আত্মিক দিক থেকে উন্নীত করে। অহিংস প্রতিরোধকারী এই উপলব্ধিতে পৌঁছেছে যে দুঃখবরণের মধ্যে মানুষকে সংশিক্ষা দেওয়ার এবং মানুষের স্বভাবের রূপান্তর ঘটানোর প্রচণ্ড সম্ভাবনা রয়েছে। গান্ধী বলেছেন, "যেসব বাস্তব মৌলিক গুরুত্ব রয়েছে, কেবলমাত্র যুক্তিতর্কের মাধ্যমে মানুষ তা পেতে পারে না। সেগুলি পেতে হয় দুঃখের মূল্যে।" তিনি আরও বলেছেন, "প্রতিপক্ষের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটানো এবং যা ন্যায়ানুগ এবং সং তা তার কানে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে জঙ্গলের আইনের চাইতে দুঃখবরণ অনন্তগুণ বেশি শক্তিশালী। অন্যথায় সে ত যুক্তির বাণী কানেই আনে না।"

অহিংস প্রতিরোধের পঞ্চম বিষয়টি হ'লো এই যে তা কেবলমাত্র ব্যাহ্যিক হিংসাকেই এড়িয়ে চলে না উপরন্তু আভ্যন্তরীণ, অর্থাৎ অন্তস্থিত হিংসাকেও পরিহার করে। অহিংস প্রতিরোধকারী প্রতিপক্ষকে ত গুলি করে মারবেই না, এমনকি তার প্রতি কোনরকম বিদ্বেষভাবও পোষণ করবে না। অহিংসার কেন্দ্র-বিন্দুতে রয়েছে প্রেমের আদর্শ। অহিংস প্রতিরোধকারীর বক্তব্য হ'ল মানবীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দুনিয়ার নিপীড়িত মানুষ কোনপ্রকার তিক্ততা সৃষ্টির বা হিংসাত্মক অভিযান চালানোর প্রলোভন থেকে মুক্ত থাকবে। প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা বা চেষ্টা পৃথিবীতে হিংসা বিদ্বেষ শুধু বাড়িয়েই যাবে। জীবনচর্যার পথে কারো না কারো এমন চেতনা বা নীতিবোধ থাকা দরকার যাতে এই বিদ্বেষ পরম্পরার কোথাও যেন ছেদ ঘটে। আমাদের জীবনের কেন্দ্রভূমিতে প্রেমের আদর্শকে তুলে ধরতে পারলে এটা সম্ভব হবে।

এখানে প্রেমের কথা বলতে গিয়ে আমরা কোন ভাবপ্রবণ বা স্নেহপ্রবণ আবেগের কথা বলছি না। কোন মানুষকে স্নেহাসক্তির সংগে অত্যাচারীকে ভালবাসতে বলা অর্থহীন। বক্ষ্যমান প্রসঙ্গে প্রেমের অর্থ হ'ল পারস্পরিক বোঝাপড়া, সেই শুভ ইচ্ছা যা মনকে পাপ থেকে মুক্ত করে। এখানে গ্রীক ভাষা আমাদের সাহায্যে আসবে। গ্রীক নিউ টেষ্টামেন্টে 'প্রেম'-এর অর্থসূচক তিনটি শব্দ আছে। প্রথমে আছে 'এরস্' (eros) শব্দটি। প্ল্যাটোনির দর্শনে 'এরস্' (eros) বলতে

বোঝায় দিব্যলোকের (realm of the divine) প্রতি মানবাত্মার আকুতি। বর্তমানে এর অর্থ দাঁড়িয়েছে নান্দনিক বা রোমান্টিক প্রেম। দ্বিতীয় শব্দটি হ'ল 'ফিলিয়া' (Philia) যার দ্বারা বোঝায় বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের স্নেহ ভালবাসা। 'ফিলিয়া' এক অর্থে পারস্পরিক ভালবাসা; একজন অন্যজনকে ভালবাসবে, অন্য জন থেকে ভালবাসা পায় বলে। যারা আমাদের বিরুদ্ধবাদী তাদের প্রতি ভালবাসার কথা যখন বলা হয়, সেই ভালবাসা কিন্তু এরস বা ফিলিয়া নয়। সেই ভালবাসাকে গ্রীক ভাষায় বলা হয় 'আগাপে' (agape)। 'আগাপে' মানে হ'ল পারস্পরিক বোঝাপড়া, সমস্ত মানুষের প্রতি সদিচ্ছা যা কিনা সকল প্রকার হিংসা বিদ্বেষের ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়। এ হ'ল উচ্ছ্বসিত সার্বিক প্রেম যা একান্তভাবে অকৃত্রিম এবং স্বতস্ফূর্ত, যা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়, যা যুক্তিতর্কের অতীত এবং সৃষ্টিশীল। এটি হচ্ছে ভাগবৎ প্রেম যা মানুষের অন্তরে ক্রিয়াশীল। আগাপে হ'ল নিঃস্বার্থ ভালবাসা। সেই ভালবাসা যেখানে ব্যক্তি নিজের কল্যাণ নয়, প্রতিবেশীর কল্যাণ খুঁজে বেড়ায়। আগাপে শুরু হয় ভাললোক এবং মন্দলোকের তারতম্যের বা ব্যক্তির গুণাবলীর হিসেবনিকেশ করে নয়। এটি শুধু অপরকে ভালবাসার জন্যই ভালবাসা। এটি একান্তভাবেই প্রতিবেশীর হিত চিন্তা, প্রত্যেক মানুষই প্রতিবেশী এই বোধ। কাজেই আগাপে বন্ধু এবং শত্রুর মধ্যে কোন পার্থক্য দেখে না; এই প্রেম উভয়ের দিকেই ধাবিত হয়। কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে তার সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্যই ভালবাসে, তবে সেই বন্ধুত্ব থেকে ফায়দা ওঠাবার জন্য যতটা এই ভালবাসা, বন্ধুর জন্য ততটা নয়। অতএব ভালবাসা যে নিঃস্বার্থ এ' বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে তখন যখন কেউ ভালবাসবে তার শত্রুর-প্রতিবেশীকে যার থেকে শত্রুতা এবং পীড়ন ছাড়া ভাল কিছু প্রত্যাশা করার নেই। আগাপে সম্বন্ধে আরেকটি মৌল ব্যাপার এই যে এর উৎস অপর ব্যক্তির প্রয়োজন থেকে—সে প্রয়োজন হ'ল সমগ্র মানব পরিবারে যারা শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত তাদের অন্যতম হওয়া। যে স্যামারিটাণ (Samaritan) যেরিকো সড়কের (Jericho Road) উপর ইহুদিকে সাহায্য করেছিলেন, তিনি ছিলেন একজন উত্তম উঁচুমানের মানুষ, কেননা তিনি একটি মানবিক প্রয়োজনের মুখোমুখি হয়ে তাতে সাড়া দিয়েছিলেন। ঈশ্বরের প্রেম শাশ্বত এবং তা ব্যর্থ হয় না। তাই ঐশী প্রেমের প্রয়োজন মানুষের রয়েছে। সেন্ট্ পল্ নিশ্চিত আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে যীশু পাপমুক্তির জন্য প্রেমসিঞ্চিত কার্যটি করেছিলেন যখন আমরা পাপাসক্ত ছিলাম, অর্থাৎ ঠিক সেই মুহূর্তে যখন প্রেমের প্রয়োজন আমাদের সবচেয়ে বেশি ছিল। যেহেতু বর্ণবৈষম্যের জন্য শ্বেতাঙ্গ মানুষের ব্যক্তি-সত্তার মারাত্মক বিকৃতি ঘটেছে, সেইহেতু তার প্রয়োজন নিগ্রোদের ভালবাসা। নিগ্রোদের, শ্বেতাঙ্গকে ভালবাসতেই হবে, কেননা শ্বেতাঙ্গ মানুষের সেই ভাল-বাসার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তার টেন্শন, নিরাপত্তাবোধের অভাব এবং ভয় থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্য।

আগাপে (agape) দুর্বল নিষ্ক্রিয় প্রেম নয়। এটি সক্রিয় প্রেম। আগাপে এমন প্রেমের সন্ধান দেয় যা সমাজকে রক্ষা করে, সৃষ্টি করে। এমনকি কেউ যখন সমাজকে ভাঙবার চেষ্টা করে, তখন এই প্রেম সমাজকে রক্ষা করার প্রয়াস পায়। আগাপে পারস্পরিকভাবে মানুষকে ত্যাগ স্বীকারেও উন্মুখ করে। আগাপে সামাজিক সুসম্পর্ক স্থাপনের একটি বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি—সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই প্রেম মাঝপথে থেমে থাকে না, শেষ ধাপ পর্যন্ত এগিয়ে যায়। সমাজকে সৌহার্দ্য এবং সুসম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে এই প্রেম মানুষের দোষ-দুর্বলতাকে ক্ষমা করতে পারে, সাতবার নয়, দরকার হলে সত্তরবার। ভগ্ন সমাজের পুনরুদ্ধারের জন্য ঈশ্বর কতদূর যেতে পারেন, তার প্রতীক চিহ্ন হল ক্রুশ (Cross)। যে অশুভ শক্তি সমাজের পথরোধ করে দাঁড়ায়, তার উপর ঈশ্বরের জয়ের স্মারক হ'ল প্রভু যীশুর পুনরুত্থান (Resurrection)। পবিত্র সত্তা (The Holy Spirit) হ'ল নিত্য চলমান সমাজ যা ইতিহাসের মধ্য দিয়ে অগ্রসরমান বাস্তব সত্যকে স্বীকার করা। যে ব্যক্তি সমাজের শত্রুতা করে, সে ঈশ্বরের সৃষ্টির বিরুদ্ধে কাজ করে। অতএব আমি যদি ঘৃণা বিদ্বেষের জবাব ঘৃণা বিদ্বেষের মাধ্যমেই দিই, তাহ'লে ভগ্ন সমাজের ভগ্নতাকে আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যখন ভালবাসা দিয়েই ঘৃণা ও বিদ্বেষের মোকাবিলা করতে পারি, কেবল তখনই ভগ্ন সমাজের ভগ্ন অংশগুলিকে জুড়ে দিতে পারি। কিন্তু আমি যদি ঘৃণা দিয়ে ঘৃণাকে রোধ করতে যাই, তা হ'লে আমার ব্যক্তি সত্তার বিলুপ্তি ঘটবে, কেননা সৃষ্টির ধরণটাই এমন যে কেবল সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই আমার ব্যক্তিত্ব সার্থকতা লাভ করতে পারে। বুকার টি· ওয়াশিংটন সত্যিই বলেছেন, "কেউ যেন তোমাকে এত নীচে টেনে না নামায়, যার ফলে তোমার বিদ্বেষ জন্মায়।" তেমন স্তরে সে যদি তোমাকে টেনে নামায় তা হ'লে সে তোমাকে সমাজের বিরুদ্ধবাদী করে তুলবে, সে তোমাকে সমস্ত সৃষ্টিকে অমান্য করার দিকে টেনে নিয়ে যাবে এবং তার ফলে তোমার ব্যক্তিসত্তার বিনষ্টি ঘটবে।

শেষ পর্যন্ত আগাপের অর্থ দাঁড়ায় সামগ্রিক জীবন যেটি পরস্পর-সম্পর্কিত—এই সত্যের স্বীকৃতি। সমগ্র মানবজাতিই একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে জড়িয়ে আছে এবং সব মানুষ ভাই। ভাই আমার প্রতি যাই করুক না কেন, আমি আমার ভাইয়ের যে পরিমাণ ক্ষতি করব, সেই পরিমাণ ক্ষতি আমি আমার নিজের প্রতিই করব। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, শ্বেতাঙ্গেরা নিগ্রোদের স্বাধিকার দান এড়াবার উদ্দেশ্যে প্রায়শ যুক্তরাষ্ট্রীয় অনুদান নিতে অস্বীকার করে ; কিন্তু যেহেতু সব মানুষই ভাই, তারা নিজেদের সন্তানদের ক্ষতি না করে নিগ্রো শিশুদের তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। ভিন্ন ফললাভের চেষ্টা সত্ত্বেও নিজেদের উপর আঘাতের মধ্যে সবকিছুর সমাপ্তি ঘটে। এমন কেন হয় ? কারণ সব মানুষ ভাই। তুমি যদি আমার ক্ষতি কর, তাহ'লে তুমি তোমার নিজেরই ক্ষতি করবে। আগাপে অর্থাৎ প্রেম ভগ্ন সমাজকে দৃঢ়নিবদ্ধ রাখার উপায় এবং উপাদান। আমি যখন প্রেমের দ্বারা

নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হই, তখন সমাজকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা, অন্যায়কে প্রতিরোধ করা এবং আমার ভাইদের প্রয়োজন সিদ্ধ করা এই কর্তব্যবোধও আমাকে পরিচালিত করে।

অহিংস প্রতিরোধ সম্বন্ধে ষষ্ঠ মৌল কথা হ'ল—সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ন্যায়-বিচারের পক্ষে রয়েছে এই প্রত্যয়টি। ফলে অহিংসায় বিশ্বাসী ব্যক্তির ভবিষ্যতের উপর গভীর আস্থা থাকে। কি করে অহিংস প্রতিরোধকারী প্রতিশোধ নেওয়ার পথে না গিয়ে দুঃখযন্ত্রণাকে বরণ করে নিতে পারে তার অন্যতম কারণ ভবিষ্যতের প্রতি তার অন্তহীন গভীর বিশ্বাস। কেননা সে জানে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামে নিখিল বিশ্ব তার সাথে রয়েছে। এটা ঠিক যে এমন সব অহিংসায় নিষ্ঠা-বান বিশ্বাসী মানুষ আছেন যাঁদের পক্ষে ব্যক্তিসত্তাবিশিষ্ট ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু এই সমস্ত মানুষও একটি সৃজনশীল শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, যা সার্বভৌম সমগ্রতা সৃষ্টির কাজে সতত ক্রিয়াশীল। আমরা এটিকে অচেতন প্রক্রিয়া, নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্ম অথবা অসীম শক্তি এবং অনন্ত প্রেমের আধার ব্যক্তিসত্তা বিশিষ্ট পরমপুরুষ যাই বলি না কেন, এটি সত্য যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী এমন এক সৃজনশীল শক্তি আছে যা বাস্তব সত্তার বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে একটা সুসঙ্গত সমগ্রতার মধ্যে ধরে রাখে।

এখান থেকে যাই কোথায় ?

(হোয়ার টু গো ফ্রম হিয়ার)

আলাবামার মণ্টগোমারীতে বাসে যাতায়াতের অধিকার নিয়ে সংগ্রাম এখন ইতিহাস হয়ে আছে। নানা গাত্রবর্ণের যাত্রীদের নিয়ে একীকৃত বাসগুলি যখন রাস্তা দিয়ে চলে, তখন তারা যাত্রীদের সংগে একটি অর্থবহ প্রতীকও বহন করে। অধিকাংশ যাত্রীদের মধ্যে মতৈক্য, মানুষের প্রতি মানুষের সদিচ্ছা এবং বিভক্ত সমাজের মধ্যে শান্তি স্থাপনের ইঙ্গিত। মাঝে মধ্যে যাত্রীদের মধ্যে যে মতানৈক্য দেখা দেয় তা এ'কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে মণ্টগোমারীতে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও ব্যক্তিগত সংঘর্ষের অনিষ্টকর সম্ভাবনা নিয়ে জাতিবৈষম্য এখনও বিদ্যমান। বস্তুত জাতিবৈষম্য সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলে এখন একটি বাস্তব সত্য।

এখান থেকে আমরা যাই কোথায় ? যেহেতু মণ্টগোমারীর সমস্যা বৃহত্তর জাতীয় সমস্যার বহিলক্ষণ, সুতরাং আমরা কি শুধু মণ্টগোমারীতে না গিয়ে সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলে তথা জাতীয় স্তরে চলে যাব ? বছরের পর বছর যে শক্তিগুলি দানা বেঁধে উঠেছে, সেগুলিই বর্তমান গোষ্ঠী সম্পর্কের মধ্যে সংকট সৃষ্টি করেছে। কি সেই সমস্ত শক্তি যা এই সংকটের উদ্ভব ঘটিয়েছে ? সিদ্ধান্তটি কি হবে ? আমরা কি একটি সামাজিক এবং রাজনৈতিক অচলাবস্থার মধ্যে এসে পড়েছি ; অথবা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে কি এমন সৃষ্টিধর্মী সম্পদ আছে যার দ্বারা সৌভ্রাতৃত্ব এবং সমন্বয়ের পরিবেশে বেঁচে থাকার আদর্শ রূপায়িত হতে পারে ?

বিগত অর্ধ শতাব্দীতে আমেরিকান নিগ্রোদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। দু'টি মহাযুদ্ধের ফলশ্রুতিস্বরূপ উদ্ভূত সামাজিক পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মন্দা এবং যানবাহন ব্যবস্থার বিস্তার গ্রামীণ চাষ আবাদের মধ্যে আবদ্ধ পূর্ববর্তী বিচ্ছিন্ন জীবনধারা থেকে নিগ্রোদের দূরে টেনে যাওয়া সম্ভবপর এবং অত্যাবশ্যক করে তুলেছে। চাষবাসের ক্রমাবনতি এবং সমান্তরালভাবে শিল্পের অগ্রগতি বহুসংখ্যক নিগ্রোকে নগরে টেনে এনেছে, ক্রমশ তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছে। নতুনের সংস্পর্শে এসে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হয়েছে এবং শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে তাদের এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাব্যতা দেখা দিয়েছে। এ সমস্ত বিষয় সংযোজিত হওয়ার ফলে নিগ্রোরা নিজেদের নতুনভাবে দেখতে শুরু করল। তাদের প্রসারমান জৈবনিক অভিজ্ঞতা তাদের মধ্যে এই বোধ সৃষ্টি করল যে বৃহত্তর সমাজ পত্তনের ক্ষেত্রে তারা একটি সম উপাদান। অতএব তাদের নতুন সামাজিক দায় দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাদের সবরকম অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা দেওয়া উচিত। একদা দাসত্ব এবং বর্ণবৈষম্যের পংগুত্ব থেকে উদ্ভূত হীনমন্যতায় জর্জরিত নিগ্রোরা আজ নিজেদের নতুনভাবে যাচাই করে দেখছে। তাদের এই বোধ জেগেছে যে তারা একজন কেউ বটে। তাদের ধর্ম তাদের কাছে এই সত্য

প্রকটিত করছে যে ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের ভালবাসেন এবং মানুষ সম্বন্ধে আসল কথা হ'ল একজন মানুষ কেবল তার স্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্য নয়, তার মৌল সত্তা ; ঈশ্বরের কাছে তার চিরন্তন মূল্যই আসল বস্তু, তার চুলের গড়ন বা চামড়ার রঙ্ নয়।

যতদিন পর্যন্ত না প্রথম শ্রেণীর নাগরিকত্ব একটি বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে, ততদিন এই ক্রমবর্ধমান আত্মসম্মানবোধ নিগ্রোদের সংগ্রাম ও ত্যাগের পথে এগিয়ে যাওয়ার সংকল্পে অনুপ্রাণিত করেছে। মণ্টগোমারীর-কাহিনীর এই হচ্ছে মর্মকথা। দক্ষিণাঞ্চলে নতুন আত্মসম্মান এবং নতুন নিয়তি সচেতন এক নতুন নিগ্রোর আবির্ভাব ঘটেছে এটি বুঝতে না পারলে কেউ মণ্টগোমারীতে বাস সংক্রান্ত প্রতিবাদের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারবে না।

নিগ্রোর পরিবর্তনশীল নতুন ভাবমূর্তির সংগে সংগে লক্ষ লক্ষ শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের মধ্যে গড়ে উঠেছে এক নৈতিক বিবেকবোধ। 'ডিক্লারেশন অফ্ ইণ্ডিপেনডেন্স্' সাক্ষরিত হওয়ার সময় থেকে জাতিগত প্রশ্নে আমেরিকা এক ধরনের ব্যাধিগ্রস্ত মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। তার দ্বৈত সত্তার মধ্যে টানাপোড়ন চলেছে—এক সত্তায় সে গর্বের সংগে গণতন্ত্রের আদর্শ প্রচার করেছে, অন্য সত্তায়, পরিতাপের বিষয়, সে গণতন্ত্রবিরোধী কাজে লিপ্ত থেকেছে। জাতিপৃথকীকরণের অস্তিত্ব, দাসত্বপ্রথার মত, সর্বদা গণতান্ত্রিক আদর্শ এবং খ্রীষ্টান ধর্মের পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত জাতিপৃথকীকরণ এবং গোষ্ঠীগত বৈষম্য 'সকল মানুষ সমান' এই নীতির উপর স্থিত এবং প্রতিষ্ঠিত একটি ন্যাশন্ বা জাতির মধ্যে এক অতি অদ্ভুত হেঁয়ালি যেন। এই স্ববিরোধিতা উত্তর ও দক্ষিণের শ্বেতাংগদের বিবেককে নাড়া দিয়েছে এবং ফলে অনেকে বুঝতে পেরেছেন যে জাতিপৃথকীকরণ মূলত অতীব মন্দ ব্যাপার।

এই প্রক্রিয়ার চরম পরিণতি হ'ল সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক পাবলিক স্কুলে জাতি পৃথকীকরণ নীতিকে বে-আইনী ঘোষণার মধ্যে। প্রত্যেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, মানুষের কাছে ১৯৫৪ সালের ১৭ই মে দিনটি জবরদস্তিমূলক জাতিপৃথকীকরণের দীর্ঘ রাত্রির আনন্দদায়ক অবসান হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। দ্বিধাহীন ভাষায় আদালত রায় দিয়েছে যে 'পৃথক অথচ সমান' সুযোগসুবিধা কার্যত অসম এবং একটি শিশুকে তার গোষ্ঠীর নিরিখে পৃথক রাখার এই সমান আইনগত নিরাপত্তা থেকে সেই শিশুকে বঞ্চিত করা। এই রায় লক্ষ লক্ষ স্বাধিকারবঞ্চিত নিগ্রোদের কাছে আশার বাণী নিয়ে এল যারা প্রথাগতভাবে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখার সাহস পেত মাত্র। অধিকন্তু এটি নিগ্রোদের আত্মমর্যাদা বোধকে আরও বাড়িয়ে দিল এবং তাদের অধিকতর ন্যায়বিচার আদায়ের সঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ করে তুলল।

নিগ্রো আমেরিকানরা সর্বপ্রকার অত্যাচার থেকে মুক্তি অর্জনের সঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ হয়েছে সেই গভীর প্রত্যাশা থেকে যা তাবৎ দুনিয়ার নিপীড়িত মানুষদের উদ্বুদ্ধ করেছে। এশিয়া এবং আফ্রিকার যে অসন্তোষের গুড়্ গুড়্ ধ্বনি শোনা যাচ্ছে, তা হচ্ছে যারা দীর্ঘকাল ঔপনিবেশিকতাবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের শিকার

হয়েছে, তাদের স্বাধীনতা এবং মানবিক মর্যাদা অন্বেষণের প্রকাশ। অতএব প্রকৃত অর্থে আমেরিকার জাতিগত সংকট হচ্ছে বৃহত্তর বিশ্বসংকটের অংশবিশেষ।

কিন্তু যেসব অসংখ্য পরিবর্তন, নিগ্রোদের ভিতর একটি নতুন মর্যাদাবোধ সৃষ্টির মধ্যে সমীকৃত হয়েছে সেগুলি বর্তমান সংকটের জন্য দায়ী নয়। যদি সকল মানুষ সদবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে এই ঐতিহাসিক পরিবর্তন সমূহ মেনে নিত, তা হ'লে কোন সংকটই দেখা দিত না। এই সংকট গড়ে উঠল যখন নিগ্রোদের যথার্থ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সমবেত চাপ একটানা কঠোর প্রতিরোধের মুখে পড়ল। তখন গণতান্ত্রিক সাম্যনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ক্রমপ্রসারমান নতুন রীতিনীতি অভিভাবকত্ব ও অধীনতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত পুরনো রীতি-নীতির মুখোমুখি হ'ল। বহিরাগত বিক্ষোভকারীরা, এন.এ.এ.সি.পি'র লোকেরা মন্টগোমারীর প্রতিবাদীরা এমনকি সুপ্রিম কোর্টও এই সংকট সৃষ্টি করেনি। আপাতবিরোধী মনে হ'লেও এই সংকট বেড়ে উঠল যখন আমেরিকান গণতন্ত্রের অতি মহৎ নীতিসমূহ, যে গুলির তাৎপর্য দু'শ বছরেও পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করা যায়নি, পূর্ণতা লাভ করতে আরম্ভ করল এবং সংগে সংগে পাশবিক শক্তির প্রতিরোধের সম্মুখীন হ'ল যা স্বাধীনতার স্ফুরণকে সংকুচিত ও নিষ্পেষিত করার চেষ্টায় মেতে উঠল।

এই প্রতিরোধ সময় সময় বড় অশুভ চেহারা নিয়েছে। অনেকগুলি অংগ-রাজ্যের প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটেছে কেন্দ্রীয় নীতি নির্দেশের খোলাখুলি অমান্যের মধ্যে। দক্ষিণের বিধানসভাগুলির হলঘরে এখনও 'চাপিয়ে দেওয়া', 'নাকচ করা' ইত্যাদি কথা সশব্দে উচ্চারিত হয়ে থাকে। অনেক সরকারী কর্মচারী তাদের সরকারী ক্ষমতা দেশের আইন লংঘনে ব্যবহার করে থাকে। তাদের কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজকর্ম, উত্তেজক বিবৃতি এবং সত্যের বিকৃতি ও অর্ধসত্য প্রচারের দ্বারা তারা সুযোগসুবিধাবঞ্চিত অশিক্ষিত শ্বেতাংগদের মনে অস্বাভাবিক ভীতি এবং অসুস্থ বিরূপতা সৃষ্টি করতে সফল হয়েছে। ফলে উত্তেজনা এবং বিভ্রান্তির দ্বারা চালিত হয়ে তারা এমন সব হীন এবং হিংস্র কাজ করতে থাকে যা সুস্থ মনের মানুষ কখনও করে না।

নতুন সমাজব্যবস্থার উদ্ভবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ মূর্ত হয়ে উঠেছে কিউ ক্লাক্স্ ক্ল্যানের পুনরাবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। যে কোন মূল্যে জাতি পৃথকীকরণ বজায় রাখার সঙ্কল্প নিয়ে এই সংঘটি রূঢ় এবং বর্বর পদ্ধতি প্রয়োগ করতে থাকে। সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত গোষ্ঠীদের মধ্য থেকে এই সংঘটি তাদের সদস্য সংগ্রহ করে যারা নিগ্রোদের সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মধ্যে একটি রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আশংকার আভাস পায়। যদিও ক্ল্যান্ রাজনৈতিকভাবে বন্ধ্যা এবং সব দিক থেকে প্রকাশ্যে ধিকৃত, তথাপি এটি একটি বিপজ্জনক শক্তি যা জাতি-বৈষম্যগত এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির উপর টিকে আছে। এর অতীত ইতিহাসের দরুণ যখনই ক্ল্যান সক্রিয় তখনই হিংস্র কিছু ঘটার আশংকা দেখা দেয়।

তারপর রয়েছে হোয়াইট্ সিটিজেন্স্ কাউন্সিল। যেহেতু তারা ক্ল্যানের চেয়ে উচ্চতর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক স্তর থেকে সদস্য সংগ্রহ করে থাকে, তাই তাদের অর্থাৎ কাউন্সিলকে ঘিরে থাকে কিছুটা মর্যাদার দ্যুতি। কিন্তু ক্ল্যানের মত, আইনের বিধান সত্ত্বেও, তারা জাতিবৈষম্য বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। তাদের ভীতিপ্রদর্শন, আতঙ্কসৃষ্টি, বয়কট ইত্যাদি অস্ত্র প্রযুক্ত হয় নিগ্রোদের এবং যে-সব শ্বেতাঙ্গ মানুষ ন্যায়ের সমর্থক তাদের বিরুদ্ধে। তাদের দাবী শ্বেতাঙ্গদের পুরোপুরি সমর্থন এবং নিগ্রোদের ন্যক্কারজনক আত্মসমর্পণ। সিটিজেন্স্ কাউন্সিল প্রায়শ বকধার্মিকের মত বলে থাকে যে হিংসায় তারা বিতৃষ্ণ। কিন্তু তাদের আইনলঙ্ঘন, নীতিবিরুদ্ধ কার্যধারা এবং বিদ্বেষপূর্ণ প্রকাশ্য ঘোষণা সমূহ অনিবার্যভাবে এমন আবহাওয়া সৃষ্টি করে যেখানে হিংসা প্রশ্রয় পায় এবং টিকে থাকে।

কাউন্সিলের কার্যকলাপের ফলে দক্ষিণের নরমপন্থী শ্বেতাঙ্গরা সামাজিক বহিষ্কার এবং অর্থনৈতিক প্রতিশোধের ভয়ে জাতিপৃথকীকরণ রোধের বিষয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করতে সাহস পায় না। একদা শ্বেতাঙ্গ এবং নিগ্রোদের মধ্যে যোগাযোগের যে-সব প্রথা বা পন্থা বিদ্যমান ছিল তা অনেকাংশে রুদ্ধ হয়ে গেছে।

জাতিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে বর্তমানে সংকটের এমন সব বৈশিষ্ট্য আছে যা সামাজিক বিবর্তনের সময়ে সামনে এসে পড়ে। স্থিতাবস্থার ধারক বাহকেরা যে ব্যক্তি বা সংগঠনকে নতুন সমাজব্যবস্থার উদ্ভবের জন্য দায়ী মনে করে তারা সেই ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে থাকে। প্রায়শ এই বিষোদ্গার বড়ই সোচ্চার হয়ে ওঠে। দাসত্ব থেকে সীমিত মুক্তিসঞ্জাত বিবর্তনের মুখে আব্রাহাম লিঙ্কনকে হত্যা করা হয়েছিল। হাল আমলে পৃথকীকরণের অ-পৃথকীকরণে বিবর্তিত হওয়ায় সুপ্রিমকোর্টকে কঠোর সমালোচনার মুখে পড়তে হচ্ছে এবং এন্ এ. এ. সি. পি-র বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা হচ্ছে এবং এটিকে আইন-বিরুদ্ধ প্রতিহিংসার শিকার করে তোলা হচ্ছে।

অন্যান্য সামাজিক সংকটের বেলায় যেমন হয়ে থাকে, তেমনিভাবে দক্ষিণের স্থিতাবস্থার সমর্থকেরা এই তর্ক তোলেন যে বাইরের চাপ তাঁদের উপরে এসে না পড়া পর্যন্ত তাঁরাও নিজেরাই ধীরে ধীরে সমস্যাগুলির সমাধান করেছিলেন। আজ দক্ষিণাঞ্চলের এক সুপরিচিত অভিযোগ হচ্ছে যে সুপ্রিম কোর্টের রায় তাদের জাতিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক প্রজন্ম পিছিয়ে দিয়েছে ; জনগণ যারা একসঙ্গে শান্তিতে বসবাস করত, তারা একে অন্যের বিরোধী হয়ে পড়েছে। কিন্তু এভাবে আসলে যা ঘটে চলেছে, তার ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। যখন কোন পরাধীন জাতিগোষ্ঠী স্বাধীনতার দিকে এগোতে থাকে তখন তারা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে না। বরং তারা বিচ্ছিন্নতাকে প্রকাশ করে দেয় যা পুরনো ব্যবস্থার সমর্থকেরা ঢেকে রাখার চেষ্টা করে। আজ যুক্তরাষ্ট্রে সংহতি আন্দোলন বিচ্ছিন্নতা

সৃষ্টি করছে না। যে বিচ্ছিন্নতা বজায় ছিল, যার গভীরতার আসল প্রকৃতি নরম-পন্থীরা দেখতে পাননি, স্পষ্ট করে তুলতে পারেননি, তারই প্রকাশ ঘটেছে সংহতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে।

সংকটের দিনগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসকদলে যাঁরা উদার মত পোষণ করেন তাঁদের প্রভাবিত করার জন্য একটি বেপরোয়া চেষ্টা চালিয়েছিল উগ্রবাদীরা। যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গরা উত্তরের শ্বেতাঙ্গদের এটি বোঝাতে চায় যে নিগ্রোরা স্বভাবতই অপরাধপ্রবণ। উত্তরাঞ্চলের সমাজে নিগ্রোদের অপরাধমূলক কাজ এবং তরুণদের অপরাধপ্রবণতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তারা বলে, "এই দেখ, নিগ্রোরা তোমাদের কাছে সমস্যা হয়ে উঠেছে। তারা যেখানেই যায়, সেখানেই সমস্যা সৃষ্টি করে।" পরিস্থিতির আসল চেহারার উল্লেখ না করে অভিযোগটি আনা হয়। অপরাধপ্রবণতার পরিবেশগত সমস্যাকে জাতিগত অপরাধপ্রবণতার নজির বলে ব্যাখ্যা করা হয়। উত্তরাঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহে যে সমস্ত সংকট দেখা দেয়, সেগুলি নিগ্রোদের প্রকৃতিগত অপরাধপ্রবণতার প্রমাণ বলে ব্যাখ্যাত হয়। উগ্রবাদীরা স্বীকার করতে চায় না যে বিদ্যালয়ের এই সমস্ত সমস্যা হচ্ছে নাগরিক অস্থিরতার লক্ষণ, জাতিগত ত্রুটির প্রকাশ নয়। অপরাধ-প্রবণতা এবং উম্মার্গগামীতা জাতিগত ব্যাপার কিছু নয়; জাতি গোষ্ঠী যাই হোক না কেন, অপরাধপ্রবণতার উদ্ভব হয় দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতা থেকে।

উত্তর ও দক্ষিণের উদারপন্থীদের মনকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে পৃথকী-করণের সমর্থকেরা প্রায়শ কূটচাল ও চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে থাকে। অতি চালাকেরা বাইবেলের ভিত্তিতে পৃথকীকরণ এবং জাতিগত নিকৃষ্টতার বৈধতা নিয়ে বক্তব্য রাখে না। তারা বক্তব্য দাঁড় করায় তথাকথিত সাংস্কৃতিক এবং সমাজতাত্ত্বিক কারণ দেখিয়ে। তারা বলে নিগ্রোরা সংহতির জন্য প্রস্তুত নয়; যেহেতু নিগ্রোরা শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনগ্রসর, বিদ্যালয়গুলির সংহতিকরণ শ্বেতজাতিকে টেনে নীচে নামাবে। একথাটি স্বীকার করার মত সততা তাদের নেই যে শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা হচ্ছে জাতি পৃথকীকরণ এবং জাতিগত বৈষম্যের ফলশ্রুতি। যে-কোন সমস্যার সমাধানের প্রকৃষ্টতম পন্থা হচ্ছে সেই সমস্যার মূলীভূত কারণ সমূহের দূরীকরণ। পৃথকীকরণের ভয়াবহ পরিণতিকে ওই নীতি চালু রাখার সপক্ষে যুক্তি হিসেবে খাড়া করা যৌক্তিকতার দিক থেকে দুর্বল বা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে সমর্থনের অযোগ্য।

দক্ষিণাঞ্চলের আইনসভাসমূহের আইন লঙ্ঘন, 'শ্বেতপ্রাধান্য' সংস্থাগুলির কার্যকলাপ এবং পৃথকীকরণ-নীতির ধারক-বাহকদের আসল সত্যের বিকৃতিকরণ এবং এটিকে যুক্তিগ্রাহ্য বলে দেখানোর প্রয়াস-এর মত হিসাবী কাজের ধরণধারণ-গুলির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। এই প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে দক্ষিণী শ্বেতাঙ্গদের সামন্ততান্ত্রিক আবাদ ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত তথাকথিত মানবিক মূল্যবোধ অব্যাহত রাখার বেপরোয়া প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়া রূপে। এই ধরণের

মূল্যবোধ নাগরিকীকরণ এবং শিল্প প্রসারণের দিনে টি'কে থাকতে পারে না। এসব ব্যাপার রয়েছে বর্তমান সংকটের মূলে।

দক্ষিণের বিদ্যালয়গুলি এখনকার ঝড়ঝঞ্ঝার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে-সমস্ত শক্তি আমাদের জাতীয় জীবনে যা-কিছু শ্রেয় তার পেছনে ক্রিয়াশীল—সেগুলি এখানে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। বিদ্যালয় পৃথকীকরণ ব্যবস্থাকে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক সংবিধান বিরোধী ঘোষণার এক বছর পরে কোর্ট কিভাবে সংহতিকরণের কাজ সুচিন্তিতভাবে দ্রুততার সঙ্গে চালিয়ে নিতে হবে, সে সম্বন্ধে রূপরেখা সম্বলিত আদেশ জারী করেছিল। কোর্ট এ'কাজটি শেষ করার জন্য কোন সময়-সীমা বেঁধে দেয়নি বটে, তবে কাজ শুরু করার দিনক্ষণ ঠিক করে দিয়েছিল। এ'টি সুস্পষ্ট যে কোর্ট এই যুক্তিসংগত পন্থা বেছে নিয়েছিল এই আশা নিয়ে যে শুভেচ্ছামূলক শক্তিসমূহ অনতিবিলম্বে সক্রিয় হয়ে উঠবে এবং সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়-গুলিকে সহজ এবং শান্তিপূর্ণ রূপান্তরের জন্য তৈরি করে তুলবে।

কিন্তু শুভেচ্ছামূলক শক্তিসমূহ এ'গিয়ে আসতে ব্যর্থ হ'ল। প্রেসিডেন্টের দপ্তর আশ্চর্যজনকভাবে নীরব থাকল। যদি এই ক্ষমতাশীল মহল থেকে অন্তত একটিমাত্র কথায় জাতিকে সংহতির নৈতিক দিকগুলি ভেবে দেখতে এবং আইন মেনে চলতে উপদেশ দিত, তা হ'লে দক্ষিণাঞ্চলকে হালফিল বিভ্রান্তি এবং সন্ত্রাস থেকে অনেকটা বাঁচানো যেত। ন্যায় বিচার কায়েম করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শক্তিগুলি সক্রিয় হতে ব্যর্থ হ'ল। একথা সত্য যে কোর্টের রায় প্রকাশের অব্যবহিত পরে প্রধান প্রধান গীর্জা, শ্রম-সংগঠন এবং সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলির নেতারা রায়ের সমর্থনে বিবৃতি দিয়েছিল এবং তাদের প্রতিষ্ঠানগুলি সেই মর্মে প্রস্তাবও গ্রহণ করেছিল। কিন্তু একটি দলও শান্তিপূর্ণ পরিবর্তন আনার ব্যাপারে কোন কর্ম-সূচি গ্রহণ করেনি। তারা এমন কোন পরিকল্পনাও নেয়নি যাতে দক্ষিণের সমাজে যে-সব ব্যক্তি পৃথকীকরণের অবসানের জন্য কাজ করতে ইচ্ছুক ছিল, তারা অর্থ-নৈতিক প্রতিশোধ এবং নৈতিক নির্যাতনের মুখোমুখি হলে কোথাও না কোথাও থেকে কোনরূপ সাংগঠনিক সমর্থন পাবে।

বিদ্যালয়-একীকরণের পেছনে জাতির নৈতিক শক্তিকে সংহত করা গেল না। ফলে এই নীতিকে ব্যর্থ এবং বরবাদ করে দিতে উদ্যত শক্তিসমূহ সংহত ও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়ে গেল। ভাল মানুষেরা যখন আত্মতুষ্টির ভাব নিয়ে নীরব দর্শক হ'য়ে রইলেন, বিপথে চালিত ব্যক্তিরা তখন কাজে নেমে পড়ল। যদি প্রতিটি চার্চ এবং সিনাগগ একটি কাজের প্রোগ্রাম নিয়ে এগিয়ে যেত, যদি প্রত্যেক নাগরিক এবং সমাজকল্যাণ সংস্থা, প্রতিটি শ্রমিক সংঘ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাদের সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রস্তাবগুলি রূপায়ণে বাস্তব পরিকল্পনা নিত, যদি সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন তাদের শক্তিশালী মাধ্যমকে এই বিষয়ে জন-সাধারণকে শিক্ষিত ও সচেতনতায় উন্নীত করার কাজে লাগাত; যদি প্রেসিডেন্ট এবং কংগ্রেস একটি দ্বিধাহীন সুস্পষ্ট ভূমিকা নিতেন—অর্থাৎ এ'সব ব্যাপার যদি

ঘটত, তা হ'লে ফেডারল সৈন্যবাহিনীকে সেন্ট্রাল হাইস্কুলের বারান্দায় টহল দিতে হ'ত না।

কিন্তু কাজে নেমে পড়ার সময় এখনও চলে যায়নি! প্রত্যেক সংকটেই দুর্যোগ এবং সুযোগ দুইই আসে। এটি হয় প্রত্যাশিত মুক্তি দিতে পারে অথবা সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। বর্তমান সংকটে আমেরিকা হয় জাতিগত ন্যায়বিচার অর্জন করতে পারবে, নয়তো মারাত্মক সামাজিক মনোবিকার সৃষ্টি করতে পারবে, যার পরিসমাপ্তি ঘটবে জাতির অভ্যন্তরীণ আত্মহননে। স্বাধীনতা এবং সাম্যের গণ-তান্ত্রিক আদর্শ হয় সকলের জন্য কার্যকরী হবে, নয়তো সমস্ত মানুষই উদ্ভূত সামাজিক এবং আত্মিক সর্বনাশের ভাগীদার হবে। মোটকথা, এই সংকটের মধ্যে গণতন্ত্রের সাফল্যের অথবা ফ্যাসিবাদের জয়ের সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে; হয় সামাজিক অগ্রগতি, নয় অধঃপতন। মানবীয় সৌভ্রাতৃত্বের উঁচু পথ ধরে চলা, অথবা মানুষের প্রতি মানুষের অমানুষিক আচরণের ঘৃণ্য নীচু পথে চলা এই দু'টির একটিকে আমাদের বেছে নিতে হবে।

ইতিহাস আমাদের এই প্রজন্মের উপর এক অবর্ণনীয় অতি গুরুত্বপূর্ণ নিয়তি চাপিয়ে দিয়েছে। তা হচ্ছে গণতান্ত্রিকতার প্রক্রিয়াকে সম্পন্ন করা যেটিকে অত্যন্ত ধীরগতিতে এগিয়ে নিতে আমাদের জাতি অনেক দীর্ঘ সময় নিয়েছে। কিন্তু এ হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার যা তাবৎ বিশ্বের মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে এবং আদর্শ হিসাবে গ্রহণের প্রেরণা যোগায়। এই সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির কিভাবে মোকাবিলা করা হবে, তার দ্বারা নির্ধারিত হবে ব্যক্তি হিসাবে আমাদের নৈতিক সুস্থতা, অঞ্চল হিসাবে আমাদের সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সুস্থতা এবং মুক্ত দুনিয়ার নেতা হিসাবে আমাদের মর্যাদা। বর্তমান সংকটের সমাধানের সঙ্গে আমেরিকার ভবিষ্যৎ জড়িত। বর্তমান বিশ্বের যে রূপ, তাতে আমরা একটি নড়বড়ে গণতন্ত্র নিয়ে বিলাপ করতে পারি না। যুক্তরাষ্ট্র প্রাণশক্তিতে ভরপুর এবং সে উন্নতির পথে অগ্রসরমান বিশ্বের অশ্বেতকায় জাতি সমূহের শ্রদ্ধা আকর্ষণের আশা করতে পারে না, যদি না সে নিজের দেশের জাতিগত সমস্যার প্রতীকার করে। আমেরিকা যদি এক প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র হিসেবে টিঁকে থাকতে চায়, তবে সে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্ব বজায় রাখতে পারে না।

বর্তমান সংকটের সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না, যদি না নরনারী নির্বিশেষে সকলে এর জন্য কাজ করে। মানুষের প্রগতি স্বতঃস্ফূর্ত নয়, অবশ্যম্ভাবীও নয়। ইতিহাসের দিকে লঘুভাবে তাকালেও বোঝা যাবে যে সামাজিক অগ্রগতি অবশ্যম্ভাবিতার চাকার উপর চড়ে গড়িয়ে চলে না। ন্যায়বিচারের লক্ষ্যের দিকে প্রতি পদক্ষেপের জন্য চাই ত্যাগ, দুঃখভোগ এবং সংগ্রাম; ত্যাগব্রতী ব্যক্তি মানুষদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং গভীর আকুতি। লাগাতার চেষ্টা না থাকলে সময়ই সহায়তা যোগায় সেই সব বিদ্রোহী এবং আদিম শক্তিগুলিকে যার উৎপত্তি বিবেকহীন আবেগ প্রবণতার মধ্যে এবং যা সমাজকে ধ্বংস করে। এখন ঔদাস্য বা

আত্মতুষ্টির সময় নয়। এখন প্রচণ্ড এবং ইতিবাচক কাজের সময়। সূর্যকিরণের মত উজ্জ্বল স্বদেশপ্রেমীদের পক্ষে লজ্জার বিষয় হবে যদি উপরের অনুচ্ছেদগুলিতে যা বলা হয়েছে তা অসংখ্য রাজনৈতিক বক্তৃতার প্রতিধ্বনির মত শূন্যগর্ভ বাক্‌-সর্বস্বতার মত শোনায়। যেহেতু মানুষ ভুলে যায়, তাই এই সমস্ত বিষয় বার বার উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু বলা হয়ে গেলে একটি গতিময় কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে এগুলির রূপায়ণের কাজে এগিয়ে যেতে হবে, নতুবা যারা কর্মোদ্যম থেকে দূরে সরে থাকে, তারা এগুলির আড়ালে আশ্রয় নেবে। আমেরিকাকে যদি বর্তমান সংকটে সৃজনধর্মী অঙ্গীকার নিয়ে সাড়া দিতে হয়, তাহ'লে অনেক দল এবং সংস্থাকে অবশ্যই সাধারণ জানা কথার উর্ধ্বে উঠে আসতে হবে এবং জাতির সামগ্রিক চেহারার রূপান্তর ঘটানোর কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ শুরু করতে হবে।

প্রথমত ফেডারেল গভর্নমেণ্টের দিক থেকে জোরালো এবং আগ্রাসী নেতৃত্বের প্রয়োজন আছে। যদি সকল মানুষের নাগরিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে ফেডারেল কোর্টের মত প্রশাসন এবং আইন প্রণয়ন বিভাগ দুটি ভাবিত হ'ত, তা হ'লে বিচ্ছিন্ন সমাজের সংহত সমাজে রূপান্তর আজ অনেকদূর অগ্রসর হ'ত। ওয়াশিংটন থেকে ইতিবাচক নেতৃত্বের অভাব কেবল একটিমাত্র দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ন্যায়বিচারের পোষকতার ক্ষেত্রে দুই প্রধান দলই পিছিয়ে পড়েছে। যে দাক্ষিণী ডিক্সিক্র্যাটরা (Dixiecrat) এতদিন নাগরিক অধিকারের বিরোধিতা করার জন্য ড্যামোক্র্যাটিক দল ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তাদের অগণ-তান্ত্রিক কার্যকলাপের কাছে বহু ডেমোক্র্যাট আত্মসমর্পণ করে ন্যায়বিচারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আবার বহু রিপাবলিকান উত্তরের দক্ষিণপন্থীদের ভণ্ডামির কাছে আত্মসমর্পণ করে ন্যায়বিচারের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করেছে।

ক্রান্তিকালীন এই উত্তেজনাপূর্ণ সময়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারকমণ্ডলীর গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা সত্ত্বেও এই কাজ সম্পন্ন করা একা আদালতের পক্ষে সম্ভব নয়। আদালতগুলি সাংবিধানিক নীতির ব্যাখ্যা দিতে পারে এবং পৃথকীকরণের আইনগত ভিত্তি নাকচ করে দিতে পারে, কিন্তু তারা আইন তৈরী করতে পারে না, প্রশাসক নিয়োগ করতে পারে না, অথবা স্থানীয় স্তরে ন্যায়বিচার চাপিয়ে দিতে পারে না।

অঙ্গরাজ্য এবং অঞ্চলগুলির ক্ষমতা আছে যদি তারা তা কাজে লাগাতে চায়। কিন্তু দক্ষিণের রাজ্যগুলি তাদের নীতি পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে। তারা একথা বলে যে রাজ্যগুলির অধিকারের এক্তিয়ারের মধ্যে ক্ষমতা রদ করার অধিকার আছে, যদিও তা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের, সংবিধানের সংশোধিত ধারার বা আইন সংক্রান্ত ব্যাখ্যার প্রতি অরুচিকর দায়িত্বপালনের ব্যাপার হতে পারে। অতএব অবহেলাজনিত অক্ষমতার কারণে ক্ষমতা এবং দায়িত্ব ফেডারেল সরকারের কাছে ফিরে যায়। এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার দায়িত্ব ফেডারেল সরকারের সমস্ত বিভাগের

উপর ন্যস্ত হয়েছে।

সরকারের হস্তক্ষেপ বর্তমান সংকটের পুরোপুরি জবাব নয়, কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ আংশিক জবাব। নৈতিক সদাচার আইন-প্রণয়ণের আওতায় আসে না, কিন্তু এর দ্বারা মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করা যায়। আইন একজন মালিক বা নিয়োগকর্তাকে বাধ্য করতে পারে না আমাকে ভালবাসতে, কিন্তু আইন আমার গাত্রবর্ণের জন্য আমাকে কাজে নিয়োগ করতে তার অস্বীকার করাকে ঠেকাতে পারে। হৃদয় এবং মনের ভুলভ্রান্তি নিরাকরণের জন্য ধর্ম এবং শিক্ষার উপর আমাদের নির্ভর করতেই হবে; কিন্তু ইতিমধ্যে যতক্ষণ না অন্য লোকের অন্তর পরিশুদ্ধ হচ্ছে, ততক্ষণ অন্যায়কে বরণ করে নিতে কোন মানুষকে বাধ্য করা নীতিবিরুদ্ধ কাজ। উত্তরাঞ্চলের অনেকগুলি রাজ্যে অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় বৈষম্যবিরোধী আইনসমূহ এই জাতীয় নীতিহীনতার বিরুদ্ধে কঠোর অনুশাসনের প্রবর্তণ করে।

তাছাড়া আইন এক ধরনের শিক্ষাও বটে। সুপ্রিম কোর্ট, কংগ্রেস এবং সংবিধানের ধারাগুলি ত সোচ্চার শিক্ষাদাতা। দক্ষিণের উপর ইতিমধ্যে কার্যকরী সুপ্রিম কোর্টের আদেশ এবং আইনগত এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাসমূহের প্রভাবকে লঘু করে দেখা ভুল হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাক, সামরিক বাহিনীতে পৃথকীকরণের অবসানের যে প্রভাব আগেই লক্ষ্য করা গেছে তা অপরিমেয় এবং ধারণাতীত। সুপ্রিম কোর্টের রায় পরিবহণ বিন্যাসে, শিক্ষকদের বেতন কাঠামোয়, বিনোদন ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে এবং আরও অসংখ্য ব্যাপারে পরিবর্তন এনেছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কার্য প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিস্বরূপ মানুষের হৃদয়ের না হলেও অভ্যাস আচরণের পরিবর্তন হয়েছে এবং প্রতিদিন হচ্ছে।

উত্তরাঞ্চলের শ্বেতাঙ্গ উদারপন্থীরা হচ্ছে অন্য একটি দল বর্তমান সংকটে যাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আমেরিকায় আমরা যে জাতিগত ইস্যুর মুখোমুখি হয়েছি তা হচ্ছে জাতীয় সমস্যা, কোন গোষ্ঠীগত সমস্যা নয়। প্রতিটি আমেরিকাবাসীর নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ণ না করে নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার লংঘন করা যায় না। অন্যায় যে কোন স্থানে ঘটুক না কেন তা সব জায়গায় ন্যায়বিচারের প্রতি শঙ্কার কারণ হয়ে ওঠে। আলাবামার আইনশৃংখলা ভেঙ্গে পড়লে তা অন্য সাতচল্লিশটি অংগ রাজ্যের আইনের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেবে। আমরা আমেরিকায় বাস করি এই ব্যাপারটির মানেই হ'ল যে আমরা অপরিহার্যভাবে পারস্পরিকতার জালে জড়িয়ে পড়েছি। সুতরাং কোন আমেরিকানই জাতিগত ন্যায়বিচার সংক্রান্ত সমস্যার ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারে না। প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে এ সমস্যায় মোলাকাৎ হয় সদর দরজায়। প্রত্যেক আমেরিকান নিজেকে যতটুকু এই জাতিগত সমস্যার সম্মুখীন মনে করবে, ততটুকুই এর সমাধান হবে। একজন লোক সুদূরে দক্ষিণের কেন্দ্রস্থলে বা উত্তরের প্রত্যন্ত সীমায় বাস করুক না কেন, অন্যায়জাত সমস্যা তার নিজের সমস্যা; এটি তার

সমস্যা, কেননা এটি আমেরিকার সমস্যা।

যে উত্তরাঞ্চল সত্যিই উদার, সেখানে মস্ত উদারতার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে—উদারতা যা এখানকার সমাজে তথা সুদূর দক্ষিণে একীকরণে সুগভীর আস্থা রাখে। একীকরণ নৈতিক এবং আইনগতভাবে ন্যায়সম্মত বলে মেনে নেওয়া এক জিনিস; সরাসরি এবং সক্রিয়ভাবে একীকরণ আদর্শ রূপায়ণে ব্রতী হওয়া অন্য জিনিস। প্রথমটি বৌদ্ধিক স্বীকৃতি, দ্বিতীয়টি প্রকৃত বিশ্বাসের ব্যাপার। আজকের দিন হচ্ছে বক্তব্যকে কাজে রূপায়িত করার দিন। আজকের দিনে একীকরণের প্রতি শুধু মৌখিক কর্তব্যপালনে চলবে না, সে কর্তব্যকে আমাদের জীবনে সামিল করে নিতে হবে।

ইদানীং উত্তরের বেশিরভাগ সমাজে এক ধরনের আধা উদারতা বিরাজ করছে। সব দিকে দৃষ্টি দেওয়ার ঝোঁক আছে বলে কোন একটি দিকে নিবিষ্ট হতে পারছে না। এটি বস্তুগতভাবে এমন বিশ্লেষণ ধর্মী যে আত্মগতভাবে দায়বদ্ধ নয়। যারা বলে, "একটু ধীরেসুস্থে এগোন যাক, তোমরা ব্যাপারগুলিকে বড় দ্রুত ঠেলে নিয়ে যাচ্ছো"—তাদের এ'সব কথা একজন উদারমনস্ক মানুষকে নিরস্ত করতে পারবে না। সহানুভূতিপূর্ণ বোঝাপড়া এবং যুক্তিসংগত ধৈর্যের সমাপ্তি ঘটাতে আমি বলছি না; কিন্তু সহানুভূতি বা ধৈর্যকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধার বা সঙ্কল্পের অস্থিরতার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা সমীচীন নয়। ওইগুলি হবে আমাদের সকল কাজকর্মের নির্দেশাত্মক নীতি, কিন্তু কৃত্যকর্মের বিকল্প নয়।

এই উত্তেজনাসঙ্কুল যুগবিবর্তনকালে দক্ষিণের নরমপন্থী শ্বেতাঙ্গদের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ন্যস্ত হয়ে আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে আজকের দিনে দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গ মানুষদের নেতৃত্বে রয়েছে কূপমণ্ডুক উগ্রবাদীরা। যতসব মিথ্যা আইডিয়া প্রচার করে এবং মানুষের মনের গভীরে বিদ্যমান ভীতি এবং বিদ্বেষকে উস্কানি দিয়ে এসব লোক খ্যাতি এবং ক্ষমতা লাভ করেছে। কিন্তু তারা দক্ষিণাঞ্চলের মুখপাত্র নয়—এ'বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তারা একগুঁয়ে এবং সোচ্চার সংখ্যালঘুদের হয়ে কথা বলে।

এমন-কি একজন অসতর্ক পর্যবেক্ষকও দেখতে পারে যে দক্ষিণ অঞ্চল বিস্ময়কর সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। এই অঞ্চল প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এবং এখানকার স্থানীয় মানুষদের অন্তরে আছে উষ্ণ উদারতা। এ'সব সম্পদ থাকা সত্ত্বেও একটি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত—এই অঞ্চল পিছিয়ে যাচ্ছে যা নিগ্রো এবং শ্বেতাঙ্গদের দুর্বল করে দিচ্ছে। দারিদ্র্যপীড়িত শ্বেতাঙ্গ পুরুষ, নারী এবং শিশুরা যে অজ্ঞতা, বঞ্চনা এবং দারিদ্র্যের ক্ষতচিহ্ন বহন করছে তাতেই প্রমাণ হয় যে, একজনের ক্ষতিসাধন অন্য সকলকেও আঘাত করে। পৃথকীকরণ সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলকে সামাজিক, আর্থিক এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশের অবশিষ্ট অংশের পশ্চাতে ঠেলে দিয়েছে।

অথচ একক 'অটুট' দক্ষিণ বলে কিছু নেই। ভৌগোলিক দিক থেকে বলতে গেলে অন্তত তিনটি 'দক্ষিণ' রয়েছে। ওকলাহামা, কেনটাকি, কানসাস, মিসৌরি, পশ্চিম ভার্জিনিয়া, ডেলাওয়ার এবং ডিসট্রিক্ট অফ কলাম্বিয়া নিয়ে আছে 'সম্মতিজ্ঞাপক' দক্ষিণ। আছে টেনেসি, টেক্সাস, উত্তর ক্যারোলিনা, আরকানাস এবং ফ্লোরিডা নিয়ে 'দেখি কি হয়' দক্ষিণ। এবং আছে জর্জিয়া, আলাবামা, মিসিসিপি, লুইসিয়ানা, দক্ষিণ ক্যারোলিনা এবং ভার্জিনিয়া নিয়ে 'প্রতিরোধী' দক্ষিণ।

যেমন ভৌগোলিক দিক থেকে তিনটি 'দক্ষিণ' আছে, তেমনি আচরণ বা মনোভাবের নিরিখে আছে অনেকগুলি 'দক্ষিণ'। এই রাজ্যগুলির প্রত্যেকটিতে একটি সংখ্যালঘু দল আছে যারা চায় যেন-তেন-প্রকারেণ, এমনকি হিংসার আশ্রয় পৃথকীকরণকে অব্যাহত রাখতে। বেশির ভাগ মানুষ ঐতিহ্যগত পরম্পরা বা রীতিনীতি অনুসারে আন্তরিকভাবে পৃথকীকরণে বিশ্বাস করে, কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার পক্ষে। অতএব তারা আইন মেনে চলতে ইচ্ছুক আইন যথোচিত বা যুক্তিসংগত মনে করে নয়, আইন আইন বলেই। একটি ক্রমশ উদীয়মান তৃতীয় সংখ্যালঘু দল আছে যারা সাহস এবং বিবেকের সংগে দেশের আইনকে কার্যকর করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এ' সমস্ত লোক একীকরণের নৈতিক এবং সাংবিধানিক যৌক্তিকতায় বিশ্বাস করে। তাদের কণ্ঠস্বর এখনও পর্যন্ত ক্ষীণ, আইন লঙ্ঘনকারীদের প্রচণ্ড হৈ চৈ—এর মধ্যে শোনা যায় না। কিন্তু তারা কার্যক্ষেত্রে সক্রিয় রয়েছে।

শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত দক্ষিণে লক্ষ লক্ষ সদিচ্ছাসম্পন্ন মানুষ আছে যাদের কণ্ঠস্বর এখনও অশ্রুত, যাদের গতিবিধি এখনও অস্পষ্ট এবং যাদের সাহসিক কাজকর্ম এখনও দৃষ্টিগোচর নয়। আজকের দিনে এ'সব লোক ভয়ে নীরব থাকে—ভয় সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিশোধের। ঈশ্বরের নামে, মানবিক মর্যাদার নামে এবং গণতন্ত্রের স্বার্থে এ'সব লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে ডাক এসেছে সাহসে কোমর বাঁধতে, নির্ভয়ে কথা বলতে এবং প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব যোগাতে। আবার অন্য একটি দক্ষিণ তাদের আহ্বান জানায় : অশ্বেতকায় দক্ষিণ, লক্ষ লক্ষ নিগ্রোদের দক্ষিণ, যারা শ্রম ও রক্ত দিয়ে দক্ষিণের মিত্রসংঘ (Dixie) গড়ে তুলেছে। যাদের আকুতি সৌভ্রাত্র এবং মর্যাদার জন্য যারা সকলের নিমিত্ত অধিকতর মুক্ত সুখী দেশ গড়ার জন্য স্বদেশবাসী শ্বেতাঙ্গ ভাইদের সঙ্গে হাত মেলাতে চায়। যদি শ্বেতকায় দক্ষিণী নরমপন্থীরা এখন কাজে নেমে পড়তে ব্যর্থ হন, তা হ'লে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে যে সামাজিক ক্রান্তিকালের বৃহত্তম ট্রাজেডি মন্দ লোকদের কর্কশ কলরব নয়, তা হ'ল ভাল লোকদের আশ্চর্য নীরবতা। আমাদের প্রজন্মে কেবল অন্ধকারের সন্তানদের কাজ এবং কথার জন্য অনুশোচনা করতে হবে না আলোর সন্তানদের ভীতি এবং ঔদাস্যের জন্যও তাদের তা করতে হবে।

কারা সাফল্যের সংগে দক্ষিণকে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জলকাদা থেকে টেনে তুলতে পারবে? পারবে তার নিজের সন্তানেরা ; যারা তার উর্বর এব

সমৃদ্ধ ভূমিতে জন্মেছে এবং লালিত হয়েছে ; যারা তার দ্বারা প্রতিপালিত হয়েছে বলে তাকে ভালবাসে। প্রেম-ধৈর্য-বোঝাপড়া ভিত্তিক সদিচ্ছার মাধ্যমে তারা তাদের ভাইদের উন্নত জীবনযাপনের পথে ডেকে আনতে পারে। এই মুহূর্তে শ্বেতাঙ্গ নরমপন্থীদের কাছে একটি বড় সুযোগ এসেছে, অবশ্য যদি তাঁরা শুধু সত্য কথাই বলেন, আইন মান্য করেন এবং প্রয়োজনবোধে যাকে ন্যায় বলে জানেন তার জন্য দুঃখবরণে পিছপা না হন।

আবার শ্রমিক আন্দোলন হচ্ছে আজকের দিনে সার্থক পরিবর্তন ঘটানোর অন্যতম হাতিয়ার। বছরের পর বছর ধরে নিগ্রোরা নিরবচ্ছিন্নভাবে অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হয়ে আছে। গৃহযুদ্ধের পূর্বে দাসেরা এমন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে কাজ করেছে যেটি কোন ক্ষতিপূরণ বা নাগরিক অধিকার দেয়নি। দাসত্ব থেকে মুক্তির পর নিগ্রো-আমেরিকান একটি প্রধানত অসংগঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আওতায় থেকে একটানা দুর্দশা ভোগ করেছে, তাকে কোন জমি-জমা বা আইনের রক্ষাকবচ ছাড়া মুক্তি দেওয়া হ'ল এবং জাতিচ্যুত ব্যক্তি হিসাবে অতি তুচ্ছ চাকরবাকরের কাজ করার অধিকার মাত্র তার রইল। এমনকি যে ফেডারেল সরকার মুক্তি দিয়েছে, সে সরকার এমন কোন দীর্ঘমেয়াদী নীতি গ্রহণে ব্যর্থতা দেখালো, যা ক্রীতদাসদের আর্থিক সহায়সম্পদের নিশ্চয়তা দিতে পারত— যে জমিতে সে এককালে কাজ করেছে পূর্বতন মালিকের মত সেই জমিতে মালিকানার অধিকার তাকে দিতে পারত। নিগ্রো জনসাধারণের উপর শোষণ পুনর্গঠনের কাল থেকে আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়ে গেল।

নিগ্রোদের জন্য অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে শ্রমিক ইউনিয়নগুলি একটি বড় রকমের ভূমিকা নিতে পারে। যে-সব আমেরিকান নাগরিকদের বেতনই তাদের জীবিকার একমাত্র সম্বল, তাদের আর্থিক কল্যাণ-সাধনের সংগ্রামে শ্রমিক ইউনিয়নগুলি ব্যাপৃত আছে। যেহেতু বৃহৎ উৎপাদন শিল্পের মালিক বা ম্যানেজার হিসেবে আমেরিকান নিগ্রোদের কার্যত কোন অস্তিত্বই নেই, তাই আর্থিক দিক থেকে নিছক বেঁচে থাকার জন্য তাদের বেতন পাওয়ার উপরই নির্ভর করতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে আনুমানিক ১৫০টি খাঁটি শ্রমিক ইউনিয়নে ১৬·৫ মিলিয়ন সদস্য আছে। ঐগুলির মধ্যে ১৪২টি হচ্ছে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে এ. এফ. এল. —সি. আই. ও সংস্থার সদস্যরূপে অন্তর্ভুক্ত। যে-সব ইউনিয়ন নিয়ে এ. এফ্. এল্.— সি. আই. ও. গঠিত তাদের ১৩·৫ মিলিয়ন সদস্যের মধ্যে নিগ্রোর সংখ্যা ১·৩ মিলিয়ন। যে-সমস্ত সম্মিলিত ধর্মীয় সংস্থা নিগ্রোদের মধ্যে কাজ করে কেবল-মাত্র তাদের অধিকতর নিগ্রো সদস্য আছে। যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, তেমনি শ্রমিক আন্দোলনের সম্পদ-সংগতি আমেরিকান সমাজে নিগ্রোদের যথাযথ স্থান অর্জনে ব্যবহৃত হবে—এরূপ আশা করার অধিকার তা হ'লে নিগ্রোর আছে। অন্যান্য শ্রমিক, কর্মচারীদের, সঙ্গে সেও এই অধিকার অর্জন করেছে।

তাদের পারস্পরিক শ্রম ও চেষ্টার ফলেই ত দেশের স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন সমূহ গড়ে উঠেছে।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার যারা শিকার, তাদের দৈহিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়ন শ্বাসরুদ্ধ হয়। শুধু যে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রথাগত শিক্ষা এবং যথোপযুক্ত সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে তা নয়, অধিকন্তু আমাদের যে একান্ত মৌল এবং অদ্বিতীয় সামাজিক সংগঠন—পরিবার, সেটিও আর্থিক অপ্রাচুর্যের ফলে নিপীড়িত, দুর্নীতিগ্রস্থ এবং দুর্বল হয়েছে। যখন একজন নিগ্রো পুরুষ যৎসামান্য মাহিনা পায়, যা নিতান্তই অপ্রচুর, তখন তার স্ত্রীকে সন্তানদের সাধারণ প্রয়োজন মেটানোর জন্য কাজ করতেই হয়। যখন মাকে আপন সন্তানদের স্নেহসিক্ত তত্ত্বাবধান এবং নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত করে কাজ করতে হয় তখন সে তার মাতৃত্বের সংগে কার্যত হিংস্র আচরণ করে; অন্যেরা সন্তানদের প্রতি অতি সামান্যই যত্ন নেয় অথবা আদৌ নেয় না, তারা বিনা তত্ত্বাবধানে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। একটি অসংহত সমাজে শুধুমাত্র নিগ্রোরাই যে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তা নয়, অনুরূপ দুর্গত অবস্থা হয় অনেক শ্বেতাংগ পরিবারেও। নিগ্রো মায়েরা তাদের ঘর ছেড়ে যায় শ্বেতাংগ শিশুদের দেখাশোনা করতে এবং তাদের বিকল্প মা হতে, আর শ্বেতাংগ মায়েরা অন্যত্র কাজ করে। এই অদ্ভুত কৌতুকের মধ্যে নিহিত আছে ভবিষ্যতের ভুলত্রুটি সংশোধনের অংগীকার।

নিগ্রো এবং শ্বেতাংগ কর্মী উভয়েই সমান ভাবে নিগৃহীত। উভয়ের জীবন-যাত্রার মান বাড়াতে হবে জাতীয় সংগতির সঙ্গে তাল রেখে। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে পৃথক করে রাখার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। আছে শূন্যগর্ভ সামাজিক পার্থক্য। অর্থনৈতিক দিক থেকে নিষ্পিষ্ট শ্বেতাংগ তার দারিদ্র্যকে এই ভেবে মেনে নেয় যে অন্য কোন বিষয়ে না হোক অন্তত সামাজিকভাবে সে নিগ্রোদের উপরে। এই অসার অতিকথনে শ্লাঘাবোধের জন্য তাকে এবং তার সন্তানদের কঠোর মূল্য দিতে হয়েছে নিরাপত্তাহীনতা, ক্ষুধা, অজ্ঞতা এবং হতাশা নিয়ে।

যে-সব শ্বেতাংগ এবং নিগ্রোর একই রকম সমস্যা রয়েছে, তাদের মধ্যে একটি শক্ত ঐক্যবন্ধন গড়ে তুলতে হবে। শ্বেতাংগ এবং নিগ্রো শ্রমিকদের পারস্পরিক উচ্চাশা আছে শিল্পে এবং কৃষিতে উৎপাদনের একটি অধিকতর ন্যায়সংগত ভাগ পাওয়ার। উভয়েই চায় কাজে নিশ্চয়তা, বৃদ্ধ বয়সে নিরাপত্তা, সুস্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধির সংরক্ষণ। যে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন লক্ষ লক্ষ মানুষের আর্থিক নিরাপত্তা এবং হিতসাধনের ক্ষেত্রে প্রচুর অবদান যুগিয়েছে, সেই আন্দোলনের শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে শ্বেতাংগ এবং নিগ্রোদের সামাজিক সাম্যের ভিত্তিতে সুসংগঠিত করে তাদের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের কাজে।

শ্রমিক আন্দোলন নিশ্চয়ই ইতিপূর্বে এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। বস্তুত প্রত্যেক জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক শ্রমিক ইউনিয়নের সুস্পষ্ট বৈষম্য-বিরোধী নীতি আছে। শুধুমাত্র আমেরিকার শ্রম আন্দোলন থেকে নয়; পরন্তু

সমগ্র আমেরিকার সমাজ থেকে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক প্রবণতা নির্মূল করাই যে চরম লক্ষ্য— এ'কথা আন্তরিকতার সংগে ঘোষণা করেছেন এ. এফ্. এল্.—সি. আই. ও'র জাতীয় স্তরের নেতারা। কিন্তু এই নীতি সত্ত্বেও জাতিবৈষম্য তত্ত্বের দ্বারা চালিত কিছু ইউনিয়ন নিগ্রোদের অবনমিত অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থায় আটকে রাখার ব্যাপারে মদত দিয়েছে। কোন কোন ইউনিয়নের সদস্যপদ নিগ্রোদের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছে এবং শিক্ষানবিশী এবং কর্মভিত্তিক-শিক্ষণ তারা পেতে পারে না। দেশের প্রত্যেক অংশে দেখা যায় যে এমন সব স্থানীয় ইউনিয়ন আছে যেগুলি নিগ্রোদের জন্য চাকরির সন্ধান করার বা চাকরিতে তাদের পদোন্নতির ব্যাপারে সাংঘাতিক রকমের অত্যন্ত বিদ্বেষপূর্ণ বাধার সৃষ্টি করে। অল্পসংখ্যক কিছু ব্যক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যাদের অনেকে হোয়াইট সিটিজেন্স্ কাউন্সিলে কাজ করে, সংগঠিত শ্রমিক-সংস্থাগুলির একটি বড় অংশের প্রচণ্ড বিরোধিতার মুখে দাক্ষিণাত্যকে সুসংগঠিত করার এ. এফ্. এল্.—সি. আই. ও'র প্রচেষ্টা বাস্তবিকপক্ষে পরিত্যক্ত হয়েছে।

সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে এ'সব অবস্থার অস্তিত্ব থেকে প্রকাশ পায় যে এটি একটি অবিচ্ছিন্ন কাজ। এ এফ. এল্.—সি. আই.ও'কে তাদের আয়ত্তাধীন সমস্ত শক্তিকে প্রয়োগ করতে হবে যে-নীতি তারা প্রচার করে তাকে কার্যকর করে তুলতে। শ্রমিক নেতাদের স্বীকার করে চলতে হবে যে নাগরিক অধিকার অর্জনের সংগ্রামে তাদের মারাত্মক স্বার্থ রয়েছে, কারণ আর কিছু না হোক, যে-সমস্ত শক্তি নিগ্রোবিরোধী, সেগুলি শ্রমিক বিরোধীও বটে। কিছু সংখ্যক দুষ্ট প্রকৃতির লোকের দুষ্কার্যের জন্য হাল আমলে সংগঠিত শ্রমিকদের উপর যে আক্রমণ চলছে তাতে বর্তমান সংকটে শ্রমিকদের ভূমিকা সম্বন্ধে আমরা যেন বিভ্রান্ত হয়ে না পড়ি।

বর্তমান সংকটে চার্চকেও অবশ্যই তার ঐতিহাসিক বাধ্যবাধকতার মুখোমুখি হতে হবে। শেষকথা হচ্ছে জাতিগত সমস্যা একটি নৈতিক ইস্যু, রাজনৈতিক নয়। বস্তুত সুইডিস্ অর্থনীতিবিদ গুনার মির্ডাল যেমন বলেছেন, জাতিগত সমস্যাই হচ্ছে আমেরিকার সবচেয়ে বড় নৈতিক সংকট। এই মারাত্মক উভয়সংকট চার্চের কাছে একটি বড় রকমের চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছে। গস্পেলের কেন্দ্রভূমিতে যে উদার সার্বজনীনতা আছে তা জাতিপৃথকীকরণকে নৈতিক দিক থেকে ন্যায়-বিরোধী করে তুলেছে। খ্রীষ্টের মধ্যে যে পরম ঐক্যের অবস্থান আমরা দেখতে পাই, জাতিপৃথকীকরণ তার সোচ্চার অস্বীকৃতি; কেননা খ্রীষ্ট ইহুদিও নন, অ-ইহুদিও নন, বদ্ধও নন, মুক্তও নন, নিগ্রোও নন, শ্বেতাংগও নন। পৃথকীকরণ —যাকে পৃথক করা হয় এবং যে পৃথক করে—উভয়ের আত্মাকেই ক্ষত-বিক্ষত করে। পৃথককারী যাকে পৃথক করে তাকে ব্যবহার্য দ্রব্যমাত্র বলে মনে করে, তাকে মানুষের সম্মান দেয় না। পৃথকীকরণ 'আমি—তুমি' এই সম্পর্কের স্থানে 'আমি—ইহা' এ'রকম সম্পর্ক স্থাপন করে। কাজে কাজেই এটি একান্তভাবে

ইহুদি-খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্যবাহী মহান শিক্ষার বিরোধী।

দিগন্তের প্রসার ঘটানোর, স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর এবং প্রয়োজনবোধে প্রচলিত রীতিনীতির উচ্ছেদ সাধনের দায়দায়িত্ব বরাবর চার্চের উপর বর্তায়। পৃথকীকরণ নীতিকে পরাস্ত করার কাজ চার্চের কাছে একটি অপরিহার্য কর্তব্য-রূপে দেখা দিয়েছে।

অনেকগুলি সুনির্দিষ্ট জিনিস আছে যা চার্চ করতে পারে। প্রথমত চার্চ জাতিগত বিদ্বেষের কাল্পনিক উৎস খুঁজে বার করতে পারে, যে কাজ আইনের দ্বারা হতে পারে না। যতসব জাতিগত পক্ষপাতদুষ্ট কুসংস্কারের মূলে আছে ভয়, সন্দেহ এবং বোঝাপড়ার অভাব—যা সাধারণত যুক্তিবর্জিত। এখানে সাধারণ মানুষের মনকে সঠিক পথে চালিত করার ব্যাপারে চার্চের সহায়তার মূল্য অপরিসীম। চার্চ ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে এ'সমস্ত সংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসের অযৌক্তিকতাকে তুলে ধরতে পারে। চার্চ দেখাতে পারে যে উঁচু বা নীচু জাতির ধারণা নিছক কল্পনা, নৃতাত্ত্বিক প্রামাণ্য তথ্য এটি সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করে দিয়েছে। চার্চ দেখাতে পারে যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং নৈতিক মানের নিরিখে নিগ্রো-দের কোন সহজাত হীনতা নেই, এবং এও দেখাতে পারে যে সমান সুযোগ পেলে নিগ্রোরা সমান সাফল্য অর্জনের প্রমাণ দিতে পারে।

নিগ্রোদের প্রকৃত অভিপ্রায় কি— তা প্রকাশ করার ব্যাপারে চার্চ অনেক-কিছু করতে পারে। নিগ্রোরা জাতির উপর কোন প্রাধান্য-স্থাপন করতে চায় না, তারা কেবল চায় সৎ নাগরিকের উপর যে-সকল দায়িত্ব বর্তায় তা নিয়ে প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার। নিগ্রো শ্বেতাঙ্গ বিবাহ নিয়ে যে অযৌক্তিক ভয় বিদ্যমান, তার নিরসনেও চার্চ সাহায্য করতে পারে। চার্চ লোকদের বলতে পারে যে বিবাহ হচ্ছে নেহাৎ ব্যক্তিগত ব্যাপার, প্রত্যেকটি-ক্ষেত্রে আলাদাভাবে ভালমন্দ বিচারের দ্বারাই তা ঠিক হবে। আদতে গোষ্ঠীরা বিবাহ করে না, ব্যক্তিমানুষেরাই বিবাহ করে। বিবাহ হচ্ছে এমন এক চুক্তি বিশেষ যেখানে সংশ্লিষ্ট পক্ষদের সম্মতির দরকার হয়, যে-কোন পক্ষ সবসময়ই 'না' বলতে পারে। চার্চ এই ঘোষণা করতে পারে যে অন্তর্বিবাহ নিয়ে অবিরাম শোরগোল আসল বিষয়ের বিকৃতি। চার্চ এও বলে দিতে পারে যে নিগ্রোর প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে শ্বেতাঙ্গ মানুষের ভাই হওয়া, ভগ্নীপতি বা শ্যালক হওয়া নয়।

ভ্রাতৃত্ববোধের নীতিকে রূপায়িত করার ব্যাপারে চার্চ আর একটি জিনিস করতে পারে, তা হচ্ছে মানুষের মন এবং দৃষ্টিকে ঈশ্বরকেন্দ্রিক করে রাখা। আজকের আমেরিকার অনেক সমস্যা ভীতির নিরিখে ব্যাখ্যা করা যায়। নিগ্রোদের পৃথকীকরণের নাগপাশ থেকে মুক্ত করা তাদের একমাত্র কাজ নয়; উপরন্তু তাদের দায়িত্ব হ'ল ভাইদের মনে সংহতি সম্পর্কে যে ভীতির বন্ধন আছে তা থেকে তাদের মুক্ত করা। ভয় থেকে মুক্তির একটি উত্তম উপায় হচ্ছে জীবনকে ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্যের উপর কেন্দ্রীত করা। পরিপূর্ণ

প্রেম ভয়কে দূর করে।

লোকেরা যখন জাতিগত সমস্যা নিয়ে চিন্তা করে, তখন তারা বেশির ভাগ সময় ঈশ্বরের চাইতে মানুষকে নিয়ে বেশি মাথা ঘামায়। সাধারণত যে প্রশ্ন ওঠে তা হচ্ছে, 'আমি যদি নিগ্রোদের সঙ্গে বেশি মাখামাখি করি বা জাতিগত প্রশ্নে বেশি রকম উদার হই, তবে আমার বন্ধুরা কি মনে করবে ?' মানুষ প্রশ্ন করতে ভুলে যায়, 'ঈশ্বর কি মনে করবে ?' সুতরাং তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে থাকে, কেন না তারা উচ্চভূমিতে আত্মিক অনুরক্তি চায় না, বরং চায় সমতলভূমিতে সামাজিক অনুমোদন।

চার্চকে তার পূজারীদের এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে মানুষের সর্বোত্তম নিরাপত্তা রয়েছে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের চিরন্তন অভীপ্সার কাছে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করার মধ্যে, মানুষের ইচ্ছার প্রতি চূড়ান্ত আনুগত্যের মধ্যে নয়। চার্চকে খ্রিস্টানদের অবিরাম বলে যেতে হবে, 'তোমরা হচ্ছ স্বর্গের উপনিবেশ।' প্রকৃতপক্ষে মানুষের আছে দ্বৈত নাগরিকত্ব। সে সমকাল এবং অনন্তকাল উভয়েতেই বাস করে, স্বর্গে এবং মর্ত্যে। কিন্তু তার চূড়ান্ত আনুগত্য ঈশ্বরের প্রতি। ঈশ্বরের প্রতি এই প্রেম এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি এই অনুরক্তি আমাদের ভয় থেকে মুক্ত করবে।

জাতিগত সমস্যার সমাধানে অন্য যে একটি প্রচেষ্টা চার্চ নিতে পারে তা হচ্ছে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব নেওয়া। আইডিয়ার ক্ষেত্রে সক্রিয় হওয়াটা চার্চের পক্ষে যথেষ্ট নয় ; সামাজিক কর্মযজ্ঞেও তাকে শামিল হতে হবে। প্রথমত চার্চকে তার নিজের উপর থেকে পৃথকীকরণের জোয়াল সরিয়ে নিতে হবে। এই কাজের দ্বারাই কেবল বাইরের অশুভ শক্তির উপর তার আক্রমণ ফলপ্রসূ হতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে মুখ্য সম্প্রদায়গুলির বেশির ভাগ স্থানীয় চার্চসমূহ, এবং চার্চ পরিচালিত হাসপাতাল বিদ্যালয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি এখনো পৃথকীকরণ ব্যবস্থা চালু রেখেছে। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে খ্রীস্টীয় আমেরিকার সব চাইতে পৃথকীকৃত সময় হচ্ছে রবিবার সকাল ১১টা, অর্থাৎ সেই সময়টি যখন 'খ্রীস্টের মধ্যে পূর্ব বা পশ্চিম বলে কিছু নেই' এই মহাবাক্যে সহি করার জন্য গীর্জার মধ্যে সকলে দাঁড়িয়ে পড়ে। একই রকমের অদ্ভুত ব্যাপার—সর্বাপেক্ষা পৃথকীকৃত বিদ্যালয় হচ্ছে রবিবারের বিদ্যালয়। আর কতকাল চার্চের থাকবে ধর্ম-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে রক্তের আধিক্য, আর কাজের ক্ষেত্রে এই রক্তশূন্যতা। ইয়েল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডীন লিপটন পোপ তাঁর 'দ্য কিংডম বিয়ণ্ড কাস্ট' পুস্তকে যথার্থই বলেছেন, 'আমেরিকার সমাজে চার্চ হচ্ছে সর্বাধিক পৃথকীকৃত প্রধান প্রতিষ্ঠান। একীকরণ নীতির বাস্তব রূপায়ণে চার্চ আপন ক্ষেত্রে জাতিগত প্রশ্নে জাতির বিবেকস্বরূপ সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে নি, এবং শ্রমিক ইউনিয়ন, কলকারখানা, স্কুল, বিভাগীয় বিপণি, খেলাধুলার আসর এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের অন্যান্য প্রধান মিলনক্ষেত্র থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছে।'

কিছু কিছু অগ্রগতি হয়েছে। এখানে সেখানে চার্চ সাহসের সঙ্গে পৃথকীকরণ নীতির উপর আঘাত হেনেছে এবং সত্যি সত্যি তাদের ধর্মীয় সমাবেশের একীকরণ ঘটাচ্ছে। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ চার্চ বার বার পৃথকীকরণের নিন্দা করেছে এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত সম্প্রদায়গুলিকেও তাই করতে বলেছে। প্রধান প্রধান সম্প্রদায়গুলির বেশির ভাগ সেই কাজ সমর্থন করেছে। রোমান ক্যাথলিক চার্চ ঘোষণা করেছে, 'পৃথকীকরণ নৈতিক দিক থেকে প্রমাদযুক্ত এবং পাপপূর্ণ'। এগুলি প্রশংসনীয়। কিন্তু ঐ সমস্তই এখন পর্যন্ত নিতান্তই সামান্য। কার্যক্ষেত্রে স্থানীয় চার্চগুলিকে এর দ্বারা প্রভাবিত করার কাজ অত্যন্ত ঢিমেতালে চলছে। চার্চের নিজের আত্মার মধ্যেই বিভেদবোধ রয়েছে। এটিকে দূর করতে হবে। খ্রীষ্টীয় ইতিহাসে এটি হবে অন্যতম ট্র্যাজেডি যদি ভবিষ্যতের কোন এক গিবন বলবার সুযোগ পায় যে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে চার্চ পৃথকীকরণ শক্তির বৃহত্তম দুর্গের একটি বলে পরিগণিত হয়েছে।

চার্চকে নিজের চৌহদ্দির বাইরে এসে সামাজিক স্তরে কর্মোদ্যমের মধ্যে ক্রমে ক্রমে বেশি সক্রিয় হতে হবে। তাকে নিগ্রো এবং শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগাযোগের পথগুলি খোলা রাখার জন্য অবশ্যই সচেষ্ট হয়ে উঠতে হবে। বাসস্থান, শিক্ষা ও পুলিশী নিরাপত্তার ব্যাপারে এবং সহরাঞ্চলের রাষ্ট্রীয় আদালতে নিগ্রোরা যে অন্যায়ের সম্মুখীন হয় তার বিরুদ্ধে চার্চকে কার্যকরী ভূমিকা অবশ্যই নিতে হবে। অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে চার্চকে তার প্রভাব খাটাতেই হবে। সমাজের নৈতিক এবং আত্মিক ক্ষেত্রের অভিভাবক হিসেবে চার্চ জ্বলজ্যমান অন্যায়ের প্রতি নিরাসক্ত থাকতে পারে না।

যাজকদের বিষয় উল্লেখ না করে চার্চের ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু বলা যাবে না। ধর্মীয় উপদেশমালা পাঠ করে থাকেন এমন প্রত্যেক যাজকের উপর প্রত্যাদেশ আছে সাহসের সংগে ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াবার, গসপেলের শাশ্বত সত্য ঘোষণা করবার এবং মানুষকে মিথ্যা এবং ভয়ের অন্ধকার থেকে সত্য এবং প্রেমের আলোতে চালিয়ে নিয়ে যাবার।

দক্ষিণে এই প্রত্যাদেশ শ্বেতাংগ যাজকদের কাছে একটি অস্বস্তিকর পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার হয়ে দেখা দিয়েছে। অনেকে যাঁরা বিশ্বাস করেন পৃথকীকরণ—সর্বোপরি ঈশ্বরের অভিপ্রায় এবং খ্রীষ্টের আত্মভাবের বিরোধী, তাঁরা এক বেদনাদায়ক বিকল্পের মুখোমুখি হয়েছেন, অর্থাৎ খোলাখুলিভাবে দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করা এবং ফলে চাকরি থেকে বিতাড়িত হওয়া অথবা মুখ না খুলে যেখানে যে-অবস্থায় আছে তাই থাকা এবং ভাল কিছু করা। যে-সকল যাজক শেষোক্ত পন্থা বেছে নিয়েছেন তাঁরা মনে করেন চার্চ থেকে তাঁদের জোর করে বিতাড়িত করা হলে তাঁদের স্থলাভিষিক্তরা সম্ভবত হবে পৃথকীকরণ নীতির সমর্থক এবং তার ফলে খ্রীষ্টীয় আদর্শ ব্যাহত হবে। অনেক যাজক বিক্ষুব্ধ না হয়ে শান্তশিষ্ট হয়ে আছেন কেবল চাকরি বাঁচাবার তাগিদে নয়, পরন্তু তাঁরা মনে করেন সংহত থাকাটা

হচ্ছে দক্ষিণে খ্রীষ্টের আদর্শ যথাযথভাবে অনুসরণ করার সর্বোত্তম পন্থা। শান্ত-ভাব বজায় রেখে, কোন প্রকার প্রচারের মধ্যে না গিয়ে এ'সমস্ত যাজক উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষায় আছেন এবং তরুণ এবং যুবকদের মধ্যে সুস্থ মানসিকতা সৃষ্টির কাজে ব্যাপৃত আছেন। ঐ সকল ব্যক্তিকে সমালোচনা করা উচিত নয়।

মোটকথা দক্ষিণের প্রত্যেক শ্বেতাঙ্গ যাজককে এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তিনি কোন্ পথ অনুসরণ করবেন। কোনও সঠিক একক পন্থা নেই। প্রত্যেক যাজকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল যাজকের খ্রীষ্টীয় ভ্রাতৃত্বের আদর্শের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করা এবং এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যে তিনি তা রূপায়িত করার জন্য প্রত্যক্ষভাবে কিছু করছেন। তিনি কখনও এই তত্ত্বকে আমল দেবেন না যে নিষ্ক্রিয় থাকাটাই উচিত পন্থা এবং তিনি কিছু না করাকে যুক্তিসিদ্ধ বলে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে মদত দেবেন না। অনেক যাজক এখন যা করছেন তার চাইতে ঢের বেশি কিছু তিনি করতে পারেন এবং তা করেও ধর্মীয় সমাবেশের আয়োজন অব্যাহত রাখতে পারেন। যাজকগণ সমষ্টিগত ভাবে অনেক কিছু করতে পারেন। দক্ষিণের প্রতিটি নগরে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর যাজকদের সম্মিলিত যাজক সংগঠন থাকা উচিত, যেখানে নিগ্রো এবং শ্বেতাঙ্গ যাজকবৃন্দ খ্রীষ্টীয় সাথীত্বে মিলিত হয়ে সম্প্রদায় সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন। মণ্টগোমারী সংগ্রামে নৈরাশ্যজনক অভিজ্ঞতার একটি হ'ল আমরা শ্বেতাঙ্গ যাজক সংস্থাকে আমাদের সঙ্গে বসে আমাদের সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করতে রাজী করাতে পারিনি। ব্যক্তিক ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে শ্বেতাঙ্গ যাজকেরা, যাঁদের কাছ থেকে আমি সরলভাবে অনেক কিছু আশা করে-ছিলাম, কোন সাহায্য করেননি।

সমষ্টিগতভাবে যাজকগণ আইন মেনে চলার এবং হিংসার পথ পরিহার করার আহ্বান জানাতে পারেন। আটলাণ্টা, রিচমণ্ড, ডালাস এবং অন্যান্য শহরে শ্বেতাঙ্গ যাজকেরা এ'কাজ করেছেন এবং আমি যতদূর জানি এর জন্য কেউ চাকরি হারাননি। শহরের সমস্ত যাজকদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা কোন সম্প্রদায়ের পক্ষে বড় কঠিন। যদি কখনও দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গ যাজকবৃন্দ জাতিগত প্রশ্নে গস্‌পেলের সত্য সমস্বরে ঘোষণা করেন, তা'হলে পৃথকীকৃত সমাজের একীকৃত সমাজে রূপান্তর অনেকটা সহজসাধ্য হবে।

আজকের দিনে খ্রীষ্টান যাজকদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে ভবিষ্যদ্বাণীর বা দিব্য প্রেরণার উপর জোর দিতেই হবে। প্রত্যেক যাজক ভবিষ্যদ্বক্তা হতে পারে না, কিন্তু কয়েকজনকে এই অত্যুচ্চ বৃত্তির কঠিন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হবে এবং সাহসের সঙ্গে ন্যায়পরায়ণতার স্বার্থে যন্ত্রণাভোগ মেনে নিতে হবে। আমেরিকার ভবিষ্যদ্বক্তারা এই বলে জেগে উঠুন 'প্রভু এ'ভাবে বলেন' এবং অ্যামোসের মত উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করুন '…ন্যায়বিচার জলস্রোতের মত নেমে আসুক এবং ন্যায়পরায়ণতা স্রোতস্বিনীর মত বয়ে চলুক'।

সৌভাগ্যক্রমে দক্ষিণে কয়েকজন এই ভবিষ্যদ্বাণীযুক্ত দিব্যপ্রেরণার পথ ধরে চলতে আগে থাকতেই সম্মত হয়েছেন। আমি মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করি সেই সমস্ত যীশুখ্রীষ্টের গসপেলের অনুসারী যাজকদের এবং ইহুদী যাজকদের যাঁরা ভয়, ভীতিপ্রদর্শন, ঝুটঝামেলা এবং জনপ্রিয়তাহানির বিরুদ্ধে, এমনকি দৈহিক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে রুখে দাঁড়িয়ে 'ঈশ্বর মানুষের পিতা এবং মানুষ মানুষের ভাই'— এই ভাবাদর্শ ঘোষণা করেছেন। ঈশ্বরের এই মহান সেবকদের সান্ত্বনা মিলবে যীশুর বচনে : 'তোমরা ভাগ্যবান যখন আমার জন্য লোকেরা তোমাদের তীব্র গঞ্জনায় জর্জরিত করবে, নিপীড়িত করবে এবং যতসব মিথ্যা দোষারোপে ক্ষতবিক্ষত করবে। আমোদ কর, আনন্দে মেতে ওঠ : কেননা স্বর্গে তোমরা হবে উত্তমরূপে পুরস্কৃত : কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী ভবিষ্যদ্বক্তারাও অনুরূপভাবে নির্যাতীত হয়েছিল।'

অতঃপর এখানে আছে কঠিন চ্যালেঞ্জ এবং মহা সুযোগ : সত্যিকারের একটি মহান খ্রীষ্টীয় জাতি তৈরী করতে খ্রীষ্টের আত্মাকে তৎপর হতে দেওয়া। শ্রদ্ধা এবং সাহসের সংগে চার্চ যদি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে, তা হ'লে সেই দিনটি অতি দ্রুত এগিয়ে আসবে যখন মানুষ সর্বত্র স্বীকার করে নেবে যে তারা 'যীশুর মধ্যে একাত্ম'।

শেষকথা, একীকরণকে বাস্তবায়িত করতে হলে নিগ্রোদেরই একটি চূড়ান্ত ভূমিকা নিতে হবে। বস্তুত নিগ্রোদের জন্য প্রথম শ্রেণীর নাগরিকত্ব একটি বাস্তব সত্যে পরিণত করার প্রাথমিক দায়িত্ব নিগ্রোদেরই নিতে হবে। একীকরণ একটি সুখাদ্যে ভরা রুপোর থালা নয় যে ফেডারেল সরকার বা উদার মনের শ্বেতাংগরা তা নিগ্রোদের হাতে তুলে দেবে— নিগ্রোদের শুধু ক্ষুধা থাকলেই হ'ল। নিগ্রো-ব্যক্তিত্বের উপর অতীতের পৃথকীকরণ নীতির একটি অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব বোধ হয় এই যে অন্যেরা তাদের নাগরিক অধিকার বিষয়ে তাদের চাইতে বেশি উদ্বিগ্ন— তারা এমন একটি ভ্রান্ত ধারণার শিকার হয়ে পড়েছিল।

এখনকার সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে নিগ্রোদের বুঝতে হবে যে তাদের দুঃখ-দুর্দশা নিরসনের ব্যাপারে তাদের অনেক কিছু করার আছে। তারা অশিক্ষিত বা দারিদ্র্যপীড়িত হতে পারে, কিন্তু তাদের নিজেদের ভাগ্য বদলে দেওয়ার ক্ষমতা তাদের সত্তার মধ্যেই নিহিত আছে—এটি বোঝবার পক্ষে অশিক্ষা বা দারিদ্র্যের মত অসুবিধাগুলি অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে না। সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়ার বা সংখ্যাধিক্যের তাদের সংগে একমত হওয়ার, অথবা তাদের সপক্ষে আদালতের হুকুমজারীর জন্য অপেক্ষা না করে নিগ্রোরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরাসরি ব্যবস্থা নিতে পারে।

তিনটি বিশেষ উপায়ে নির্যাতিত মানুষেরা তাদের উপর নির্যাতনের মোকা-বিলা করতে পারে। একটি উপায় হচ্ছে মেনে নেওয়া। নির্যাতিতেরা তাদের সর্বনাশকে বিধিলিপি বলে মেনে নেয়। তারা নিঃশব্দে নির্যাতনের সঙ্গে নিজেদের

মানিয়ে নেয় এবং তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রতিটি স্বাধীনতা আন্দোলনে দেখা গেছে কিছু সংখ্যক লোক বরং নির্যাতিত থেকে যাওয়াটাই পছন্দ করে। প্রায় ২৮০০ বছর আগে মোজেস্ (Moses) ইজরায়েলের সন্তানদের নিয়ে যখন মিশরের ক্রীতদাসত্বের বন্ধন থেকে স্বাধীনতায় উত্তরণের জন্য বাঞ্ছিত দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন, তখন তিনি শীঘ্রই এই সত্য আবিষ্কার করলেন যে ক্রীতদাসেরা সব সময় তাদের মুক্তিদাতাদের যে অভিনন্দিত করে তা নয়। ক্রীতদাসের জীবনে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। যেমন শেক্‌স্‌পিয়ার দেখিয়ে দিয়েছেন— তারা বরং দুর্ভাগ্য এবং দুঃখকষ্ট সহ্য করবে, অজ্ঞাত কারোর দিকে পালিয়ে যাবে না। মুক্তির যন্ত্রণার চেয়ে 'মিশরের সুখভোগ' তাদের পছন্দ।

ক্লান্তির মুক্তি বলে একটি জিনিস আছে। উৎপীড়নের জোয়ালে চাপা থেকে কিছু লোক এমন নিঃশেষিত হয়ে পড়ে যে তারা হাল ছেড়ে দেয়। কয়েক বছর আগে আটলাণ্টার বস্তি অঞ্চলে একজন নিগ্রো গীটারবাদক রোজ গাইত: 'এত দীর্ঘ সময় নুইয়ে আছি যে নুইয়ে থাকাটা আমাকে জ্বালায় না।' এই হচ্ছে এক ধরনের নেতিবাচক মুক্তি বা স্বাধীনতা এবং হালছাড়া ভাব যা উৎপীড়িতকে অনেক সময় আচ্ছন্ন করে রাখে।

কিন্তু এটি ঠিক পথ নয়। অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সমাজব্যবস্থাকে নিষ্ক্রিয়ভাবে মেনে নেওয়া হচ্ছে সেই সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করা; তার ফলে উৎপীড়িতও উৎপীড়কের মত মন্দ হয়ে পড়ে। অশুভ শক্তির সঙ্গে অসহযোগ শুভ শক্তির সংগে সহযোগিতার মতই একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতা। উৎপীড়িত উৎপীড়কের বিবেককে কখনো তন্দ্রাচ্ছন্ন হতে দিতে পারে না। ধর্ম প্রত্যেক মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে সে তার ভাইয়ের রক্ষক। অন্যায় বা পৃথকীকরণকে নিষ্ক্রিয়ভাবে মেনে নেওয়ার অর্থ উৎপীড়নকারীকে বলা যে তার কাজকর্ম নৈতিক দিক থেকে ন্যায়সংগত। এটি একভাবে তার বিবেককে নিদ্রাচ্ছন্ন হতে দেওয়া। এই মুহূর্তে উৎপীড়িত তার ভাইয়ের রক্ষক হতে ব্যর্থ। সুতরাং উৎপীড়নকে মেনে নেওয়া সহজতর হলেও এটি নীতিসংগত পথ নয় মোটেই। এটি কাপুরুষের পথ। উৎপীড়নকে মেনে নেওয়ার দ্বারা নিগ্রোরা তাদের উৎপীড়নকারীদের কাছ থেকে সম্মান আদায় করতে পারে না; তারা উৎপীড়নকারীদের ঔদ্ধত্য এবং তাচ্ছিল্য বাড়িয়ে দেয় মাত্র। এই মেনে নেওয়াকে নিগ্রোদের নিকৃষ্টতার প্রমাণ বলে ব্যাখ্যা করা হয়। নিগ্রোরা যদি তাদের তাৎক্ষণিক আরাম আর নিরাপত্তার জন্য তাদের সন্তানসন্ততিদের ভবিষ্যৎ বেচে দেয়, তা হ'লে তারা দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গদের কিংবা বিশ্বের জনগণের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারে না।

দ্বিতীয় একটি উপায় যার দ্বারা উৎপীড়িত মানুষ সময় সময় উৎপীড়নের মোকাবিলা করে, তা হচ্ছে— দৈহিক বলপ্রয়োগ এবং ক্ষয়িষ্ণু বিদ্বেষ। হিংসা অনেক সময় ক্ষণস্থায়ী ফল দেয়। জাতি সমূহ যুদ্ধের মাধ্যমে বার বার স্বাধীনতা অর্জন করেছে। কিন্তু সাময়িক জয়লাভ সত্ত্বেও হিংসা কখনও স্থায়ী শান্তি আনতে

পারে না। হিংসা কোন সামাজিক সমস্যার সমাধান করে না। এ কেবল যতসব নতুন এবং জটিলতর সমস্যা সৃষ্টি করে।

জাতিগত ন্যায় বিচার অর্জনের পন্থা হিসেবে হিংসা অবাস্তব এবং অনৈতিক। এটি অবাস্তব এজন্যে যে এটি নিম্নমুখী ঘূর্ণিচক্র যার সমাপ্তি সর্বাত্মক ধ্বংসের মধ্যে। 'চোখের বদলে চোখ' এই পুরোতন বিধি প্রত্যেককে অন্ধ বানিয়ে ছাড়ে। এটি অনৈতিক এজন্যে যে এটি প্রতিপক্ষের সহমর্মিতা অর্জনের বদলে তাকে অবমানিত করার প্রয়াস পায় ; এটি অসৎ পথ থেকে সৎপথে আনার পরিবর্তে বিনাশ করতে উদ্যত হয়। হিংসা অনৈতিক এজন্যে যে হিংসা প্রেমের বদলে বিদ্বেষকে আশ্রয় করে। সমাজকে ধ্বংস করে এবং ভ্রাতৃত্বকে অসম্ভব করে তোলে। এটি সমাজকে স্বগতোক্তির মধ্যে রেখে দেয়, কথোপকথন বা মত বিনিময়ের মধ্যে নয়। হিংসা নিজের পরাজয়ের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। হিংসা জীবিতদের মধ্যে তিক্ততা এবং ধ্বংসকারীদের মধ্যে পাশবিকতা সৃষ্টি করে। একটি কণ্ঠস্বর নিরবধিকাল প্রত্যেক সম্ভাব্য পিটারকে সতর্ক করে দিয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, 'তোমার তরবারি কোষবদ্ধ কর'। যে-সব জাতি এই প্রত্যাদেশ অনুসরণ করেনি ইতিহাস তাদের ভগ্নাবশেষের দ্বারা জঞ্জালাকীর্ণ হয়ে আছে।

যদি আমেরিকার নিগ্রোরা এবং অন্যসব নির্যাতিতেরা স্বাধীনতা সংগ্রামে হিংসা অবলম্বনে প্রলুব্ধ হয়, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষদের প্রাপ্তি হবে একটি বিদ্বেষ-ক্লিষ্ট আনন্দবর্জিত রাত্রি। এবং আমরা যে উত্তরাধিকার তাদের জন্য রেখে যাব তা হবে অর্থহীন বিশৃঙ্খলার একটানা রাজত্ব। হিংসা আসল পথ বা পন্থা নয়।

স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াসে তৃতীয় যে পথটি নিপীড়িত মানুষদের কাছে খোলা আছে তা হচ্ছে অহিংস প্রতিরোধের পথ। হেগেলীয় দর্শনের সিনথিসিসের মত অহিংস প্রতিরোধ নীতি চায় অন্যায়কে মেনে নেওয়া এবং হিংসার আশ্রয় নেওয়া—এই দুই বিপরীতধর্মী উপায়ের চরমপন্থা এবং অনৈতিকতাকে এড়িয়ে তাদের মধ্যে যে সত্য আছে তার সমন্বয় সাধন করতে। যে অন্যায়-অত্যাচারকে মেনে নেয় তার সঙ্গে অহিংস প্রতিরোধকারী এ'বিষয়ে একমত যে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দৈহিক জোরজুলুম অনুচিত ; কিন্তু সে সমীকরণটিকে সুসম রাখে হিংস পন্থায় বিশ্বাসীর সঙ্গে সহমত হয়ে যে অশুভ শক্তিকে অবশ্যই রুখতে হবে। সে পূর্বোক্ত ব্যক্তির প্রতিরোধহীনতা এবং শেষোক্ত ব্যক্তির হিংস প্রতিরোধ পরিহার করে। অহিংস প্রতিরোধের মাধ্যমে গেলে কোন ব্যক্তির বা দলের কাছে নতি স্বীকারের বা অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য হিংসার আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

আমার মনে হয় জাতিক সম্পর্কের বর্তমান সংকটে এই পন্থার দ্বারাই নিগ্রোদের চালিত হওয়া উচিত। অহিংস প্রতিরোধের মাধ্যমে নিগ্রোরা অন্যান্য বিধি-ব্যবস্থাকে প্রতিরোধ করার মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে এবং সেই সঙ্গে সেই বিধিব্যবস্থার ধারক বাহকদের ভালবাসতে সক্ষম হবে। একজন নাগরিকের পূর্ণ মর্যাদা লাভ করার জন্য নিগ্রোদের আন্তরিকতার সঙ্গে অক্লান্তভাবে কাজ করে যেতে হবে।

কিন্তু এটি লাভ করতে হ'লে পদ্ধতি প্রয়োগ করা তার মোটেই উচিত হবে না। মিথ্যাচার, ঘৃণা বা বিনষ্টির সঙ্গে তারা কখনো আপোস করবে না।

অহিংস প্রতিরোধ নিগ্রোদের পক্ষে দক্ষিণাঞ্চলে বাস করা এবং তাদের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করা সম্ভবপর করে তুলবে। নিগ্রো-সমস্যার সুরাহা পালিয়ে গেলে হবে না। যারা নিগ্রোদের সদলে দক্ষিণ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার সাদা-মাটা প্রস্তাব রাখে, নিগ্রোরা তাদের কথা কানে নেয় না, নিতে পারে না। দক্ষিণে তারা তাদের বিপুল সুযোগের সদ্ব্যবহার করে জাতির নৈতিক শক্তি বাড়িয়ে তুলতে স্থায়ী অবদান যোগাতে পারে এবং অনাগত প্রজন্মের জন্য একটি মহৎ দৃষ্টান্ত রেখে যেতে পারে।

অহিংস প্রতিরোধের দ্বারা নিগ্রোরা সাম্যের জন্য তাদের সংগ্রামে সদিচ্ছাসম্পন্ন মানুষদের সমর্থন আদায়ও করতে পারে। নিগ্রোরা শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছে—জাতিগত সমস্যাটি এ'ধরনের কিছু নয়। পরন্তু এটি হচ্ছে ন্যায় এবং অন্যায়ের উত্তেজনাকর টানাপোড়েন। অহিংস সংগ্রাম উৎপীড়কের বিরুদ্ধে নয়, উৎপীড়নের বিরুদ্ধে। এর পতাকাতলে সংগ্রামের জন্য ভর্তি করা হোক বিবেকী মানুষদের, জাতি-গোষ্ঠীবাদী দল-উপদলগুলিকে নয়। একীকরণের লক্ষ্যে পেঁছিতে হলে নিগ্রোদের গড়ে তুলতে হবে একটি সংগ্রামী এবং অহিংস গণ-আন্দোলন। তিনটি উপাদানই অপরিহার্য। সাম্য এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হবে কেবলমাত্র যদি তার চরিত্র গণভিত্তিক এবং সংগ্রামী হয়; প্রতিরোধের বাধাকে অতিক্রম করতে হলে দু'টিই দরকার। সমাজকে চূড়ান্ত রূপ দিতে হলে অহিংসার প্রয়োজনীয়তা একান্ত অপরিহার্য।

যে জঙ্গী গণ-আন্দোলন অহিংসার প্রতি দায়বদ্ধ নয়, তার মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টির প্রবণতা থাকে যা ডেকে আনে অরাজকতা। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী-দের সমর্থন এবং নিরপেক্ষদের সহানুভূতি ব্যাহত হয় সমাজ রক্তস্রোতে ভেসে যাবে এই আশঙ্কায়। এই প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতিস্বরূপ বিরোধীরা উৎসাহিত হয় এবং জবরদস্তির আশ্রয় নেয়। অবশ্য যখন গণ আন্দোলন দৃঢ় পদক্ষেপে, লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে তখন যদি হিংসা দেখা দেয় তাহলে হিংসার প্ররোচনা এবং হিংস আচরণ আন্দোলনবিরোধীদের বলেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। ঐ অবস্থায় জন-গণের সমর্থন অহিংসার সমর্থকদের প্রতি চুম্বকের মত আকৃষ্ট হয়। আর যারা হিংসার পথে যায়, তারা তাদের নীতি ও কার্যাবলীর নিমিত্ত একটি বিরুদ্ধ ভাবা-বেগের বন্যায় আক্ষরিক অর্থে ভেসে যায়।

কেবলমাত্র অহিংস নীতির মাধ্যমেই শ্বেতাঙ্গ সমাজের ভয় বিদূরিত হতে পারে। অপরাধ-বোধ-জর্জরিত শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এই ভীতি নিয়ে বাস করে যে নিগ্রোরা যদি কোন দিন ক্ষমতায় আসে, তবে তারা সংযমের তোয়াক্কা না করে যুগ যুগ ধরে নির্দয়ভাবে তাদের উপর যে অন্যায় এবং পশুসুলভ আচরণ করা হয়েছে তার বদলা নেবে। এটা অনেকটা সেই মা বা বাবার মত যে প্রতিনিয়ত

সন্তানের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে। সেই মা বা বাবা ভয় পেয়েছে এই ভেবে যে সন্তান তার নতুন দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করে অতীতের মারধরের জন্য মা-বাবার উপর প্রতিশোধ নিতে পারে।

নিগ্রোরা একদা যে ছিল অসহায় শিশুর মত, এখন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে সেয়ানা হয়ে উঠেছে। অনেক শ্বেতাঙ্গ মানুষ প্রতিশোধকে ভয় করে। নিগ্রোদের কাজ হচ্ছে তাদের দেখানো যে ভয়ের কিছু নেই, নিগ্রোরা সবকিছু বোঝে এবং ক্ষমা করে এবং অতীতকে ভুলে যেতে প্রস্তুত। শ্বেতাঙ্গ মানুষকে বোঝাতে হবে যে তারা যা চায় তা হচ্ছে ন্যায় বিচার, তাদের এবং শ্বেতাঙ্গ মানুষদের উভয়ের জন্য। অহিংসা-ভিত্তিক গণ-আন্দোলন নিয়মশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্র একটি বাস্তব শিক্ষা যা শ্বেতাঙ্গ সমাজের কাছে প্রকট এবং প্রমাণ করে যে যদি ঐ ধরনের আন্দোলন যথেষ্ট পরিমাণে জোরদার হয়ে ওঠে, তাহলে এই ক্ষমতা ব্যবহৃত হবে রচনাত্মকভাবে, প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য নয়।

অহিংসা মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে, যেখানে সাধারণ আইন পৌঁছতে পারে না। আইন যখন আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে, তখন তা জনসাধারণের ভাবানুভূতিকে গড়ে তোলার ব্যাপারে গৌণভাবে কাজ করে। আইনের প্রয়োগই হচ্ছে এক ধরনের শাস্তিসম্পৃক্ত প্রত্যয় উৎপাদন। কিন্তু আইনকে সহায়তা দিতে হয়। আদালতসমূহ বিদ্যালয়গুলিতে পৃথকীকরণের অবসানের জন্য হুকুম দিতে পারে, কিন্তু ভয়-ভীতি দূর করতে, বিদ্যালয়ে-একীকরণ ঘিরে যে বিদ্বেষ, হিংসা এবং যুক্তিহীনতা জমাট বেঁধেছে তার অবলুপ্তি ঘটাতে, জাতিদ্বেষী তথাকথিত জননেতাদের হাত থেকে কাজের ভূমিকা এবং উদ্যম নিয়ে নিতে, আইনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে আদালতগুলি কি করতে পারে? শেষপর্যন্ত আইন মেনে চলার ব্যাপারে মানুষের এই বিশ্বাস থাকা চাই যে আইন যথার্থ এবং ন্যায়ানুগ।

এখানে অহিংসা আসে প্রত্যয় উৎপাদনের চরম এবং চূড়ান্ত রূপ নিয়ে। যে অসূয়াজনিত অন্ধতা, ভয়, অহঙ্কার এবং অযৌক্তিকতা সংখ্যাগরিষ্ঠ বিপুল সংখ্যক মানুষের বিবেককে সুপ্ত অবস্থায় রেখে দিয়েছিল, অহিংসা হচ্ছে সেই প্রক্রিয়া যা তাদের বিবেকের কাছে আবেদন রাখে এবং ন্যায়ানুগ আইনকে কার্যকর করার প্রয়াস পায়।

অহিংস প্রতিরোধীরা তাদের বক্তব্যকে সংক্ষেপে নিম্নোক্ত সরলতায় ব্যক্ত করতে পারে: অন্য কোন সংগঠনের কিছু করার জন্য অপেক্ষা না করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেমে পড়ব। আমরা ন্যায়বিরুদ্ধ আইনসমূহ মানব না অথবা অন্যায় আচরণের কাছে নতি স্বীকার করব না। যেহেতু যুক্তিসিদ্ধ প্রত্যয় জন্মানই আমাদের উদ্দেশ্য, তাই আমরা লড়াই করব শান্তিপূর্ণভাবে, খোলা-খুলিভাবে এবং প্রফুল্ল চিত্তে। আমরা অহিংস উপায় গ্রহণ করেছি, কারণ আমাদের লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে একটি সমাজ যা নিজের সঙ্গে শান্তিতে অবস্থান করবে।

আমরা কথাবার্তা বলে প্রতিপক্ষকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠিক পথে আনার চেষ্টা করব, কিন্তু কথায় কিছু না হলে, আমরা আমাদের কাজের মধ্য দিয়েই তা করব। আমরা আলাপ আলোচনার দ্বারা সঠিক আপোস মীমাংসায় আসার চেষ্টা করব, কিন্তু প্রয়োজনবোধে আমরা দুঃখ ভোগে রাজী হতে এবং সত্যকে যে দৃষ্টিতে দেখি তার জন্য এমনকি প্রাণ দিতেও পিছপা হ'ব না।

অহিংস উপায় অবলম্বনের অর্থ দুঃখবরণে এবং আত্মত্যাগে রাজী থাকা। এতে জেলে যেতে হতে পারে। যদি ব্যাপারটা এ'রকম হয়ে দাঁড়ায়, তবে প্রতিরোধীদের দক্ষিণের সমস্ত জেল ভরাতে অবশ্যই রাজী থাকতে হবে। মৃত্যুও এর শেষ পরিণতি হতে পারে। যদি একজন মানুষকে তার সন্তানদের শৃঙ্খলমুক্ত করার এবং শ্বেতাঙ্গ ভাইদের আত্মিক মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য মূল্য দিতে হয় মরণ দিয়ে, তবে এর চাইতে বড় প্রায়শ্চিত্ত আর কিছু হতে পারে না।

হিংসার বিরুদ্ধে নিগ্রোদের আত্মরক্ষার সর্বোত্তম উপায় কি হতে পারে ? ডঃ কেনেথ ক্লার্ক্ যেমন জোর দিয়ে বলেছেন, 'আত্মরক্ষার উপায় হবে একজন নিগ্রোর উপর বর্বর, আইনবিরুদ্ধ, নৃশংস এবং অন্যায় আচরণের মোকাবিলায় একশ' নিগ্রো তার জায়গায় সম্ভাব্য শিকার হয়ে এসে দাঁড়াবে।' প্রতি বার একজন নিগ্রো শিক্ষক একীকরণে বিশ্বাসের জন্য যখন বরখাস্ত হবেন, অন্য হাজারজন একই মনোভাব নিয়ে রুখে দাঁড়াবেন। যদি অত্যাচারীরা তার প্রতিবাদের জন্য একজন নিগ্রোর বাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করে, তাহলে তাদের এটা বুঝিয়ে দিতে হবে যে নিগ্রোদের সাহসিকতার উত্তাল তরঙ্গ রোধ করতে হলে তাদের শতশত বোমা নিক্ষেপের জন্য তৈরী থাকতে হবে, এবং এমনকি তখনো তারা ব্যর্থ হবে।

এই জোরদার ঐক্য, এই আশ্চর্য আত্মসম্মানবোধ, দুঃখবরণে এই আগ্রহ এবং প্রত্যাঘাত করার এই অস্বীকৃতির মুখোমুখি হয়ে অত্যাচারী দেখবে, যেমন অত্যাচারীরা চিরকাল দেখে এসেছে, যে তাদের নিজেদের নৃশংসতা তাদের গিলে ফেলছে। নিজেদের ভাইদের রক্তে রাঙ্গা হয়ে দুনিয়ার এবং ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াতে বাধ্য হয়ে তারা তাদের আত্ম-বিধ্বংসী হত্যালীলা বন্ধ করার ডাক দেবে।

আমেরিকার নিগ্রোদের এমন একটি বিন্দুতে এসে অবশ্যই দাঁড়াতে হবে যেখান থেকে তারা গান্ধীর কথা এ'ভাবে প্রকাশ করে বলতে পারেঃ 'দুঃখ দুর্দশা চাপিয়ে দেওয়ার তোমাদের যে ক্ষমতা আমরা তার মোকাবিলা করব আমাদের দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করার ক্ষমতা দিয়ে। আত্মার শক্তি দিয়ে আমরা তোমাদের দৈহিক শক্তির সম্মুখীন হ'ব। আমরা তোমাদের হিংসা করব না, কিন্তু সুস্থ বিবেক নিয়ে আমরা তোমাদের ন্যায়বিরুদ্ধ আইন মানব না। আমাদের প্রতি তোমাদের যা ইচ্ছা তাই কর এবং আমরা তখনো তোমাদের ভালবাসব। বোমা মেরে আমাদের ঘরবাড়ী উড়িয়ে দাও এবং আমাদের ছেলেমেয়েদের ভয় দেখাও, সাপের ন্যায় ফণাওয়ালা তোমাদের মত হিংসার কারবারীদের আমাদের সমাজ-সম্প্রদায়ের ভিতরে প্রেরণ কর এবং আমাদের কোন পথের ধারে টেনে আন, মারধর

করে আমাদের আধমরা করে ফেলে রাখ এবং তখনো আমরা তোমাদের ভালবাসব। কিন্তু আমরা আমাদের সহ্য করার শক্তি দিয়ে শীঘ্রই তোমাদের নিঃশেষে কাবু করে ফেলব। এবং আমাদের স্বাধীনতা জয় করে নিতে গিয়ে আমরা তোমাদের হৃদয়ের এবং বিবেকের কাছে আবেদন রাখব। এভাবে আমরা তোমাদের জয় করে নেব।'

বাস্তববোধে চালিত হয়ে আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে অনেক নিগ্রোর পক্ষে অহিংসার পথে চলা দুঃসাধ্য মনে হবে। কেউ কেউ এটিকে অর্থহীন মনে করবেন। কেউ কেউ এ'কথা বলবেন যে অহিংস সংগ্রামের গণবিক্ষোভে যোগদানের সামর্থ্য বা সাহস তাঁদের নেই। যেমন ই. ফ্রাঙ্কলিন ফ্র্যাজিয়ার তাঁর 'ব্ল্যাক্ বুর্জোয়াজি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে নিগ্রোরা পদ এবং মর্যাদার জন্য মধ্যবিত্ত-সংগ্রামে মেতে আছে। ন্যায়ের আদর্শের চাইতে দেখ্‌নাই ভোগবিলাস নিয়ে তারা বেশি মাথা ঘামায় এবং অহিংস সংগ্রামের সঙ্গে বিজড়িত দুঃখ এবং ত্যাগ স্বীকারে তারা প্রস্তুত নয়। যা হোক, সৌভাগ্যের কথা অহিংস পদ্ধতির সাফল্য এটিকে সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করার উপর নির্ভর করে না। প্রতিটি সমাজে অহিংস পদ্ধতির উপর আস্থাশীল অল্প কয়েকজন নিগ্রো শতশত লোকদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে অহিংসাকে অন্তত একটি কৌশল হিসাবে ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে এবং জাতির তন্দ্রাচ্ছন্ন বিবেককে জাগ্রত করার জন্য নৈতিক শক্তি হিসাবে কাজে লাগাতে পারে। এই রকমের সৃজনশীল সংখ্যালঘুর কথাই থোরো ভেবেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন, "আমি জানি যে যদি এক হাজার, যদি একশ', যদি দশজন লোক যাদের নাম বলতে পারি,— যদি মাত্র দশজন সৎলোক— হ্যাঁ, যদি মাত্র একজন সৎ লোক ম্যাসাচুসেট্‌স্ রাজ্যে ক্রীতদাস রাখা থেকে বিরত হয়ে দাসব্যবস্থার ভাগীদারীত্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয় এবং সেজন্য কাউণ্টি জেলে আটক থাকে, তবে তাতেই হবে আমেরিকায় দাসত্বপ্রথার অবলুপ্তি। কারণ আরম্ভটা যত ক্ষুদ্র আকারেই হোক তাতে কিছু আসে যায় না। কোন কাজ একবার উত্তমরূপে করা হলে তা চিরদিনের জন্য করা হয়ে যায়।"

মাহাত্মা গান্ধীর তাঁর দর্শনের প্রতি সম্পূর্ণ অনুরক্ত একশ' জনের বেশি লোক কোনদিন ছিল না। কিন্তু এই অল্পসংখ্যক বিশ্বস্ত অনুগামীদের নিয়ে তিনি সমগ্র ভারতকে উদ্দীপিত করে তুলেছিলেন এবং অহিংসার চমৎকার প্রয়োগের মাধ্যমে মহাপ্রতাপশালী বৃটিশ সাম্রাজ্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন এবং তাঁর জাতির জন্য স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন।

এই অহিংস পদ্ধতি রাতারাতি অলৌকিক কিছু ঘটাবে না। মানুষকে তাদের মানসিক নিগড় থেকে, তাদের সংস্কারাচ্ছন্ন যুক্তিবর্জিত ভাবনাচিন্তা অনুভূতি থেকে সহজে সরিয়ে আনা যায় না। যখন সুখসুবিধা থেকে বঞ্চিত মানুষেরা স্বাধীনতার দাবী জানায়, সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীর লোকেরা তখন তিক্ততা এবং প্রতিরোধের মাধ্যমে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এমনকি দাবীগুলি যদি অহিংস ভাষায় ব্যক্ত করা হয় তাহলেও প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া একই ধরনের হয়ে

থাকে। নেহরু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে ভারতীয়েরা যখন অহিংসার দ্বারা বৃটিশ শক্তিকে প্রতিরোধ করে, তখন বৃটিশেরা ক্রোধে এমন ফেটে পড়েছিল যা তাদের মধ্যে আগে কখনো দেখা যায়নি, যখন বৃটিশ সৈন্যেরা তাঁকে লাঠি দিয়ে প্রহার করে এবং তিনি আরেক গাল বাড়িয়ে দেন, তখন তাদের চোখে বিদ্বেষের আগুন জ্বলসে উঠতে দেখা যায়। কিন্তু অহিংস প্রতিরোধ অন্তত ভারতীয়দের মনে এবং অন্তরে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, বৃটিশদের যত দুর্ভেদ্য মনে হোক না কেন। নেহরু বলেছেন, 'আমি ভয়কে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম'। অবশেষে বৃটিশেরা ভারতবর্ষকে যে কেবল স্বাধীনতা দিল তা নয়, অধিকন্তু তারা ভারতীয়দের কাছে নতুন করে সম্মান পেল। আজকের দিনে কমনওয়েলথে এই দুই জাতির মধ্যে পরিপূর্ণ সমতার উপর প্রতিষ্ঠিত বন্ধুত্ব বিরাজ করছে।

দক্ষিণেও প্রথম দিকে নিগ্রোদের প্রতিরোধের বিষয়ে শ্বেতাঙ্গদের প্রতিক্রিয়া ছিল তিক্ত। আমি এমন ভবিষ্যদ্বাণী করি না যে কয়েক মাসের মধ্যে মণ্টগোমারীতেও ওই ধরনের আনন্দদায়ক পরিসমাপ্তি ঘটবে, কারণ একীকরণ স্বাধীনতার চাইতে বেশি জটিল। কিন্তু আমি জানি প্রতিবাদের দৌলতে মণ্টগোমারীর নিগ্রোগণ ইতিমধ্যে সহজতর ভাবে চলাফেরা করছে। আমি আশা করি যে লিটল্ রকের নয় জন শিশু এবং তাদের মত ন্যাশভিল, ক্লিনটন এবং স্টারজেসের শিশুদের সাহস, মর্যাদাবোধ এবং দুঃখবরণের কারণে বর্তমান প্রজন্মের নিগ্রো শিশুরা আরো ভালভাবে বেড়ে উঠবে, বলীয়ান হয়ে উঠবে। এবং আমি বিশ্বাস করি যে দেশের শ্বেতাঙ্গ মানুষেরা প্রভাবিত হচ্ছে এবং উপরের স্তরের নীচে জাতির বিবেক নাড়া খাচ্ছে।

অহিংস মনোভাব এবং উপায় অত্যাচারীর হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ পরিবর্তন আনে না। যারা অহিংসার প্রতি অনুরক্ত, অহিংসা তাদের হৃদয় এবং আত্মার উপর কিছু পরিমাণে ক্রীড়াশীল হয়। এটি তাদের দেয় নতুন আত্মমর্যাদা ; এটি তাদের শক্তি এবং সাহসকে জাগিয়ে তোলে, তা যে তাদের মধ্যে নিহিত ছিল সেই বোধ তাদের ছিল না। শেষে তা বিরুদ্ধবাদীকে স্পর্শ করে এবং তার বিবেককে নাড়া দেয় যার ফলে আপোস-মীমাংসা বাস্তবায়িত হয়।

এই নীতি অবলম্বনের জন্য আমি প্রস্তাব রাখছি, কারণ আমি মনে করি ভগ্ন সমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার এই হচ্ছে একমাত্র পথ। জাতি পৃথকীকরণের অবসানের ব্যাপারে আদালতের আদেশগুলির এবং কেন্দ্রীয় প্রয়োগ সংস্থা সমূহের মূল্য অপরিসীম। কিন্তু আসল লক্ষ্যে পৌঁছবার পথে পৃথকীকরণের অবলুপ্তি প্রয়োজনীয় হলেও এটি একটি আংশিক পদক্ষেপ মাত্র। পৃথকীকরণের অবসান আইনগত বাধা দূর করবে এবং লোকেদের দৈহিকভাবে পরস্পরের কাছে নিয়ে আসবে। কিন্তু হৃদয় এবং আত্মাকে স্পর্শ করার মত কিছু একটা ঘটা দরকার যাতে তারা পরস্পরের সান্নিধ্যে আসবে আইনের ফরমান বলে নয়, এটিই স্বাভাবিক এবং ন্যায়সঙ্গত বলে। মোট কথা, আমাদের চরম লক্ষ্য হচ্ছে একীকরণ যার অর্থ

যথার্থভাবে সামাজিক এবং ব্যক্তিক স্তরে মিলনের মধ্যে বেঁচে থাকা। কেবলমাত্র অহিংসার মাধ্যমে এই লক্ষ্যে পেঁছানো সম্ভব, কেননা অহিংসার অন্তিম ফলশ্রুতি হচ্ছে বিরোধের নিষ্পত্তি এবং প্রেমভিত্তিক নতুন সমাজের পত্তন।

এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে নিগ্রোদের একটি দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ সময়ের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। ফেডারেল কোর্টে নাগরিক অধিকারের যতই জয়জয়কার হচ্ছে, ততই ক্রোধ, বিদ্বেষ এবং গভীর ব্যক্তিগত বিরূপতা আরও বেশি করে জেগে উঠছে। রাজ্য এবং স্বায়ত্তশাসন স্তরে পৃথকীকরণ আইনগুলি এখনো পাহাড়ের মত খাড়া হয়ে আছে। সিটি অর্ডিন্যান্স বলে নিগ্রো নেতাদের আকছার গ্রেপ্তার, হয়রানি অব্যাহত রয়েছে। তাঁদের বাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ সমানেই চলছে। একীকরণকে বানচাল করে দেওয়ার জন্য রাজ্যস্তরে আইন পাশের বিরাম নেই। আমার প্রার্থনা নিগ্রোদের দুঃখভোগের প্রয়োজনীয়তাকে মেনে নিয়ে এটিকে পুণ্যের কাজ করে তুলতে হবে। ন্যায়ের পক্ষে থেকে দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করা মানবিক পূর্ণতায় উন্নীত হওয়া। শুধুমাত্র নিজেদের তিক্ততার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে নিগ্রোদের সেই দূরদৃষ্টি থাকা চাই যার দ্বারা তারা বর্তমান প্রজন্মের দুঃখ কষ্টকে নিজেদের তথা আমেরিকান সমাজের রূপান্তর সাধনের একটি সুযোগ হিসাবে দেখবে। স্বাধীনতার জন্য যদি তাদের কারাগারে যেতে হয়, তারা কারাগারে প্রবেশ করুক সেইভাবে গান্ধী যেমন তাঁর দেশবাসীকে জোর দিয়ে বলেছিলেন 'বর যেমন বাসর ঘরে প্রবেশ করে'— অর্থাৎ সামান্য দ্বিধাজড়িত ভয়, কিন্তু অনেক প্রত্যাশা নিয়ে।

অহিংসা বিনয় এবং সংযমের পথ। আমরা অর্থাৎ নিগ্রোরা আমাদের অধিকার নিয়ে অনেক কথাই বলি এবং যথার্থই বলি। আমরা জাঁক করে বলে থাকি বিশ্বের তিন চতুর্থাংশ মানুষ অশ্বেতকায়। আমাদের প্রজন্মের লোকদের সুযোগ মিলেছে এশিয়া আফ্রিকার মুক্তি এবং স্বাধীনতার নাটকের যবনিকা উন্মোচন দেখার। যথার্থ আত্মিক-বোধ নিয়ে এইসব গ্রহণ করতে হবে আমাদের। আমেরিকায়, এশিয়ায় এবং আফ্রিকায় স্বাধীনতা অর্জন করতে গিয়ে নীতিধর্ম বিসর্জন দিয়ে আমাদের পক্ষে একটি অসুবিধাজনক অবস্থান থেকে সুবিধাজনক অবস্থানে ঝাঁপিয়ে পড়া সঙ্গত হবে না। আমরা চাই গণতন্ত্র। এক রকমের উৎপীড়নের বদলে অন্য রকমের উৎপীড়ন নয়। শ্বেতাঙ্গদের পরাস্ত করা বা তাদের অপদস্ত করা আমাদের মোটেই উদ্দেশ্য নয়। 'কৃষ্ণাঙ্গ সার্বভৌমত্ব' দর্শনের শিকার আমরা হবই না! ঈশ্বর কেবলমাত্র কালো, বাদামী বা পীত রঙের মানুষদের স্বাধীনতাতে আগ্রহী নন; ঈশ্বরের আগ্রহ সমগ্র মানবজাতির স্বাধীনতায়।

ধীরে চলার নীতি বনাম তাৎক্ষণিকতার দীর্ঘ বিতর্কিত প্রশ্নের উত্তর মিলবে অহিংস দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। এক দিকে এটি কাউকে আটকে পড়ে থাকতে দেয় না একধরনের ধৈর্যের মধ্যে, যা কিছু-না-করা এবং পালিয়ে থাকার অজুহাত মাত্র এবং যার শেষ ভাঁওতার মধ্যে। অপর দিকে এটি মানুষকে রক্ষা করে দায়িত্বজ্ঞানহীন

বাচালতা থেকে যা মিটমাটের বদলে বিরূপতা সৃষ্টি করে এবং তাড়াহুড়া করে। কোন কিছুর বিচার করা থেকে বা সামাজিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাহ্য করে বিজ্ঞতাপ্রসূত সংযম এবং শান্ত বিচক্ষণতার সংগে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে এ স্বীকার করে। কিন্তু ন্যায় বিচারের অভিমুখে মন্থর অগ্রগতি এবং অন্যায্য স্থিতাবস্থার মধ্যে যে অনৈতিকতা আছে তার দিকে এর দৃষ্টি আছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এই স্বীকৃতি আছে যে সামাজিক পরিবর্তন রাতারাতি আসে না। কিন্তু এই অহিংস পন্থা তথা দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে এ'ভাবে কাজে উদ্বুদ্ধ করে যেন আগামী প্রাতঃকালেই বাঞ্ছিত পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা আছে।

অহিংসার দৌলতে আমরা বিজেতার মনস্তাত্ত্বিক সন্তুষ্টি নিয়ে মাতামাতি করার প্রলোভন এড়িয়ে গেছি। এম. এ. এ. সি. পি.'র সহায়তা এবং অমূল্য ধন্যবাদার্হ কাজের ফলে ফেডারেল কোর্টে আমাদের বড় রকমের জয় হয়েছে। কিন্তু এতে আমাদের আত্মসন্তুষ্টির কিছু নেই। আদালতের প্রতিটি সিদ্ধান্তে আমরা সাড়া দেব যারা আমাদের বিরোধিতা করছে তাদের সংগে সমঝোতার মনোভাব নিয়ে এবং আদালতের রায়ের সঙ্গে নতুনভাবে সমন্বয় ঘটানোর যে বিষয়টি তাদের সামনে দেখা দিয়েছে আমরা তা মেনে নেব। আমাদের কাজকর্মে আমরা এটিই বুঝিয়ে দেব যে—যে জয় হবে তা শ্বেতাংগ এবং নিগ্রো—সকল মানুষের সদিচ্ছার জয়।

অহিংসা সর্বাংশে একটি সদর্থক ধারণা। সার্বিক বৃদ্ধিই হবে সর্বদা এর অনুষংগ। একদিকে অহিংসা হচ্ছে অশুভ শক্তির সংগে অসহযোগ; অন্যদিকে এর পক্ষে আবশ্যক রচনাত্মক শুভশক্তির সহযোগিতা। এই গঠনমূলক দিক ব্যতিরেকে অসহযোগের যেখানে শুরু সেখানেই শেষ। অতএব নিগ্রোদের একটি ইতিবাচক লক্ষ্যসমষ্টি সামনে রেখে একটি সুসংবদ্ধ কার্যক্রম নিয়ে কাজ করে যেতে হবে।

নিগ্রোদের এই কার্যক্রমের অন্যতম বিষয় হবে আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন। ঋণদান সমিতি এবং ঋণ-সংস্থা ও সমবায় উদ্যোগ স্থাপনের মাধ্যমে নিগ্রোরা তাদের আর্থিক পদমর্যাদা অনেক বাড়িয়ে নিতে পারে। তাদের অবশ্য মিতব্যয়িতার অভ্যাস করতে হবে এবং বিচক্ষণতার সংগে বিনিয়োগ করার কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। অর্থনৈতিক বঞ্চনার মূলে যে পৃথকীকরণ প্রথা রয়েছে তার অবসানের জন্য অপেক্ষা করলে চলবে না; নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে নিজেদের উপরে তুলে নিতে তাদের এখনই কাজে লেগে পড়তে হবে।

আগামী দিনের গঠনমূলক কার্যক্রমে থাকবে নিগ্রোদের রেজিস্ট্রীকৃত হওয়ার এবং ভোট দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করার অভিযান। অবশ্য তাদের বাইরের অনেক বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। সব রকমের হীন কূটকৌশল এখনো প্রয়োগ করা হয় নিগ্রোদের ভোটদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে এবং এ'সমস্ত প্রচেষ্টার

সাফল্য শুধু ন্যায়বিরুদ্ধ নয়, যে দেশকে আমরা ভালবাসি এবং যার নিরাপত্তা-বিধান আমাদের অবশ্য কর্তব্য, এ'সব কিছু সেই দেশকে আসলে বিব্রত করে। ইউরোপে আমেরিকার সরকারী কর্মকর্তারা অবাধ নির্বাচনের সমর্থনে যে প্রচার চালান তা নিছক ভণ্ডামি হয়ে দাঁড়ায় যখন আমেরিকার অনেক অংশে কোন নির্বাচনই অনুষ্ঠিত হয় না।

কিন্তু নিগ্রোদের ভোটদানের ক্ষেত্রে বাইরের প্রতিরোধই একমাত্র বাধা নয়। নিগ্রোদের নিজেদের ঔদাস্যও একটি কারণ। ভোটদান সকলের কাছেই উন্মুক্ত, অথচ নিগ্রোরা ভোটাধিকারের সুযোগ নিতে তেমন গা করে না। নিগ্রো নেতাদের সমবেত চেষ্টা হওয়া উচিত তাঁদের লোকজনদের এই নিরাসক্ত ঔদাসীন্য থেকে নাগরিক সচেতনতায় উন্নীত করা। অতীতে ঔদাসীন্য ছিল নৈতিক ব্যর্থতা। আজকের দিনে এটি হবে এক ধরনের নৈতিক এবং রাজনৈতিক আত্মহনন।

আগামী দিনের গঠনমূলক কর্মসূচীতে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হবে নিগ্রোদের ব্যক্তিক জীবনমান উন্নয়নের একটি বলিষ্ঠ প্রয়াস। পুনর্বার বলতেই হবে যে নিগ্রোদের শ্রেণীগত মান যে পিছিয়ে রয়েছে তার কারণ কোন মজ্জাগত হীনতা নয়, তার কারণ পৃথকীকরণের অস্তিত্ব। নিগ্রো সমাজে যে আচরণিক ভিন্নতা রয়েছে, তার উৎপত্তির কারণ অর্থনৈতিক বঞ্চনা, আবেগসঞ্জাত হতাশা এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, যা পৃথকীকরণের সঙ্গে অপরিহার্যভাবে সহাবিদ্যমান। যখন শ্বেতাংগ মানুষ যুক্তি দেখিয়ে বলে পৃথকীকরণ বজায় রাখা উচিত, কেননা জীবনমানের নিরিখে নিগ্রোরা পিছিয়ে আছে, তখন তারা এটি দেখে না যে জীবনের নিম্নমানের কারণ পৃথকীকরণ।

তথাপি নিগ্রোদের স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের জীবনের মান প্রায়ই নীচু হয়ে পড়ে। সাবালকত্বের একটি লক্ষণ হচ্ছে আত্মসমালোচনার ক্ষমতা থাকা। যখনই আমরা শ্বেতাংগদের সমালোচনার পাত্র হই, যদিও সে সমালোচনার মধ্যে থাকে বিদ্বেষ এবং অর্ধসত্য, তবু এর মধ্যে যতটুকু সত্য থাকে আমাদের কিন্তু তা বেছে নিতে হবে এবং তাকে সৃজনধর্মী পুনর্গঠনের ভিত্তি হিসাবে কাজে লাগাতে হবে। আমরা যে অন্যায়ের শিকার এই ব্যাপারটির জন্য আমাদের তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে নিজেদের জীবনের দায়িত্ব নাকচ করে দেওয়া কিছুতেই হতে পারে না।

আমাদের অপরাধপ্রবণতা খুব বেশি। অনেক সময় আমাদের পরিচ্ছন্নতা বেশি-রকম নীচু মানের। আমাদের মধ্যে যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণী— তারা প্রায়ই আয়ের চেয়ে বেশি ব্যয় করে। ভাল কাজে, সংস্থায় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, যেখানে অর্থের মারাত্মক প্রয়োজন আছে, সেখানে কোন অর্থ সাহায্য করতে আমরা কুণ্ঠিত হই। আমরা প্রায়ই হৈহুল্লোড়ে মেতে থাকি, মদ্যপানে অত্যধিক অর্থব্যয় করি। এমন কি আমাদের সবচেয়ে দারিদ্র্যপীড়িত ব্যক্তি দশ সেণ্ট দামের একটি সাবান কিনতে পারে ; এমনকি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে অশিক্ষিত ব্যক্তির নৈতিক মান অতি উঁচু

হতে পারে। সামাজিক সংস্থা এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে নিগ্রো নেতা-দের অবশ্যই সক্রিয় কর্মসূচী হাতে নিতে হবে যার মধ্য দিয়ে নিগ্রো যুবকবৃন্দ নাগরিক জীবনের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে এবং তাদের সাধারণ আচার-আচরণের মান উন্নত করতে পারে। যেহেতু তুচ্ছতাবোধ এবং হতাশা থেকে অপরাধ-প্রবণতা জন্মায়, তাই নিগ্রো মাতা-পিতাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে তাদের সন্তানদের ভালবাসতে, তাদের প্রতি মনযোগ দিতে ; তাদের মধ্যে সাযুজ্য-বোধ গড়ে তুলতে—একটি পৃথকীকৃত সমাজে যা থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। এখনই আমরা আচার-আচরণের মানোন্নয়নের দ্বারা পৃথকীকরণের ধারকবাহক-দের কুযুক্তি ধসিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারব।

অতঃপর আমাদের বর্তমান কার্যক্রম হবে এ'রকম : রাজ্য বা স্থানীয় প্রশাসনের আইন এবং অনুশাসন সহ সমস্ত প্রকার জাতিগত আইনের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতি-রোধ— যদি তার ফলে জেলে যেতেও হয় ; সুকল্পিত, তেজোদৃপ্ত, গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দাসত্বের উত্তরাধিকার এবং পৃথকীকরণ, নীচুমানের বিদ্যালয়, বস্তি এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্বের দরুন নৈতিক অবনমনের বিলুপ্তি ঘটানো। যদি মণ্টগোমারীর জনগণ এবং লিটল রকের শিশুদের মত মর্যাদাবোধ এবং সাহস নিয়ে অহিংস সংগ্রাম চালানো যায়, তবে তাতেই অবনমনের অবসান ঘটবে, কিন্তু আমেরিকার বিবেকের দরবারে যদি অবহেলিত মানুষদের দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য এবং অজ্ঞতার উপর সরাসরি আক্রমণ চালানো যায়, তাহ'লে জয় সুনিশ্চিত।

মোট কথা, দুই ফ্রণ্টে আমাদের কাজ করতে হবে। একদিকে আমাদের প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে হবে পৃথকীকরণের বিরুদ্ধে— যা কিনা আমাদের জীবনের নীচু মানের মূল কারণ; অন্যদিকে আমাদের গঠনমূলকভাবে কাজ অবশ্যই করতে হবে জীবনের মান উন্নয়নের জন্য। দুর্দশার কারণ এবং তজ্জনিত কুফল— একটির বিরুদ্ধে আক্রমণ এবং অপরটির নিরাকরণ —এই দু'টির মধ্যে একটি ছন্দোময় রূপান্তর ঘটানো অবশ্যই প্রয়োজন।

এই সময়টি হচ্ছে নিগ্রোদের পক্ষে অতীব মূল্যবান। এখানেই চ্যালেঞ্জ। একটি মহৎ আইডিয়ার হাতিয়ার হওয়ার সুযোগ ইতিহাসে কখনো সখনো আসে। টয়েনবি তাঁর 'এ স্টাডি অফ্ হিস্টরি'তে বলেছেন যে পশ্চিমী সভ্যতার বেঁচে থাকার জন্য যে আর্থিক গতিময়তার মারাত্মক প্রয়োজন আছে তা হয়ত নিগ্রোরাই যোগাতে পারবে। আমি আশা করি এটি সম্ভব। নিগ্রোরা যে আত্মিক শক্তি বিশ্বে বিচ্ছুরিত করতে পারে তা আসে প্রেম, সমঝোতার মনোভাব, সদিচ্ছা এবং অহিংসা থেকে। এমনকি এটাও সম্ভব হতে পারে যে নিগ্রোরা অহিংসার আদর্শ এবং পন্থা অবলম্বন করে বিশ্বের জাতি সমূহকে এভাবে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে যাতে তারা যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে যুদ্ধ এবং ধ্বংসের বিকল্প খুঁজতে থাকবে। এমন দিনে যখন স্পুটনিক এবং এক্সপ্লোরার প্রচণ্ড বেগে মহাকাশে ছুটে চলে এবং নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র বায়ুমণ্ডলের উপরস্তর দিয়ে মরণের পথ তৈরি

করে চলেছে, তখন কেউ যুদ্ধে জয়ী হতে পারে না। আজ হিংসা এবং অহিংসার মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার দিন নয়। এ হচ্ছে অহিংসা অথবা অস্তিত্বের বিলোপ। নিগ্রোজাতি হয়ে উঠতে পারে যুগের প্রতি ঈশ্বরের আবেদন— যে-যুগ অতি দ্রুত সার্বিক বিনাশের দিকে ছুটে চলেছে। শাশ্বত আবেদন এই সতর্কবাণীতে ধ্বনিত হয়ে আসে— 'যারা হাতে তরবারি তুলে নেবে, তরবারির দ্বারাই তাদের বিনাশ ঘটবে'।

কঠোর মন এবং কোমল হৃদয়

(অ্যা টাফ্ মাইণ্ড অ্যাণ্ড অ্যা টেণ্ডার হার্ট)

একজন ফরাসী দার্শনিক বলেছেন, 'কোন মানুষ শক্তিমান হতে পারে না যদি না তার চরিত্রে পরস্পরবিরোধী গুণাবলীর সুদৃঢ় সমাবেশ ঘটে।' শক্তিমান মানুষের মধ্যে আছে পরস্পরবিরোধী ভাব বা গুণের জীবন্ত সমাবেশ। সাধারণত মানুষের মধ্যে এই বিপরীতধর্মী গুণের ভারসাম্য দেখা যায় না। আদর্শবাদীরা প্রায়শ বাস্তববাদী হন না এবং বাস্তববাদীরা কদাচিৎ আদর্শবাদী হয়ে থাকেন। জঙ্গীবাদীরা সাধারণত নিষ্ক্রিয় হয় না, আবার নিষ্ক্রিয় মানুষ জঙ্গীবাদী নয়। কোমলস্বভাব মানুষ নিজেকে জাহির করে না। আবার যারা নিজেকে জাহির করে তারা মৃদুস্বভাবের লোক নয়। কিন্তু জীবনের সর্বোত্তম প্রকাশ বিপরীতধর্মী ভাবসমূহের সৃজনশীল সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি ফলপ্রসু ঐকতানে উত্তরণের মধ্যে। দার্শনিক হেগেল বলেছেন সত্যকে থিসিস্ বা এন্টিথিসিসের মধ্যে পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে এই দু'টির সমন্বয় থেকে উদ্ভূত সিনথেসিসের মধ্যে।

বিপরীতধর্মী গুণ বা ভাবসমূহের সমন্বয়ের যে প্রয়োজন আছে যীশু তা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি জানতেন যে তাঁর শিষ্যদের একটি কঠিন এবং বিরুদ্ধবাদী দুনিয়ার সামনে পড়তে হবে যেখানে তাদের মুখোমুখি হতে হবে শাসকশ্রেণীর বিরূপতার এবং পুরনো ব্যবস্থার ধারকবাহকদের বিরোধিতার। তিনি জানতেন যে তাঁদের সঙ্গে নিস্পৃহ এবং উদ্ধত স্বভাবের মানুষদের সাক্ষাৎ ঘটবে, ঐতিহ্যের সুদীর্ঘ শীত ঋতুতে যাঁদের হৃদয় পাষাণ হয়ে গেছে। তাই তিনি তাঁদের বলেছিলেন, 'দেখ আমি মেষসদৃশ তোমাদের পাঠাচ্ছি নেকড়েদের মধ্যে', এবং তিনি তাঁদের একটি কাজের সূত্র বাতলে দিলেন : 'সুতরাং তোমরা সর্পের ন্যায় চতুর এবং কপোতের মত নিরীহ হবে"। একজন মানুষ একই সঙ্গে সর্প এবং কপোতের স্বভাব পাবে— এটি কল্পনা করাও বেশ দুরূহ, কিন্তু যীশু তাই চেয়েছিলেন। আমাদের সর্পের দৃঢ়তা এবং কপোতের কমনীয়তা এই দুয়ের সমন্বয় ঘটাতে হবে। অর্থাৎ একটি কঠোর মন এবং একটি কোমল হৃদয়।

এক

প্রথমে কঠোর মনের বিষয় ধরা যাক। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তীক্ষ্ণ চিন্তা, বাস্তবানুগ মূল্যায়ণ এবং সুনিশ্চিত বিচার। কঠোর মন তীক্ষ্ণ এবং মর্মভেদী যা সকল প্রকার কিংবদন্তী এবং রহস্যময় অতিকথনকে চূর্ণ করে দেয় এবং মিথ্যা এবং সত্যের মধ্য থেকে সত্যকে বেছে নিতে পারে। কঠোর মনের মানুষ বিচক্ষণ এবং স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন। তাঁর আছে শক্তি এবং কঠোর 'আত্মসংযম' যা দেয় উদ্দেশ্য সাধনের ও দায়িত্ববোধের দৃঢ়তা।

কোন সন্দেহ নেই যে মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুর একটি হচ্ছে মনের কঠোরতা। কঠোর দৃঢ়নিবদ্ধ চিন্তায় রত এমন মানুষ কদাচিৎ দেখা যায়। প্রায় সব বিষয়েই সহজ সরল উত্তর এবং অসম্পূর্ণ সমাধান খুঁজে বেড়ানোর ঝোঁক দেখা যায়। কোন কোন ব্যক্তির কাছে কোন বিষয়ে চিন্তা করাটাই যেন সবচেয়ে বেদনাদায়ক ব্যাপার।

এই নরম মানসিকতার জন্য মানুষ অবিশ্বাস্য রকমের ধাপ্পাবাজির শিকার হয়ে পড়ে। বিজ্ঞাপনের প্রতি আমাদের মনোভাবের কথাই ধরা যাক। আমরা অতি সহজেই একটা জিনিস কিনতে উদ্যত হই কেননা টেলিভিশনে কিংবা রেডিওতে বিজ্ঞাপন মারফৎ বলা হয়ে থাকে যে ওই জিনিসটি ওই জাতীয় অন্য যে কোন জিনিসের চেয়ে উৎকৃষ্ট। বিজ্ঞাপনদাতারা অনেক আগেই জেনে ফেলেছে যে বেশির ভাগ মানুষ নরম মনের এবং তারা সহজে প্রভাবিত হয় বলে বিজ্ঞাপনদাতারা বেশ কায়দা করে ফায়দা ওঠায়।

এ'ধরনের অসমীচীন সহজগ্রাহ্যতা অনেক লোকের মধ্যে দেখা যায় যারা সংবাদপত্রের ছাপা কথাকে চরম সত্য বলে গ্রহণ করে থাকে। খুব কম লোকই বুঝতে পারে যে নির্ভরযোগ্য সংবাদসূত্র যেমন সংবাদপত্র, বক্তৃতামঞ্চ এবং অনেক-ক্ষেত্রে গীর্জার প্রচারবেদী থেকেও তথ্যনির্ভর পক্ষপাতশূন্য সত্যের প্রকাশ বা প্রচার হয় না। খুব কম লোকেরই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করার, সত্য-মিথ্যা যাচাই করার, বাস্তব ঘটনাকে রটনা থেকে আলাদা করে দেখার মত মানসিক দৃঢ়তা আছে। আমাদের মন অবিরত অসংখ্য অর্ধসত্য, কুসংস্কার এবং মিথ্যা ঘটনার দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। সমগ্র মানব সমাজের একটি বড় প্রয়োজন হ'ল যতসব অসত্য প্রচারকার্যের বদ্ধজলা থেকে উঠে আসা।

নরম মনের মানুষদের মধ্যে কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে থাকার প্রবণতা থাকে। তারা অবিরত অযৌক্তিক ভয়ের দ্বারা আক্রান্ত হয়। সেই ভয় ১৩ তারিখের শুক্রবার থেকে কালো বিড়ালের রাস্তা ডিঙানো পর্যন্ত হতে পারে। নিউ ইয়র্কের একটি বড় হোটেলে এলিভেটরে যখন উপরে উঠেছিলাম তখন আমার নজরে এলো যে সেখানে তের তলাটি নেই। বারোর পরে চৌদ্দ। এই বাদ পড়ার কারণ কি জিজ্ঞেস করাতে এলিভেটর চালক বলল, 'এই নিয়ম সব বড় হোটেলেই অনুসরণ করা হয়, কারণ অনেকে তের তলাতে থাকতে ভয় পায়'। তারপর সে বলল, 'এই ভয়ের মধ্যে যে বোকামি আছে তা হ'ল ওই চৌদ্দ তলাটাই আসলে কিন্তু তের তলা।' এ'সমস্ত ভয় দুর্বল মনকে দিনের বেলায় খেপাটে এবং রাতে ভুতুড়ে করে রাখে।

নরমচিত্তের মানুষ পরিবর্তনকে সর্বদা ভয় করে। সে বর্তমান অবস্থার মধ্যে নিরাপদ বোধ করে এবং নতুনের সম্বন্ধে তার আছে এক ধরনের অস্বাস্থ্যকর ভীতি। কোন নতুন মত বা ধারণা তার কাছে বড়ই পীড়াদায়ক। দক্ষিণের জাতি-পৃথকীকরণের একজন বয়স্ক সমর্থক নাকি বলেছিল, 'আমি দেখতে পাচ্ছি জাতি-

পৃথকীকরণ নীতির অবসান অনিবার্য। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে আমার প্রার্থনা আমার মৃত্যুর পূর্বে যেন এটি না ঘটে।' নরম মনের মানুষ কালের গতিকে থামিয়ে দিতে এবং জীবনকে অপরিবর্তনীয়তার শক্ত জোয়ালে আটকে রাখতে চায়।

দুর্বলমনস্কতা প্রায়শ ধর্মকে আক্রমণ করে। তাই ধর্ম অনেক সময় অন্ধ আবেগবশত নতুন সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে। ধর্মীয় অনুশাসন এবং পোপের নির্দেশনামা, ধর্মগত অপরাধের বিচার এবং ধর্ম থেকে বহিস্করণের মাধ্যমে চার্চ সত্যকে দূরে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে, সত্যানুসন্ধানীর পথে দুরতিক্রম্য পাষাণ প্রাচীর তুলে রেখেছে। দুর্বল চিত্তের মানুষেরা বাইবেলের ঐতিহাসিক দার্শনিক সমালোচনাকে ধর্মবিরোধী এবং যুক্তিকে নীতিহীনতা বলে মনে করে। নরম মনের লোকেরা স্বর্গসুখ সম্বন্ধে খ্রীষ্টের উপদেশাবলীকে এই-ভাবে পাঠ করে, 'অজ্ঞতার মধ্যে পবিত্র যারা তারাই ভাগ্যবান; কেননা তারা ঈশ্বরের দর্শন লাভ করে।'

এর ফলে এমন একটি ব্যাপক ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে বিরোধ রয়েছে; কিন্তু এটা সত্য নয়। দুর্বলচিত্ত ধার্মিকম্মন্যদের সঙ্গে কঠোরচিত্ত বৈজ্ঞানিকদের বিরোধ থাকতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। উভয়ের জগত পৃথক, পৃথক তাদের পদ্ধতিও। বিজ্ঞান অনুসন্ধান করে; ধর্ম করে ব্যাখ্যা। বিজ্ঞান মানুষকে দেয় জ্ঞান যা হচ্ছে শক্তি; ধর্ম মানুষকে দেয় প্রজ্ঞা যা হচ্ছে সংযম। বিজ্ঞানের কারবার বস্তুজাগতিক ঘটনা নিয়ে; ধর্মের কারবার প্রধানত মূল্যবোধ নিয়ে। একটি অপরটির প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, পরিপূরক। বিজ্ঞানের প্রভাবে ধর্ম ক্ষয়িষ্ণু অযৌক্তিকতার গহ্বরে তলিয়ে যায় না, প্রগতিবিরোধী কুসংস্কারে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে না। ধর্ম বিজ্ঞানকে বাতিল জড়বাদ এবং নৈতিক অরাজকতার বদ্ধজলায় ডুবে যেতে দেয় না।

লঘুচিত্ততার বিপদ কোথায় তা অনুধাবন করতে বেশিদূরে যেতে হবে না। একনায়কেরা মানুষের লঘুচিত্ততাকে কাজে লাগিয়ে সভ্য সমাজের অচিন্ত্যনীয় বর্বরতা এবং ভয়াবহ উগ্রতার মধ্যে মানুষকে ঠেলে নিয়ে গেছে। তাঁর অনুগামী-দের মধ্যে লঘুচিত্ততা অতি বেশি মাত্রায় রয়েছে এটা বুঝেই এডল্ফ হিটলার বলেছিলেন, 'আমি বহুসংখ্যকের ভাবাবেগকে কাজে লাগাই, আর যুক্তি কেবল গোটাকয়েক লোকের জন্য সংরক্ষিত রাখি'। মেইন ক্যাম্ফে (Mein Kampf) তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন— 'চাতুর্যপূর্ণ মিথ্যার একটানা পুনরাবৃত্তির দ্বারা মানুষকে বিশ্বাস করানো যায় যে স্বর্গ হচ্ছে নরক, আর নরক স্বর্গ… । মিথ্যা যত বড় মাপের হবে, ততই মানুষ তা সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করবে।'

বর্ণ বিদ্বেষের একটি কারণ হ'ল লঘুচিত্ততা। দৃঢ়চিত্তের মানুষ কোন বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসার আগে ঘটনা পরম্পরা পরীক্ষা করে দেখে; এক কথায়, সে বিচার করে ঘটনার পর। নরম মনের মানুষ কোন ব্যাপারে একটি ঘটনা পরীক্ষা করে দেখার আগেই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়; অর্থাৎ সে অগ্রে বিচার করে,

এবং পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ে। জাতিগত বিদ্বেষের পেছনে রয়েছে অনর্থক ভয়, সন্দেহ এবং ভুল বোঝাবুঝি। এমন সব লোক আছে যারা লঘুচিত্ততা বশত বিশ্বাস করে যে শ্বেতজাতি উচ্চ স্তরের জীব এবং নিগ্রো জাতি নিম্নস্তরের, যদিও নৃতত্ত্ববিদদের একাগ্র গবেষণা এই ধারণার ভিত্তিহীনতাই প্রমাণ করে। এমন সব লঘুচিত্ত ব্যক্তি আছে যাদের যুক্তি হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং নৈতিক মানে নিগ্রোরা অনেক পিছিয়ে আছে। নিগ্রোদের পিছিয়ে থাকার কারণ যে জাতি-পৃথকীকরণ এবং পক্ষপাতদুষ্ট নীতি একথা বোঝাবার মত মনের জোর অনেকের নেই। জাতি পৃথকীকরণের ভয়াবহ ফলশ্রুতিকে ওই নীতি অনুসরণ করে যাওয়ার যুক্তি হিসাবে গণ্য করা অসুস্থ বিচারবুদ্ধির পরিচায়ক এবং সমাজনীতির দিক থেকে সমর্থনযোগ্য নয়। দক্ষিণাঞ্চলে রাজনীতি করেন এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা এই লঘুচিত্ততারূপ রোগের কথা জানেন যা তাঁদের নির্বাচকমণ্ডলীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। প্ররোচনামূলক আবেগের সঙ্গে তাঁরা জ্বালাময়ী ভাষণে বিকৃত তথ্য এবং অর্ধসত্য প্রচার করেন যার ফলে অশিক্ষিত এবং স্বল্প সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত শ্বেতাঙ্গদের মনে ভয় এবং অসুস্থ সহানুভূতিহীনতা জন্মায়। ফলে তারা এমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে যে তারা নীচ এবং হিংস্র কার্যকলাপে লিপ্ত হয়— যা স্বাভাবিক বোধসম্পন্ন মানুষ কখনো করবে না।

যতদিন পর্যন্ত না আমাদের মন দৃঢ় হয়, ততদিন পর্যন্ত কুসংস্কার, অর্ধসত্য এবং সর্বৈব অজ্ঞতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন আশা নেই। আজ তামাম দুনিয়া যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তাতে লঘুচিত্ততার বিলাপ থাকতে পারে না। যে জাতি বা সভ্যতা লঘুচিত্ত মানুষদের জন্ম দেয়, সে জাতি কিস্তির ভিত্তিতে তার আত্মিক মৃত্যুকেই কিনে নেয়।

দুই

কিন্তু আমাদের কঠোর মন তৈরি করলেই চলবে না। গসপেল চায় একটি কোমল হৃদয়। কোমল হৃদয় ব্যতীত কঠোর মন হয় শীতল এবং বিচ্ছিন্ন, যার ফলে জীবনে থাকে না বসন্তের কবোষ্ণতা এবং গ্রীষ্মের মৃদু উত্তাপ। একজন মানুষ মনে কঠোর এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ, অথচ হৃদয় তার বোধশূন্য কাঠিন্যে অবনমিত—এমন দৃশ্য কতই না ভয়াবহ।

কঠিন হৃদয়ের মানুষ কখনো ভালবাসতে পারে না। সে মেতে থাকে স্থূল উপযোগিতাবাদ নিয়ে, সে অন্য লোকের মূল্য যাচাই করে সেই লোক তার কতটুকু কাজে লাগবে তা দিয়ে। বন্ধুত্বের মধ্যে যে সৌন্দর্য আছে তা সে কোন দিন অনুভব করতে পারে না, কারণ অন্যের প্রতি কোন মমত্ববোধ তার থাকে না এবং সে এতটা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে যে অন্যের সুখ দুঃখের শরিক হতে পারে না। সে তার একাকীত্ব নিয়ে পড়ে থাকে। তার মধ্যে প্রেমের প্রকাশ নেই বলে সে মুখ্য জীবনস্রোতের সঙ্গে মিলিত হতে পারে না।

কঠিন-হৃদয় মানুষের সত্যিকারের দয়ামায়ার ক্ষমতা থাকে না। ভাইয়ের ব্যথা-বেদনা-যন্ত্রণা তার মনকে নাড়া দেয় না, অভাগা মানুষের পাশ দিয়ে সে রোজই হেঁটে যায়, কিন্তু তাদের দেখতে পায় না। সে যোগ্য কর্মে অর্থদান করে বটে, কিন্তু সে-দানে তার আত্মিক সংযোগ ঘটে না।

কঠোর-হৃদয় ব্যক্তিরা মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখে না, বরং দেখে বস্তু হিসাবে বা ঘূর্ণায়মান চাকার নৈর্ব্যক্তিক খাঁজের মত। বিরাট শিল্পচক্রে সে মানুষকে জানে শ্রমিক বলে। বৃহৎ নাগরিক জীবনের অতি বৃহৎ চক্রে সে মানুষদের দেখে বড় সংখ্যার একক-দশক শতক রূপে। সৈনিক জীবনের মারাত্মক চক্রে সে মানুষদের দেখে সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা হিসাবে। সে জীবনকে ব্যক্তিত্বহারা করে নেয়।

যীশু প্রায়ই কঠোর-হৃদয় মানুষদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টান্ত দিতেন। নির্বোধ-ধনী ধিক্কৃত হয়েছিল সে কঠোর চিত্তের লোক ছিল বলে নয়, সে কোমল হৃদয়ের লোক ছিল না বলে। তার কাছে জীবন ছিল আরশির মত যার মধ্যে সে শুধু নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেত, জীবন জানালার মতো ছিল না যার মধ্য দিয়ে সে অপর মানুষদেরও দেখতে পেত। ডাইবস্ নরকে গেল ধনী ছিল বলে নয়, গরীব ভাই ল্যাজারাস্‌কে দেখবার মত কোমল হৃদয় তার ছিল না বলে এবং নিজের সঙ্গে ভাইয়ের যে ব্যবধান ছিল তার অপসারণের কোন চেষ্টা করেনি বলে।

যীশু আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে উত্তম জীবনের মধ্যে সর্পের কঠোরতা এবং কপোতের মৃদুতা সমন্বিত হয়। যেখানে সর্পের গুণের সঙ্গে কপোতের গুণের সমন্বয় হয়নি, সেখানে রয়েছে আবেগশূন্যতা, নীচতা এবং স্বার্থপরতা। আবার কপোতের গুণ আছে, অথচ সর্পের গুণ নেই— সে জীবন ভাবপ্রবণ, অসার এবং উদ্দেশ্যবিহীন। আমরা চাই বিপরীতধর্মী গুণের সুদৃঢ় সমন্বয়।

নিগ্রো হিসাবে আমাদের কঠোর মন এবং কোমল হৃদয়ের মিলন ঘটাতে হবে, যদি আমাদের সৃজনশীলতা নিয়ে স্বাধীনতা এবং ন্যায় বিচারের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে হয়। আমাদের মধ্যে যারা লঘুচেতা তারা মনে করে অত্যাচারের সঙ্গে মানিয়ে চলাটাই প্রকৃষ্ট পন্থা। তারা জাতিপৃথকীকরণ নীতিকে স্বীকার করে নেয়, ওই নীতির কাছে আত্মসমর্পণ করে। তারা নিপীড়িত থেকে যেতেই পছন্দ করে। মোজেজ্ যখন ইজরায়েল সন্তানদের মিশরীয় দাসত্ব থেকে প্রার্থিত ভূমির স্বাধীনতায় চালিত করে নিয়ে গেলেন, তখন তিনি দেখলেন দাসেরা অনেক সময় তাদের মুক্তিদাতাদের অভিনন্দিত করে না। শেক্সপিয়ার যেমন দেখিয়েছেন—তারা বরং দুর্ভোগ সহ্য করবে, তবু অজানার পথে পা বাড়াবে না। তারা মুক্তির যন্ত্রণার চেয়ে দাসত্বের মধ্যে থেকে গিয়ে 'মিশরের সুখভোগ' বেশি পছন্দ করে। এটি কিন্তু সঠিক পথ নয়। লঘুচিত্ততাজনিত মৌন সম্মতি আসলে কাপুরুষতা। বন্ধুগণ, আমরা যদি আমাদের সন্তান-

সন্তানদের ভবিষ্যতের বিনিময়ে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং আরামের কথা ভাবি তাহ'লে আমরা দক্ষিণাঞ্চলের বা অন্য কোন স্থানের শ্বেতাংগদের শ্রদ্ধা আদায় করতে পারব না। তাছাড়া আমাদের বুঝতে হবে যে একটা অন্যায্য শাসন-ব্যবস্থাকে বিনা আপত্তিতে মেনে নেওয়ার অর্থ সেই শাসনব্যবস্থার সংগে সহযোগিতা করা এবং তার ফলে অন্যায়ের ভাগীদার হওয়া।

এবং আমাদের মধ্যে নির্মম স্বভাব এবং তিক্ত মনোভাবের লোক আছে যারা শারীরিক হিংসা এবং অবক্ষয়ী বিদ্বেষ নিয়ে বিরোধীদের সংগে লড়াই করবে। হিংসা সাময়িক জয় আনতে পারে ; হিংসা সামাজিক সমস্যার যত না সমাধান করে, তার চাইতে সৃষ্টি করে বেশি। হিংসা কখনো স্থায়ী শান্তি আনতে পারে না। আমার নিশ্চিত ধারণা আমরা যদি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে হিংসার পথ অবলম্বনে প্রলুব্ধ হই, তা হ'লে অনাগত প্রজন্মের মানুষেরা পাবে এক দীর্ঘ, বিষণ্ণ, তিক্ত রাত্রি এবং আমরা তাদের জন্য উত্তরাধিকার হিসাবে রেখে যাব একটানা বিশৃংখলার রাজত্ব যার কোন শেষ নেই। কালের গতিপথে একটি কণ্ঠস্বর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে প্রতিটি দুর্বিনীত পিটারকে বলছে, "তোমার তরবারি কোষবদ্ধ কর।" যে-সব জাতি খ্রীষ্টের অনুশাসন মেনে চলেনি ইতিহাস তাদের ধ্বংসস্তূপে আকীর্ণ হয়ে আছে।

তিন

স্বাধীনতার অন্বেষণে একটি তৃতীয় পথ আমাদের জন্য খোলা আছে। তা হচ্ছে অহিংস প্রতিরোধ যা কঠোর মন এবং কোমল হৃদয়ের মিলন ঘটায়, যা মৃদু মনের মানুষের আত্মতুষ্টি ও অকর্মণ্যতা এবং কঠোর হৃদয়ের মানুষের হিংস্রতা ও তিক্ততা— এই দু'টিকেই পরিহার করে। আমার বিশ্বাস জাতিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে বর্তমান সংকটের মোকাবিলায় আমাদের কাজকর্ম পরিচালিত হওয়া উচিত এই পদ্ধতির দ্বারাই। অহিংস প্রতিরোধের মাধ্যমেই আমরা অন্যায্য শাসনব্যবস্থার বিরোধিতা করব এবং সেই সংগে এই ব্যবস্থার ধারকবাহকদের ভালবাসব। নাগরিকদের পূর্ণ মর্যাদা আদায়ের জন্য একাগ্রভাবে, অদম্য উৎসাহের সংগে কাজ করে যাব ; কিন্তু, বন্ধুগণ, এ অপবাদ যেন কেউ আমাদের দিতে না পারে যে আমরা পূর্ণ নাগরিকত্ব অর্জনের জন্য মিথ্যাচার, বিদ্বেষ, ঘৃণা বা হিংসার মত নীচুস্তরের উপায় অবলম্বন করেছি।

ঈশ্বরীয় প্রকৃতিতে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার প্রয়োগ না করে আমি এই আলোচনার ইতি টানব না। ঈশ্বরের মহত্ব এখানে যে তাঁর মন কঠোর সদয় কোমল। কঠোরতা এবং কোমলতা— এই দুই গুণেই তাঁর মধ্যে বিরাজ করছে। বাইবেলে ঈশ্বরের এই গুণের উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাঁর কঠোর চিত্তের প্রকাশ তাঁর ক্রোধ এবং ন্যায়বিচার, কোমল হৃদয়ের প্রকাশ তাঁর প্রেমে এবং কৃপায়। ঈশ্বরের আছে দুই প্রসারিত হস্ত। এক হস্ত শক্ত যেটি ন্যায়বিচারের দ্বারা আমাদের ঘিরে

আছে, অন্যটি কোমল যেটি কৃপার আলিঙ্গনে আমাদের ধরে আছে। এক দিকে ঈশ্বর ন্যায়বিচারের ঈশ্বর যিনি ইজরায়েলকে তার উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য শাস্তি দিয়েছিলেন। অন্য দিকে তিনি ক্ষমাশীল পিতা যাঁর হৃদয় অব্যক্ত আনন্দে ভরে উঠেছিল যখন অবাধ্য সন্তানেরা ঘরে ফিরে এসেছিল।

আমি ধন্য এজন্য যে আমরা এমন ঈশ্বরের পূজা করি যাঁর মন কঠোর, হৃদয় কোমল। ঈশ্বর যদি শুধু কঠোরচিত্ত হতেন, তাহলে তিনি হতেন নিরুত্তাপ, ভাবাবেগহীন, স্বৈরাচারী যিনি সুদূর স্বর্গলোকে বসে, কবি টেনিসন তাঁর 'দ্য প্যালেস্ অফ্ আর্ট'-এ যেমন বলেছেন, 'নির্বিষ্ট মনে সবকিছু নিরীক্ষণ করছেন'। তিনি হতেন অ্যারিস্টটল কথিত 'অটল চালক' (আনমুভ্ড্ মুভার), আত্মজ্ঞানী কিন্তু প্রেমহীন। কিন্তু ঈশ্বর যদি শুধু কোমল-হৃদয় হতেন, তাহ'লে তিনি এমন ভাবাবেগ-প্রবণ হয়ে যেতেন যে তাঁর সৃষ্টি বিপথে যেত, তিনি তাঁর সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে পারতেন না। তিনি হতেন এইচ্. জি. ওয়েল্স্ বর্ণিত ঈশ্বরের মধ্যেকার সেই ঈশ্বর যিনি কেবল ভালবাসার যোগ্য, অদৃশ্য রাজা, যাঁর অভিলাষ একটা উত্তম জগৎ সৃষ্টি করা। কিন্তু যিনি অশুভ শক্তির কাছে নিতান্ত অসহায়। ঈশ্বর কঠিন-হৃদয় বা কোমল-চিত্ত নন। তিনি এমন কঠোর-চিত্ত যে জগৎকে অতিক্রম করে যান; আবার কোমল-হৃদয় যে জগতের মধ্যে অবস্থান করেন। আমাদের সন্তাপে কিংবা সংগ্রামে তিনি আমাদের পরিত্যাগ করেন না। অন্ধকারের মধ্যে তিনি আমাদের খুঁজে বেড়ান, তিনি আমাদের ব্যথার ব্যথী, আমাদের মারাত্মক অপচয়জনিত দুঃখে তিনি আমাদের সমদুঃখী।

সময় সময় আমাদের জানা দরকার যে প্রভু হলেন ন্যায়বিচারের ঈশ্বর। পৃথিবীর বুকে অন্যায় যখন সুপ্রোত্থিত দৈত্যদের মত দেখা দেয়, আমাদের জানা দরকার যে একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তখন তাদের ঘাসের মত কেটে ফেলেন, তারা কাটা সবুজ গুল্মের মত শুকিয়ে যায়। যখন অক্লান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও অত্যাচারের বন্যা রোধ করতে আমরা ব্যর্থ হই, তখন আমাদের জানা দরকার যে নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে একজন ঈশ্বর আছেন যাঁর অমিত শক্তি জঘন্য মানবীয় দুর্বলতার বিপরীতে যথার্থভাবে বিরাজ করছে। কিন্তু এমন সময়ও আছে যখন আমাদের জানা দরকার যে ঈশ্বর প্রেমময়, দয়াময়। যখন দুর্ভাগ্যের হিমশীতল হাওয়ার মধ্যে পড়ে আমরা কম্পিত হই, নৈরাশ্যের ঘূর্ণিঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি, আমাদের মূর্খতা এবং পাপ আমাদের ধ্বংসের রাজ্যে নিয়ে যায় এবং ঘরে ফেরার জন্য কাতর হয়ে আমরা হতাশায় ভুগি, তখন আমাদের জানা দরকার যে ঈশ্বর বলে এমন এক-জন কেউ আছেন যিনি আমাদের ভালবাসেন, আমাদের কথা ভাবেন; আমাদের বোঝেন এবং যিনি আমাদের আরেকটি সুযোগ দেবেন। যখন দিনে অন্ধকার নামে, রাতের ক্লান্তিতে আমরা নুইয়ে পড়ি, তখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তাঁর মধ্যে প্রেম ও ন্যায়ের যে সৃজনধর্মী সমন্বয় আছে তা জীবনের অন্ধকার রাজ্য থেকে আমাদের আশা ও সিদ্ধির আলোকিত পথে নিয়ে যায়।

সৎ প্রতিবেশী হওয়া প্রসঙ্গে

(অন্ বি' আ্যা গুড্ নেইবার)

আমি আপনাদের একজন সৎ মানুষের গল্প বলব। তাঁর আদর্শস্বরূপ জীবনের আলোর চমক মানুষের সুপ্ত বিবেককে চাগিয়ে তুলবে। তাঁর সদ্গুণ কোন মতবাদের প্রতি তাঁর নিষ্ক্রিয় দায়বদ্ধতার মধ্যে পাওয়া যাবে না, কিন্তু পাওয়া যাবে একটি জীবনকে রক্ষা করার কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে; পাওয়া যাবে না নৈতিক তীর্থযাত্রার অন্তিম লক্ষ্যে পৌঁছানোর মধ্যে, কিন্তু পাওয়া যাবে জীবনের প্রশস্ত রাজপথ ধরে প্রেমের আদর্শ বুকে নিয়ে তাঁর অভিযাত্রার মধ্যে। তিনি সজ্জন ছিলেন কেননা তিনি ছিলেন সৎ প্রতিবেশী।

এই মানুষটির নৈতিক নিষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছিল একটি অত্যুজ্জ্বল ছোট গল্পের মধ্যে। গল্পটির আরম্ভ হয়েছিল শাশ্বত জীবনের তাৎপর্যের উপর ধর্মীয় আলোচনা নিয়ে এবং শেষ হয়েছিল বিপদ সংকুল পথের উপর করুণার বাস্তব অভিব্যক্তির মধ্যে। ইহুদী আইনকানুনে সম্যক শিক্ষাপ্রাপ্ত জনৈক ব্যক্তি যীশুকে একটি প্রশ্ন করেন, 'প্রভু, শাশ্বত জীবন লাভ করতে হলে আমাকে কি করতে হবে?' চটজলদি সমুচিত প্রত্যুত্তর: 'আইনে কি লেখা আছে? তুমি কিভাবে পড়?' মুহূর্তকাল পরে আইনজ্ঞ স্পষ্ট আবৃত্তি করে গেল, 'সমগ্র অন্তর দিয়ে তুমি তোমার ঈশ্বরকে ভালবাসবে, ভালবাসবে তোমার সমগ্র আত্মা দিয়ে, শক্তি দিয়ে, মন দিয়ে, এবং তোমার নিজের ন্যায় তোমার প্রতিবেশীকে।' তখন যীশুর মুখ থেকে চূড়ান্ত কথাটি এল: 'ঠিক জবাবটিই দিয়েছ তুমি: এই কর এবং তুমি নিশ্চয় বাঁচবে।'

আইনজীবি বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করতে পারে, 'কেন একজন আইনজ্ঞ এমন প্রশ্ন করলেন যার উত্তর একজন আনাড়ি লোকও দিতে পারে?' নিজের সমর্থনে এবং যীশুর উত্তর যে চূড়ান্ত সেটা দেখাবার উদ্দেশ্যে আইনবিদ জিজ্ঞাসা করেন, 'তবে আমার প্রতিবেশীটি কে?' উকিল মশায় এবার বিতর্কের অবতারণা করেছিলেন যাতে কথাবার্তা নিগূঢ় ধর্মীয় আলোচনাতে পর্যবসিত হয়। যীশু অসার বিচার-বিশ্লেষণে জড়িয়ে পড়তে চাইলেন না, মাঝপথে প্রশ্নটিকে নিয়ে রাখলেন জেরুসালেম এবং জেরিকোর বিপদসংকুল বাঁকের উপর।

তিনি 'জনৈক ব্যক্তির' গল্প বললেন, যে ব্যক্তি জেরুসালেম থেকে জেরিকো যাওয়ার পথে ডাকাতদের খপ্পরে পড়েছিল, যারা তার সর্বস্ব লুটে নিল, তাকে প্রচণ্ড প্রহার করল এবং আধমরা করে ফেলে রেখে চলে গেল। দৈবক্রমে একজন পুরোহিত এসে পড়েছিলেন, কিন্তু তিনি অন্য ধার দিয়ে চলে গেলেন। পরে একজন ইহুদী পুরোহিতও পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। শেষে এলেন একজন স্যামারিয়াবাসী (স্যামারিটান), ভিন্ন জাতের ব্রাত্য মানুষ তাঁদের সঙ্গে ইহুদীদের

সামাজিক মেলামেশা নেই। আহত লোকটিকে দেখে তার দয়া হ'ল। তিনি তার প্রাথমিক শুশ্রূষা করলেন, তাকে বুকে তুলে নিলেন এবং একটি সরাইতে নিয়ে গিয়ে তার সেবাযত্ন করলেন।

আমার প্রতিবেশী কে? যীশু সার কথা বললেন, 'আমি তার নাম জানি না।' 'সে যেই হোক, তুমি তার প্রতিবেশী। সে যে-কোন একজন লোক যে জীবনের পথিপার্শ্বে পড়ে আছে। সে ইহুদী নয়, অ-ইহুদী নয়; সে রাশিয়ান নয়, আমেরিকান নয়; সে নিগ্রো বা শ্বেতাঙ্গ নয়। সে 'জনৈক ব্যক্তি' —জীবনের অসংখ্য জেরিকো পথের উপর পড়ে থাকা অভাবী মানুষ।' এ'ভাবে যীশু প্রতিবেশীর সংজ্ঞা দিয়েছেন, কোন ধর্মীয় সংজ্ঞা নয়, জীবনসম্পৃক্ত সংজ্ঞা।

সাধু স্যামারিটানের সদ্‌গুণের বৈশিষ্ট্য কি ছিল? তিনি চিরকাল প্রতিবেশীসুলভ গুণের প্রেরণাদায়ক আদর্শস্বরূপ হয়ে থাকবেন কি কারণে? আমার ত মনে হয় এই মানুষটির সদ্‌গুণকে এককথায় পরার্থবাদ বলা যায়। সাধু-স্যামারিটান ছিলেন একান্তভাবে পরার্থী। তাহ'লে পরার্থবাদ কি? আভিধানিক অর্থে পরার্থবাদ হ'ল 'অপরের স্বার্থের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আনুগত্য'। স্যামারিটান ছিলেন সৎ এবং সাধু, কেননা অপরের ভালমন্দের ভাবনাকে তিনি জীবনের প্রথম বিধান বলেই গ্রহণ করেছিলেন।

এক

স্যামারিটানের বিশ্বজনীন পরার্থবোধকে আত্মস্থ করার ক্ষমতা ছিল। যা-কিছু গোষ্ঠী, ধর্ম এবং জাতীয়তার চিরন্তন আকস্মিকতার অতীত সে বিষয়ে ছিল তাঁর প্রখর অন্তর্দৃষ্টি। ইতিহাসের সুদীর্ঘ গতিপথে মানুষের একটি বড় রকমের বিয়োগান্ত ব্যাপার হ'ল প্রতিবেশীসুলভ ভাবনাচিন্তা গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, শ্রেণী বা জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাটা। ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম যুগের ঈশ্বর ছিলেন গোষ্ঠী বিশেষের ঈশ্বর এবং নীতিবোধও ছিল গোষ্ঠীকেন্দ্রিক। 'তুমি কাউকেও হত্যা করবে না' মানে 'তুমি তোমার জাতভাই ইজরাইলীকে হত্যা করবে না, কিন্তু দোহাই ঈশ্বর, ফিলিস্তিনকে মারো।' গ্রীক গণতন্ত্র এক ধরনের অভিজাততন্ত্রকে বুকে তুলে নিল বটে, কিন্তু যে অসংখ্য গ্রীক দাসেরা নগর রাষ্ট্র তৈরি করেছিল তাদের নয়। ডিক্লারেশন অফ্ ইন্ডিপেনডেনসের কেন্দ্রবিন্দুতে যে সর্বজনীনতা আছে, আমেরিকার 'সকল'-এর জায়গায় 'কয়েকজন' শব্দটি বসিয়ে দেওয়ার এই প্রবণতা সেটিকে নির্লজ্জভাবে নস্যাৎ করে দিয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণের বহুলোক বিশ্বাস করে 'সকল মানুষ সমানরূপে সৃষ্ট হয়েছে'—এর অর্থ 'সকল শ্বেতাঙ্গ মানুষ সমানরূপে সৃষ্ট হয়েছে'। একচোটিয়া পুঁজিবাদের প্রতি আমাদের অবিচল অনুরক্তির ফলে যে-সব শ্রমজীবি মানুষের শ্রমে এবং দক্ষতায় শিল্প চালু থাকে তাদের চেয়ে শিল্পপতিদের সামাজিক নিরাপত্তা নিয়ে আমরা বেশি চিন্তাভাবনা করি।

এই গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সংকীর্ণ মনোভাবের বিপর্যয়কর পরিণাম কি ? এর মানে কোন কেউ তার গোষ্ঠীগত গণ্ডীর বাইরে কি ঘটছে না ঘটছে তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। একজন আমেরিকান যদি কেবল নিজের জাতির স্বার্থের কথাই ভাবে, সে এশিয়া, আফ্রিকা বা ল্যাটিন আমেরিকার মানুষদের ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না। জাতিসমূহ যে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা বিনা যুদ্ধের মত্ততায় মেতে ওঠে এটাই কি তার কারণ নয় ? এই কারণেই কি তোমার নিজের দেশের একজন নাগরিককে হত্যা করলে সেটা হবে খুন, কিন্তু যুদ্ধে অন্য দেশের নাগরিকদের হত্যা করলে সেটা হবে বীরত্ব? যদি শিল্প মালিকেরা শুধু নিজেদের কথাই ভাবে, তারা অপর পার্শ্ব দিয়ে চলে যাবে যখন হাজার হাজার শিল্পশ্রমিকের কাজ কেড়ে নেওয়া হয় এবং শিল্পে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র স্থাপনার ফলে কর্মচ্যুত হয়ে তারা কোন এক জেরিকো রাস্তার উপর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। অপিচ এসব শিল্পপতি উন্নততর ধন-বণ্টন এবং শ্রমজীবি মানুষদের জীবনের মান উন্নয়নের প্রতি প্রচেষ্টাকে সমাজতান্ত্রিক বলে ধরে নেবে। যদি একজন শ্বেতাঙ্গ কেবলমাত্র তার স্বজাতিকে নিয়েই ভাবনাচিন্তা করে, তবে সে একজন নিগ্রোকে উপেক্ষা ভরে পাশ কাটিয়ে যাবে, যে নিগ্রোর মনুষ্যত্বকে হরণ করা হয়েছে, আত্মসম্মানবোধ নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যে পথের পাশে পড়ে মরছে।

কয়েক বছর আগে একটি বাস্কেটবল টিমের বহু নিগ্রো সদস্য গাড়ী করে যাওয়ার সময় দক্ষিণাঞ্চলের রাস্তায় দুর্ঘটনায় পড়ে। তাদের মধ্যে তিনজন গুরুতর ভাবে আহত হয়। তাড়াতাড়ি একটি অ্যাম্বুলেন্স্ ডাকা হয়। কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স ঘটনাস্থলে এলে পর শ্বেতাঙ্গ ড্রাইভার কোন কৈফিয়ৎ না দিয়ে বলল—কোন নিগ্রোর সেবা করা তার নীতি নয়। এই বলে সে অ্যাম্বুলেন্স্ নিয়ে চলে গেল। সেই সময় আরেকটি গাড়ী যাচ্ছিল। সেই গাড়ীর ড্রাইভার আহত ছেলেদের নিকটবর্তী হাস-পাতালে নিয়ে গেল। কিন্তু কর্তব্যরত ডাক্তার চটেমটে বলল, 'আমরা নিগ্রোদের হাসপাতালে নিই না।' শেষপর্যন্ত আহত ছেলেদের যখন ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ৫০ মাইল দূরে 'কালোদের' হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল, একজন তখন মৃত, অন্য দু'জনের যথাক্রমে ৩০ এবং ৫০ মিনিট পরে মৃত্যু হ'ল। সম্ভবত সময় মত চিকিৎসা হ'লে তিন জনই বেঁচে যেত। এটি হাজার হাজার অমানবিক ঘটনার একটি মাত্র যা প্রতিদিনই ঘটছে। গোষ্ঠীভিত্তিক, জাতিভিত্তিক কুলকৌলিন্য-ভিত্তিক বর্বরতার যে পরিণাম তার অবিশ্বাস্য প্রকাশ।

এধরনের সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার আসল ট্র্যাজেডি হ'ল আমরা মানুষকে দেখি নিছক সত্তাবিশিষ্ট জীব বা বস্তুবিশেষ হিসাবে। আমরা কদাচিৎ মানুষকে তাদের সত্যিকার মানবিকতার মধ্যে দেখি। আমরা মানুষকে দেখি ইহুদী বা জেন্টিল, ক্যাথলিক বা প্রোটেস্ট্যান্ট, চীনা বা আমেরিকান, নিগ্রো বা শ্বেতাঙ্গ হিসাবে। তাদের আমরা স্বজাতীয় মনুষ্য বলে ভাবতে পারি না—যারা আমাদের মত একই মৌল বস্তুতে সৃষ্ট, ঐশ্বর ছাঁচে গড়া। খ্রীষ্টীয় এবং ইহুদী যাজকেরা একটি

রক্তাক্ত শরীরকে দেখেছিল, নিজেদের মত একজন মানুষকে নয়। কিন্তু সাধু স্যামারিটান আমাদের সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেন যে আমরা যেন আমাদের আত্মিক চক্ষু থেকে প্রাদেশিকতারূপ সংকীর্ণ ছানি সরিয়ে দিয়ে মানুষকে মানুষের মত দেখি। স্যামারিটান যদি আহত লোকটিকে ইহুদী হিসাবে দেখতেন, তবে তিনি দাঁড়াতেন না, কেননা ইহুদী এবং স্যামারিটানদের মধ্যে কোনরূপ মেলামেশা ছিল না। তিনি তাকে প্রথমে মানুষ হিসাবে দেখেছিলেন, সে যে ইহুদী ছিল তা একটি নিছক আকস্মিকতা মাত্র। সৎ প্রতিবেশীর দৃষ্টি বাহ্যিক আকস্মিকতাকে ছাড়িয়ে যায় এবং তিনি সেসব আন্তর গুণাবলীর বিচার করেন যা মানুষকে মানুষ করে তোলে এবং সেজন্য মানুষ মাত্রই হয়ে পড়ে ভাই।

দুই

স্যামারিটান বলতে গেলে বিপজ্জনক পরার্থিতার ক্ষমতা রাখতেন এবং একজন ভাইকে বাঁচানোর জন্য তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করেছিলেন। খ্রীষ্টান পুরোহিত এবং ইহুদী যাজক আহত লোকটিকে সাহায্য করার জন্য দাঁড়ালেন না কেন এ'কথা যখন ভাবি তখন অসংখ্য ভাবনা মনের মধ্যে ভিড় করে আসে। হয়ত তাঁরা যাজক-সংক্রান্ত কোন সভায় হাজির হতে দেরী করতে চাইছিলেন না। হয়ত তাঁরা ধর্মীয় বিধি অনুসারে মন্দিরের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে কয়েক ঘণ্টা কোন মনুষ্যদেহ স্পর্শ করতে পারতেন না। অথবা এমনও হতে পারে যে তাঁরা যেরিকো সড়ক উন্নয়ন সমিতির সাংগঠনিক সভায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। এটির সত্যি-কারের প্রয়োজন ছিল নিশ্চয়, কারণ যেরিকো সড়কের উপর আহত লোককে সাহায্য করাটাই যথেষ্ট নয়; ডাকাতি করা সম্ভবপর হয় যে পরিস্থিতিতে তার পরিবর্তন সাধনেরও গুরুত্ব আছে। লোকহিতৈষণা প্রশংসার্হ সন্দেহ নেই, কিন্তু যে অবস্থার মধ্যে অর্থনৈতিক অন্যায়ের উদ্ভব হয়, যার প্রতিকারের জন্য লোক-হিতৈষণা, লোকহিতৈষণায় ব্রতী ব্যক্তির সে অবস্থাকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। হতে পারে, খ্রীষ্টান পুরোহিত এবং ইহুদী যাজক বিশ্বাস করতেন যে একজন ব্যক্তির ব্যাপারে আটকে পড়ার চাইতে উৎসমুখেই অন্যায়ের প্রতিবিধান করা অধিকতর যুক্তিসংগত।

সম্ভবত এ'সব কারণেই তাঁরা দাঁড়াননি। তবুও আরেকটি সম্ভাবনাও আছে যেটি প্রায়ই ধরা হয় না। তাহ'ল তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন। যেরিকো রোড্ ছিল বিপদসংকুল। মিসেস কিং এবং আমি যখন হোলি ল্যান্ড্ ভ্রমণে গিয়েছিলাম, তখন আমরা একটি গাড়ী ভাড়া করে জেরুসালেম থেকে যেরিকো যাই। আমরা যখন আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে ধীরগতিতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তখন আমি আমার স্ত্রীকে বলি, 'এখন আমি বুঝতে পাচ্ছি যীশু কেন এই রাস্তাটিকে তাঁর নীতিমূলক কাহিনীর পটভূমি হিসাবে পছন্দ করেছিলেন।' জেরুসালেম সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দু'হাজার ফুট উঁচে এবং যেরিকো এক হাজার ফুট নীচে। এই নীচের দিকে নেমে

আসা পথটি কুড়ি মাইলের কিছু কম। এই পথে আচম্বিতে এমন অনেক বাঁক এসে পড়ে যেগুলি পথচারীদের উপর অতর্কিত আক্রমণের পক্ষে চমৎকার স্থান এবং তাদের অভাবনীয় আক্রমণের মুখে ফেলে দেয়। বহুকাল পূর্বে এই রাস্তাটি 'রক্তাক্ত সড়ক' নামে কুখ্যাত ছিল। অতএব এটি সম্ভব যে খ্রীস্টান পুরোহিত এবং ইহুদী যাজকের ভয় ছিল যে তাঁরা থামলেই তাঁদের উপর মারধর চলবে। সম্ভবত ডাকাতেরা কাছাকাছি কোথাও ছিল। অথবা এও হতে পারে যে আহত লোকটি ভান করেছিল এবং তার মতলব ছিল পথ-চলা লোকদের তার কাছে নিয়ে আসা যাতে তাদের অতি দ্রুত এবং অতি সহজে ধরে ফেলতে পারে। আমি কল্পনা করছি যে পুরোহিত এবং যাজকের মনে প্রথমে প্রশ্ন জেগেছিল— 'আমি যদি এই লোকটিকে সাহায্য করার জন্য থামি, তখন আমার কি দশা হবে?' কিন্তু সাধু স্যামারিটানের ভাবনার প্রকৃতি এমন ছিল যে তাঁর প্রশ্নটি ছিল উল্টো রকমের—'আমি যদি লোকটাকে সাহায্য করতে না থামি, তবে লোকটার কি গতি হবে?" সাধু স্যামারিটান বিপজ্জনক পরার্থতার পথ বেছে নিয়েছিলেন।

আমরা অনেক সময় প্রশ্ন করি, 'আমার চাকরির, আমার সম্মানের, আমার পদমর্যাদার কি হবে যদি আমি বিতর্কিত বিষয়ে জড়িয়ে পড়ি? তাতে কি আমার বাড়ীতে বোমা পড়বে, আমার জীবন সংশয় দেখা দেবে অথবা আমার কারাদণ্ড হবে?' সহৃদয় মানুষ প্রশ্নটিকে উল্টে নেবে। অ্যালবার্ট্ সোয়াইট্জার এই প্রশ্ন তোলেন নি, "আমি যদি আফ্রিকার জনগণের কল্যাণে কাজ করি, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক হিসাবে আমার সম্মান বা নিরাপত্তার কি পরিমাণে হানি হবে বা ব্যাচ্ অর্গানিস্ট্ হিসাবে আমার পদমর্যাদার কি হবে?" বরং তাঁর প্রশ্ন ছিল, 'আমি যদি তাদের কাছে না যাই, তবে অন্যায়ের আঘাতে জর্জরিত এই লক্ষ লক্ষ মানুষদের কি দশা হবে?' আব্রাহাম লিঙ্কন এই প্রশ্ন তোলেননি, "আমি যদি 'মুক্তির সনদ' প্রকাশ করি এবং দাসত্ব প্রথার বিলোপ ঘটাই, তা হ'লে আমার কি হবে?" কিন্তু তাঁর প্রশ্ন ছিল, "যদি আমি তা করতে ব্যর্থ হই, তবে যুক্তরাষ্ট্র এবং অগণিত নিগ্রো জনগণের কি হবে?" নিগ্রো পেশাজীবি ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন না, "আমি যদি জাতিপৃথকীকরণ ব্যবস্থার অবসানের জন্য আন্দোলনে যোগ দিই, তা হ'লে আমার সাংসারিক অবস্থা, মধ্যবিত্ত পদমর্যাদা বা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কি হাল হবে?" কিন্তু তাঁর প্রশ্ন, 'আমি যদি সক্রিয়ভাবে, সাহসের সঙ্গে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ না করি, তবে ন্যায়বিচারের ব্যাপারে এবং যে নিগ্রো জনগণ কোনদিন অর্থনৈতিক নিরাপত্তা কি জিনিস জানে না তাদের কি হবে?' একজন মানুষের প্রকৃত মূল্যায়ণ হয় আরাম এবং সুখ-সুবিধার মুহূর্তে তার মনোভাব এবং আচরণ দিয়ে নয়, চ্যালেঞ্জ এবং বিতর্কের সময় তার মনোভাব এবং আচরণ দিয়ে। প্রকৃত প্রতিবেশী অপরের কল্যাণে তার সম্মান, পদমর্যাদা, এমন কি জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করে। জীবনের

বিপদসংকুল উপত্যকায় এবং সমস্যা কণ্টকিত পথে সে তার প্রহৃত এবং আহত ভাইকে উচ্চতর এবং মহত্তর জীবনে উন্নীত করবে।

তিন

স্যামারিটানের ছিল প্রগাঢ় পরার্থিতা। নিজের হাতে তিনি লোকটির ক্ষতস্থান বেঁধে দিয়েছিলেন এবং তাকে বুকে তুলে নিয়েছিলেন। নিজের কেতাদুরস্ত পোষাক রক্তরাঙ্গা না করে বরং কিছু পয়সা খরচ করে লোকটিকে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াটা অনেক সহজ ব্যাপার হত।

যথার্থ পরার্থিতা দয়া প্রকাশের ক্ষমতার চেয়ে বড় জিনিস ; এটি হচ্ছে সমবেদনার ক্ষমতা। নৈর্ব্যক্তিক ভাবনায় চালিত হয়ে ডাকে একটি চেক্ পাঠানোর চাইতে দয়া বেশি কিছু, কিন্তু সত্যিকারের সমবেদনা ব্যক্তিগত ভাবনার দ্যোতক যা চায় আত্মনিবেদন। দয়া উৎসারিত হতে পারে সেই সূক্ষ্ম চেতনা থেকে যাকে বলা হয় মনুষ্যত্ব, কিন্তু সমবেদনার উদ্রেক হয় জীবনপথের এক-ধারে পড়ে থাকা দুর্দশাগ্রস্ত বিশেষ মানুষটির প্রতি দুঃখবোধ থেকে। সমবেদনা হ'ল স্বাজাত্য-প্রীতি সেই মানুষের প্রতি যে অভাবগ্রস্ত, দুঃখ-বেদনার ভারে পর্যুদস্ত। আমাদের ধর্মপ্রচারের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি তা প্রতিষ্ঠিত হয় শুধুমাত্র দয়ার উপর, সত্যিকারের করুণার উপর নয়। এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কোন কিছু করার পরিবর্তে আমরা শুধু তাদের জন্য কিছু করতে চেয়েছি। সহানুভূতিশূন্য দয়ার প্রকাশ এক ধরনের পিতৃসুলভ অভিভাবকত্বের দিকে নিয়ে যায় যেটি কোন আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মানুষ গ্রহণ করতে পারে না। জীবনের যেকোন সড়কের উপর পড়ে থাকা ঈশ্বরের আহত সন্তানদের উপকার করার ক্ষমতা ডলারের মধ্যে আছে। কিন্তু সেই ডলার যদি করুণার হস্ত থেকে বিতরিত না হয়, তবে তা দাতা বা গ্রহীতা কাউকেও সমৃদ্ধ করতে পারে না। ধর্মপ্রচারের জন্য গীর্জার লোকেদের হাত দিয়ে অজস্র ডলার আফ্রিকায় গেছে, কিন্তু সেই লোকেরা তাদের ধর্মীয় সমাবেশে একজন মাত্র আফ্রিকানকে উপাসনা করার অধিকার দানের আগে অসংখ্য বার মৃত্যুবরণ করবে। শান্তিবাহিনীর উদ্দেশ্যে দেওয়া কোটি কোটি ডলার আফ্রিকায় বিনিয়োগ করা হয় কিছু লোকের ভোটের জোরে, যারা আবার তাদের কূটনৈতিক সংঘে আফ্রিকার রাষ্ট্রদূতদের প্রবেশের বা তাদের পাড়ায় বসবাসের সুযোগ না দেওয়ার জন্য নিরলসভাবে লড়ে যায়। শান্তিবাহিনী ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত জাতি-সমূহের 'জন্য' কিছু করে ; এটি সফল হবে যদি তাদের সঙ্গে এক হয়ে সৃজনধর্মী কিছু করার চেষ্টা করে। কম্যুনিজমকে হারানোর নেতিবাচক ভঙ্গি হিসাবে এটি ব্যর্থ হবে ; এটি সফল হবে পৃথিবী থেকে দারিদ্র্য, অজ্ঞতা এবং ব্যাধির বিলুপ্তি ঘটানোর ইতিবাচক প্রচেষ্টা হিসাবে। প্রেম না থাকলে অর্থ হবে স্বাদ-বিহীন লবণের মত, মানুষের পদদলিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন সার্থকতা এর

নেই। প্রকৃত প্রতিবেশিত্বের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাব-ভাবনা থাকা চাই। স্যামারিটান দস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত লোকটির ক্ষতস্থান নিজের হাতে বেঁধে দিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রেমধারা উৎসারিত হয়েছিল লোকটির ভগ্ন সত্তার ক্ষত বন্ধনে।

স্যামারিটানের মাত্রাতিরিক্ত পরার্থিতার আর এক প্রকাশ ঘটেছিল কর্তব্যের আহ্বানকে অতিক্রম করে যাওয়ার অভীপ্সার মধ্যে। লোকটির ক্ষতস্থানের শুশ্রূষার পর তিনি তাকে বুকে তুলে নিয়ে গেলেন একটি সরাইয়ে এবং সরাইওয়ালার জিম্মায় কিছু অর্থ দিলেন এবং এও বললেন আরও অর্থের প্রয়োজন হলে তিনি আনন্দের সঙ্গে তাও দেবেন। 'তুমি যে পরিমাণ অধিক ব্যয় করবে, আমি যখন ফিরে আসবো, তা তোমাকে শোধ করে দেব।' এতদূর না করলেও একজন অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি কর্তব্য পালনের যে সম্ভাব্য নিয়ম আছে তার চাইতেও বেশি করা হয়ে যেত। এ'ব্যাপারে তিনি অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর প্রেমে পূর্ণতা ছিল।

নৈতিক বা সামাজিক বাধ্যবাধকতার কোনটি আইনমাফিক পালনীয় কোনটি নয়—অতি প্রাঞ্জলভাবে এই দুটির পার্থক্য নির্দেশ করেছেন ডঃ হ্যারী এমারসন ফস্‌ডিক। প্রথমটি নিয়ন্ত্রিত হয় সামাজিক নিয়মকানুনে এবং আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা ; এই বাধ্যবাধকতা এবং তৎসংক্রান্ত আইন এবং নিয়মাবলী আইন বইয়ের হাজার হাজার পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে এবং এ'সব আইন ভংগের জন্য অসংখ্য কয়েদখানা আইন ভংগকারীদের দ্বারা ভর্তি হয়ে আছে। কিন্তু যে-সব বাধ্যবাধকতা পালনে আইনের জোর খাটে না, সেগুলি সমাজের আইনের এক্তিয়ারের বাইরে। এ'সব হচ্ছে আন্তর অনুভাবনা, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির আসল সম্পর্ক এবং করুণার প্রকাশ যা আইনগ্রন্থ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এবং কারাগার শোধন করতে পারে না। এই সমস্ত সামাজিক বাধ্যবাধকতা বা কর্তব্য যথাযথভাবে পালিত হয় একটি আন্তর বিবর্তনের প্রতি দায়বদ্ধতার মাধ্যমে যা মানুষের হৃদয়ে লিখিত থাকে। মানুষের তৈরী বিধি-বিধানগুলি ন্যায়বিচারের আশ্বাস দিতে পারে বটে, কিন্তু উচ্চমার্গের বিধান থেকে প্রেমের সৃষ্টি হয়। কোন আচরণবিধি একজন পিতাকে তাঁর সন্তানদের ভালবাসতে বা স্বামীকে স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ দেখাতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। আদালত পরিবারের খোরপোষের ব্যবস্থা করার জন্য বাধ্য করতে পারে, কিন্তু প্রেমের খোরাক যোগাতে বাধ্য করতে পারে না। একজন সৎ, নিষ্ঠাবান পিতা আইনের দ্বারা যা বহাল করা যায় না তার প্রতি অনুরক্ত থাকেন। সাধু স্যামারিটান মানবজাতির বিবেকের প্রতিনিধিত্ব করেন, কেননা যা সাধারণ আইনের আওতায় আসে না তার প্রতি তিনি আজ্ঞাবহ ছিলেন। কোন আইন এমন অবিমিশ্র করুণা, বিশুদ্ধ প্রেম, সার্বিক পরার্থিতা সৃষ্টি করতে পারে না।

আজকের দিনে আমাদের দেশে একটি বড় রকমের সংগ্রাম চলছে। এই সংগ্রাম সেই অশুভ শক্তিকে জয় করতে—যার আরেক নাম জাতিপৃথকীকরণ ও তার

অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ জাতিবৈষম্য, একটি দৈত্য যেটি প্রায় একশ' বছর ধরে এ'দেশে বীরদর্পে অবাধে বিচরণ করেছে, নিগ্রো জনগণের আত্মসম্মানবোধ নষ্ট করেছে এবং তাদের স্বাধীনতার জন্মগত অধিকার কেড়ে নিয়েছে।

সমস্যা সমাধানে আইন প্রণয়ন এবং আদালতের রায়ের ভূমিকা লঘু করে দেখার প্রলোভন থেকে যেন আমরা মুক্ত থাকি। নৈতিকতার উপর কোন আইন প্রণয়ন চলে না, কিন্তু মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। আইন মালিক তথা নিয়োগকর্তাকে বাধ্য করতে পারে না তার কর্মচারীকে ভালবাসতে। কিন্তু আইন আমার গাত্রবর্ণের জন্য আমাকে কাজে নিয়োগ করতে অস্বীকার করার ব্যাপারে তাকে ঠেকাতে পারে। আইন প্রণয়ন, বিচার-সম্পর্কিত রায় এবং প্রশাসনিক আদেশের দ্বারা মানুষের হৃদয়ের না হলেও প্রতিনিয়ত মানুষের অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে। যাঁরা বলে থাকেন আইনের দ্বারা পৃথকীকরণের অবসান হতে পারে না, আমরা তাঁদের দ্বারা বিপথে চালিত হব না।

কিন্তু এটা স্বীকার করে নিয়ে আমাদের এও অবশ্যই মানতেই হবে যে জাতিগত সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান রয়েছে আইন জোর করে চাপানো বা মানানোর মধ্যে নয়, তা মেনে চলতে সম্মত হওয়ার মধ্যে। পৃথকীকরণের অবসান ঘটানোর ক্ষেত্রে আদালতের রায় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলির মূল্য অপরিসীম, কিন্তু পৃথকীকরণের অবলুপ্তি আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছানর আংশিক, যদিও প্রয়োজনীয়, পদক্ষেপ মাত্র যে লক্ষ্য সত্যিকারের শ্রেণীগত এবং ব্যক্তিগত মিলনের মধ্যে নিহিত আছে। পৃথকীকরণের অবলোপ আইনগত বাধার প্রাচীর ভেংগে দেবে এবং মানুষদের শারীরিকভাবে পরস্পরের কাছে নিয়ে আসবে; তদতিরিক্ত কিছু আছে যা মানুষের হৃদয় এবং আত্মাকে স্পর্শ করে, যার ফলে তারা আত্মিক দিক দিয়ে পরস্পরের নৈকট্য লাভ করবে, কেননা এমনটিই হবে স্বাভাবিক এবং ন্যায়সঙ্গত। নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত আইনের জোরদার প্রয়োগ পৃথকীকৃত সাধারণ সুযোগ-সুবিধাগুলির অবসান ঘটাবে—যেগুলি অ-পৃথকীকৃত সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে বাধাস্বরূপ। কিন্তু এতে ভয়, কুসংস্কার, দম্ভ এবং যুক্তিহীনতার অবলুপ্তি ঘটবে না— যেগুলি একটি অখণ্ড সমাজ সৃষ্টির পথে বাধা হয়ে আছে। এ'সমস্ত অশুভ এবং আসুরিক প্রতিক্রিয়া তখনই অন্তর্হিত হবে যখন মানুষ একটি অদৃশ্য আন্তর বিধির দ্বারা প্রভাবিত হবে, যা তাদের অন্তরে এই প্রতীতি জাগিয়ে তুলবে যে সব মানুষ ভাই এবং ব্যক্তিক এবং সামাজিক রূপান্তরের ব্যাপারে প্রেম হচ্ছে মানব জাতির সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। সত্যিকারের অখণ্ডতা অর্জিত হবে সাচ্চা প্রতিবেশীদের দ্বারা—যারা বাইরে থেকে চাপানো যায় না এমন বাধ্যবাধকতা মেনে নেয়।

আমার বন্ধুগণ, আজকের দিনে সকল জনগোষ্ঠীর মানুষ পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি করে প্রতিবেশীসুলভ মনোভাব গ্রহণের আহ্বানের মুখোমুখি হয়েছে। বিশ্বব্যাপী সৎ প্রতিবেশীত্ব নীতির আহ্বান নিছক তাৎক্ষণিক বাগাড়ম্বর

নয় : এটি একটি বিশেষ জীবনযাপন প্রণালীর প্রতি আহ্বান যা আসন্ন মহাজাগতিক শোক সংগীতকে রূপান্তরিত করবে সৃজনধর্মী পরিতৃপ্ত মনের প্রার্থনা সংগীতে। পথের অন্য পাশ দিয়ে মুখ ফিরিয়ে চলে যাওয়ার মূঢ় বিলাসিতাকে আমরা প্রশ্রয় দিতে পারি না। ঐ ধরনের নির্বুদ্ধিতাকে আগে বলা হ'ত নৈতিক ব্যর্থতা : আজকের দিনে এটি সার্বিক আত্মহত্যার পথে নিয়ে যাবে। যে পৃথিবী ভৌগোলিকভাবে এক হয়ে গেছে, সেখানে আত্মিক দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা বাঁচতে পারি না। অন্তিম বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, জীবনের যেরিকো সড়কের উপর শায়িত আহত মানুষটিকে আমি মোটেই অবহেলা করব না, কেননা সে আমার অংশ, আমিও তার অংশ। তার বেদনা আমাকে ছোট করে দেয় এবং তার মুক্তি আমাকে করে বড়।

প্রতিবেশীসুলভ প্রেমের বাস্তবায়নের উপায় সন্ধান করতে গিয়ে সাধু স্যামারিটানের প্রেরণাদায়ক দৃষ্টান্ত ছাড়াও আমাদের চালিত করার জন্য আছে আমাদের যীশুর মহৎ জীবন। তাঁর পরার্থিতা ছিল বিশ্বজনীন, কেননা তিনি সকল মানুষকেই ভাই বলে মনে করতেন, এমনকি শুঁড়ি এবং পাপীদেরও। তাঁর পরার্থিতা বিপজ্জনক, কারণ সত্যের খাতিরে তিনি বিপদসংকুল পথে চলেছেন। তাঁর পরার্থিতা ছিল আত্যন্তিক, কারণ তিনি ক্যালভারিতে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ বেছে নিয়েছিলেন। এটি হচ্ছে যে গূঢ় বিধিনিয়ম বাইরের থেকে জোর-করে চাপানো বা মানানো যায় না—ইতিহাসে তার প্রতি আজ্ঞানুবর্তিতার উজ্জ্বলতম প্রকাশ।

ক্রিয়াশীল প্রেম

(লাভ্ ইন্ অ্যাক্শন্)

নিউ টেস্টামেন্টে এমন সব কথা কমই আছে যা 'পিতা, তাদের ক্ষমা কর, কারণ তারা জানে না তারা কি করছে' —এই মহত্তম উক্তির চাইতে যীশুর আত্মার মহনীয়তাকে অধিকতর স্পষ্ট এবং গভীরভাবে প্রকাশ করে। এ হচ্ছে প্রেমের পরাকাষ্ঠা।

যীশুর প্রার্থনার সঠিক অর্থ আমাদের বোধগম্য হবে না, যদি না আমরা লক্ষ্য করি যে প্রার্থনা শুরু হয়েছে 'তখন' শব্দটি দিয়ে। ঠিক আগের কবিতার স্তবকটি এ'রকম : "এবং তাছাড়া যখন সেই স্থানে আসিল, যাহাকে বলা হয় ক্যাল্ভারি, সেখানে তাহারা তাঁহাকে ক্রুশবিদ্ধ করিল এবং করিল দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের—একজনকে ডান দিকে, অন্যজনকে বাম দিকে"। তখন যীশু বলে উঠলেন—পিতা, তাদের ক্ষমা কর। তখন—যখন তিনি অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছেন। তখন—যখন মানুষ নিম্নতম পর্যায়ে নেমে এসেছে। তখন—যখন তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছিলেন, সবচেয়ে কলঙ্ককর মৃত্যু। তখন—যখন সৃষ্ট জীবের দুষ্ট হস্ত স্রষ্টার একমাত্র উৎপাদিত সন্তানকে ক্রুশবিদ্ধ করছিল। তখন যীশু বলেছিলেন—"পিতা, তাদের ক্ষমা কর।" সেই 'তখন' অন্য রকমও হতে পারত। তিনি বলতে পারতেন, "পিতা, তাদের সমুচিত বিচার কর", অথবা "পিতা, তোমার ন্যায্য ক্রোধনিঃসৃত ভয়ঙ্কর বজ্রাঘাতে তাদের ধ্বংস কর।" কিন্তু এ'ধরনের প্রতিক্রিয়া তাঁর মধ্যে দেখা দেয় নি। অসহনীয়, অবর্ণনীয় দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণায় অতিমাত্রায় কাতর, ধিক্কৃত ও পরিত্যক্ত হয়েও তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন, "পিতা, তাদের ক্ষমা কর।"

গ্রন্থের মূল পাঠ থেকে আহৃত দুটি মৌল শিক্ষার বিষয় বলি।

এক

প্রথমটি হচ্ছে কাজকে কথার অনুসারী করে তোলার যীশুর অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা। জীবনের অন্যতম ট্র্যাজেডি হ'ল মানুষ প্রচার এবং আচরণের, কথা ও কাজের মধ্যেকার ফারাক ঘোচাতে পারে না। একটি অনড় ব্যাধিগ্রস্ত মানবিকতা আমাদের সাংঘাতিকভাবে বিভাজিত করে রাখে। একদিকে আমরা গর্বের সঙ্গে গালভরা নীতিকথা প্রচার করে থাকি, অন্যদিকে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে ওইসব নীতির বিপরীত আচরণ করি। কত সময় না আমাদের জীবন মতবাদের ক্ষেত্রে উচ্চ রক্ত-চাপ এবং কর্মের ক্ষেত্রে রক্তাল্পতায় চিহ্নিত হয়ে থাকে। আমরা উচ্চকণ্ঠে খ্রিস্টান ধর্মের নীতিমালার প্রতি দায়বদ্ধতা ঘোষণা করি, অথচ বাস্তবক্ষেত্রে প্রকৃতি উপাসক বা পৌত্তলিকের মত আচরণ করি। আমরা বড় গলায় গণতন্ত্রের প্রতি

অনুরাগ প্রকাশ করি, কিন্তু গণতান্ত্রিক মতাদর্শের বিরোধী কাজ করে থাকি। কত আন্তরিকতার সঙ্গেই না শান্তির কথা বলি, এবং সেই সঙ্গে অক্লান্তভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকি। কতই না ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে ন্যায়ের পথে চলার সপক্ষে যুক্তি দেখাই, অথচ নির্দ্বিধায় অন্যায়ের পথে চলি। এই অদ্ভুত বিভাজন—'যা হওয়া উচিত' এবং 'যা হয়'—এই দুয়ের মধ্যেকার বেদনাদায়ক ব্যবধান হচ্ছে মানুষের জাগতিক তীর্থযাত্রার বিয়োগান্তক বিষয়।

যীশুর জীবনে এই ব্যবধান ঘুচে গেছে—এটিই আমরা দেখতে পাই। বাক্য এবং কর্মের মধ্যে সুসংগতির এমন একটি মহৎ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর কখনো দেখা যায় নি। গ্যালিলির সূর্যকরোজ্জ্বল গ্রামগুলিতে ধর্মোপদেশ বিতরণের দিনে যীশু ঐকান্তিকতার সঙ্গে ক্ষমাধর্মের কথা বলেছেন। এই আশ্চর্য নীতিধর্ম পিটারের মনে প্রশ্ন জাগিয়েছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার ভাই কতবার আমার বিরুদ্ধে পাপকার্য করলে আমি তাকে ক্ষমা করব? সাতবার পর্যন্ত?" পিটার আইন এবং পরিসংখ্যান নিয়ে থাকতে চাইলেন। কিন্তু যীশু জোর দিয়ে বললেন ক্ষমার কোন সীমা নেই। "আমি তোমাদের বলছি না সাতবার পর্যন্ত : কিন্তু সত্তরগুণ সাতবার পর্যন্ত।" অন্য কথায়, ক্ষমা সংখ্যার ব্যাপার নয়, গুণের ব্যাপার। ক্ষমা মানুষের সত্তার প্রকৃতিগত অবয়বের অংশবিশেষ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত মানুষ কখনো চারশ' নব্বইবার ক্ষমা করতে পারে না। ক্ষমা কোন একটি সাময়িক কর্ম নয়; এটি একটি স্থিতিশীল মানসপ্রবণতা।

যীশু তাঁর অনুগামীদের বিশেষভাবে এই উপদেশ দিয়েছিলেন যে তারা যেন তাদের শত্রুদের ভালবাসে এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ব্যক্তিদের জন্য প্রার্থনা করে। তাঁর শ্রোতাদের অনেকের কানে এই শিক্ষা দূরাগত সঙ্গীতের মত বেজেছিল। তাদের কান এ'রকম অদ্ভুত প্রেমের গুঞ্জনে অভ্যস্ত ছিল না। তারা মিত্রদের ভালবাসার এবং শত্রুদের হিংসা করার শিক্ষাই চিরকাল পেয়ে এসেছে। জীবনে প্রতিশোধ গ্রহণের চিরাচরিত ঐতিহ্যে তারা লালিত হয়েছে। তথাপি যীশু তাদের এই শিক্ষা দিলেন যে শত্রুর প্রতি কেবলমাত্র সৃজনধর্মী প্রেমের দ্বারাই তারা রূপমপিতা ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার যোগ্যতা লাভ করবে এবং আত্মিক পূর্ণতা লাভের নিমিত্ত প্রেম এবং ক্ষমা একান্তভাবে অপরিহার্য।

চরম পরীক্ষার মুহূর্ত এসে পড়ে। ঈশ্বরের নির্দোষ পুত্র উত্তোলিত ক্রুশের উপর নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে প্রলম্বিত হয়ে আছেন। এখন প্রেম এবং ক্ষমার স্থান কোথায়? যীশুর প্রতিক্রিয়া কি হবে? কি বলবেন তিনি? অত্যুজ্জ্বল মহিমায় এইসব প্রশ্নের উত্তর উচ্চারিত হ'ল; যীশু কণ্টকমুকুট পরিহিত মস্তক উত্তোলিত করে ব্যঞ্জনাময় মহাজাগতিক সুরের সংগে সংগতি রেখে বলে উঠলেন: "পিতা, এদের ক্ষমা কর, কারণ এরা জানে না এরা কি করছে।" এটিই ছিল যীশুর জীবনের সুন্দরতম, মধুরতম মুহূর্ত। অদৃষ্টের সঙ্গে জাগতিক মিলনের প্রতি এটি ছিল তাঁর স্বর্গীয় প্রতিক্রিয়া।

প্রকৃতির বৈপরীত্যের সঙ্গে তুলনা করলে আমরা এই প্রার্থনার মহত্ত্ব বুঝতে পারি। প্রকৃতি একটি নৈর্ব্যক্তিক কাঠামোর মধ্যে চূড়ান্তভাবে বিধৃত। তাই প্রকৃতি ক্ষমা করে না। ঝড়ঝঞ্ঝার ঘূর্ণাবর্তে পড়ে মানুষ যখনই যন্ত্রণায় আকুতি জানায়, অথবা ভারা থেকে পড়তে পড়তে রাজমিস্ত্রী যখন আতঙ্কে চেঁচিয়ে ওঠে, তখন জড় প্রকৃতির মধ্যে প্রকাশ পায় নিরুত্তাপ, শান্ত, বোধশূন্য ঔদাসিন্য। প্রকৃতিতে আছে নিয়মের রাজত্ব যা চিরন্তন, অটল, অপরিবর্তনীয়। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘিত হ'লে প্রকৃতির পক্ষে অপ্রতিরোধ্যভাবে নিয়মের পথ অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। প্রকৃতি ক্ষমা করে না, ক্ষমা করতে পারে না।

অথবা ক্ষমা করার ব্যাপারে মানুষের মন্থরতার সঙ্গে যীশুর প্রার্থনার তুলনামূলক বৈসাদৃশ্যের কথা ভাবা যা'ক। আমরা যে জীবনদর্শন অনুসরণ করি তা হচ্ছে জীবনের তাল রেখে এবং মুখরক্ষা করে চলা। প্রতিশোধের বেদীতে আমরা মাথা ঠেকাই। গাজাতে স্যামসনকে অন্ধ করে দেওয়া হলে পর সে তার শত্রুদের জন্য ঐকান্তিকতার সঙ্গে প্রার্থনা করেছিল, কিন্তু প্রার্থনা ছিল তাদের চরম বিনাশ-সাধনের। মানুষের প্রতিশোধস্পৃহা জীবনের সম্ভাবনাময় সৌন্দর্যকে অবিরত কালিমালিপ্ত করে দেয়।

অথবা সমাজের সঙ্গে প্রার্থনার তুলনামূলক বৈসাদৃশ্যের কথা ধরা যা'ক, যে-সমাজের মধ্যে ক্ষমা করার প্রবণতা আরও কম। সমাজের নিজস্ব বিচারের মান, নিয়মকানুন, রীতিনীতি থাকবেই। সমাজের আইনগত নিয়ন্ত্রণ এবং বিচারগত বিধিনিষেধও থাকবে। যারা সমাজ নির্দেশিত মানের নীচে চলে যায় এবং আইন মানে না, তারা নিন্দা ও ধিক্কারের অন্ধকার গহ্বরে পড়ে থাকে এবং সংশোধনের দ্বিতীয় সুযোগটি পায় না। একটি নির্দোষ তরুণী, যে মুহূর্তের যৌন আসক্তির ফলে অবৈধ সন্তানের মাতা হয়ে পড়েছে—তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, সে বলবে সমাজ তাকে ক্ষমা করতে নারাজ। একজন সরকারী কর্মচারী, যে অসতর্ক মুহূর্তে বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করেছে, তাকে জিজ্ঞাসা কর, সে বলবে সমাজ তাকে ক্ষমা করতে চায় না, যে-কোন কয়েদখানায় গিয়ে কয়েদীদের জিজ্ঞাসা কর, জীবনের পাতায় লিখিত আছে তাদের লজ্জাকর কাজের বিবরণ। কারান্তরাল থেকে তারা বলবে সমাজ তাদের ক্ষমা করবে না। গুরুতর অপরাধে অপরাধী মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত মানুষদের কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বল। যখন করুণভাবে বৈদ্যুতিক চেয়ারের দিকে চলেছে, তারা হতাশায় চিৎকার করে বলবে সমাজ তাদের ক্ষমা করবে না। মৃত্যুদণ্ড হচ্ছে সমাজের চূড়ান্ত জবাব যাকে সে ক্ষমা করবে না।

এই হ'ল নশ্বর জীবনের একটানা অনড় কাহিনী। প্রতিশোধের ক্রমবর্ধমান তরঙ্গবিক্ষোভে ইতিহাস-সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে। প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, হাতের বদলে হাত, পায়ের বদলে পা'—লেক্স্ ট্যালিওনিস্ (Lex Talionis) 'এর এই হুকুমনামার উর্ধ্বে মানুষ কোনদিন

উঠতে পারেনি। প্রতিশোধের নীতি কোন সামাজিক সমাধান দিতে পারে না, তৎসত্ত্বেও এই সর্বনাশা নীতি মানুষ অনুসরণ করে। যে-সমস্ত জাতি এবং ব্যক্তিমানুষ এই আত্ম-পরাজয়ের পথে চলেছে, ইতিহাস তাদের ধ্বংসাবশেষে আকীর্ণ হয়ে আছে।

যীশু ক্রুশ থেকে উদাত্ত কণ্ঠে একটি মহত্তর নীতি ঘোষণা করেছিলেন। তিনি জানতেন যে 'চোখের বদলে চোখ' এই প্রাচীন দর্শন প্রত্যেককে অন্ধ করে ফেলবে। তিনি অশুভের দ্বারা অশুভকে জয় করতে চাননি। শুভ শক্তির দ্বারা তিনি অশুভ শক্তিকে পরাভূত করেছিলেন। যদিও হিংসার দ্বারা তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটেছিল আগ্রাসী প্রেমের মাধ্যমে।

কি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! যুগে যুগে মানবজাতির উত্থান এবং পতন ঘটবে; মানুষ প্রতিহিংসার দেবতাকে পূজো করে চলবে এবং প্রতিহিংসার বেদীমূলে নতমস্তক হবে, কিন্ত ক্যালভারির এই মহৎ শিক্ষা বার বার খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে স্মরণ করিয়ে দেবে যে শুভশক্তি অশুভ শক্তিকে দূরীভূত করতে পারে এবং প্রেমের দ্বারা হিংসাকে জয় করা যায়।

দুই

ক্রুশবিদ্ধ যীশুর প্রার্থনা থেকে দ্বিতীয় একটি শিক্ষা আমরা পাই। এটি হ'ল মানুষের বৌদ্ধিক এবং আত্মিক অন্ধত্ব সম্বন্ধে তাঁর চেতনার প্রকাশ। যীশু বলেছিলেন, 'তারা জানে না তারা কি করছে'। এই অন্ধত্বই হ'ল তাদের সমস্যা, তাদের প্রয়োজন জ্ঞানের। আমাদের বোঝা উচিত যে যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়াটা শুধু পাপের দ্বারা নয়, অন্ধত্বের দ্বারাও বটে। যে লোকগুলি চেঁচিয়ে বলেছিল, "ওকে ক্রুশবিদ্ধ কর" তারা দুষ্ট লোক ছিল না, তারা ছিল অন্ধলোক। ক্যালভারি যাওয়ার পথের ধারে সারিবদ্ধ যে জনতা তাঁকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছিল, তারা মন্দ লোক ছিল না, তারা ছিল অন্ধ লোক। তারা জানত না তারা কি করছিল, কি মর্মান্তিক ব্যাপার!

এ'ধরনের লজ্জাস্কর মর্মান্তিক ঘটনার বিবরণ ইতিহাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বহু শতাব্দী পূর্বে সক্রেটিস নামে এক ঋষিকল্প মানুষ হ্যামলক বিষ পান করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যে লোকেরা তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল, তারা মন্দ লোক ছিল না, শয়তানের রক্ত তাদের ধমনীতে বইছিল না। বরং তারা ছিল গ্রীসের সাচ্চা এবং সম্মানিত নাগরিক। তারা সত্যিসত্যি মনে করেছিল সক্রেটিস ছিলেন একজন নাস্তিক। কারণ তাঁর ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণার মধ্যে ছিল একটি দার্শনিক গভীরতা যেটির অনুসন্ধানী জিজ্ঞাসা প্রথাগত ধ্যানধারণাকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। মন্দত্ব নয়, অন্ধত্বই সক্রেটিসকে হত্যা করেছিল। সল্ যখন খ্রিস্টানদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছিল, তখন সে মন্দবুদ্ধির লোক ছিল না। ইজরায়েলী ধর্মবিশ্বাসের প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিল অকপট ও বিবেকী। সে মনে

করেছিল সে সঠিক কাজই করছে। সে খ্রিস্টানদের উপর অত্যাচার চালিয়েছিল তার চারিত্রহীনতা-বশত নয়, কিন্তু তার মধ্যে প্রজ্ঞার অভাব ছিল। যে-সমস্ত খ্রিস্টান ঘৃণ্য নিপীড়ন এবং ইনকুইজিসনে নিয়োজিত ছিল তারা মন্দলোক নয়, বিপথগামী লোক। সেই সব গীর্জাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ভেবেছিল তারা বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে, তা কোপার্নিকাসের বৈপ্লবিক আবিষ্কারই হোক বা ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বই হোক, বাধা দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের নির্দেশ পেয়েছে : তারা অনিষ্টকারী লোক ছিল না, কিন্তু আসল তথ্য তাদের অজানা ছিল। সুতরাং ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় খৃষ্টের উচ্চারিত কথাগুলি ইতিহাসের কিছু অবর্ণনীয় বিয়োগান্তক নাটকে খোদাই করা অক্ষরে লিখিত আছে, "তারা জানে না তারা কি করছে।"

আমাদের নিজেদের যুগে এই মারাত্মক অন্ধত্ব নানাভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। কিছু লোক এখনো মনে করে বিশ্বের যাবতীয় সমস্যার সুরাহা হবে যুদ্ধের মাধ্যমে। তারা মন্দ লোক নয়। বরং তারা সৎ, মাননীয় নাগরিক। তাদের ধ্যান-ধারণা স্বদেশপ্রেমের পোষাকে আবৃত। তারা যুদ্ধসীমার শেষপ্রান্ত অবধি যাওয়ার নীতি এবং ভীতিসঞ্চারের মধ্যে ভারসাম্যের কথা বলে। তাদের স্থির বিশ্বাস অস্ত্রপ্রতিযোগিতা চালিয়ে যাওয়ার পরিণাম অকল্যাণকর নয়, বরং কল্যাণকর হবে। তাই তারা আবেগ চালিত হয়ে বলে যে আরো বড় বড় বোমা তৈরি করার, পারমাণবিক অস্ত্রের ভাণ্ডার বাড়িয়ে তোলার এবং অধিকতর দ্রুতগতি-সম্পন্ন ক্ষেপণাস্ত্র বানানোর প্রয়োজন রয়েছে।

অভিজ্ঞতার্জিত প্রজ্ঞার আলোয় আমাদের বোঝা উচিত যে যুদ্ধের দিন ফুরিয়ে গেছে। হয়ত এমন এক সময় ছিল যখন অশুভ শক্তিকে ব্যাহত করার কাজে যুদ্ধের একটি নেতিবাচক ভূমিকা ছিল। কিন্তু আধুনিক মারণাস্ত্রের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা যুদ্ধের একটি নেতিবাচক সৎ উদ্দেশ্য সাধনের সম্ভাবনাকে মুছে দিয়েছে। আমরা যদি ধরে নিই যে জীবনযাপনের বিশেষ মূল্য বা সার্থকতা আছে এবং মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার আছে, তবে আমাদের যুদ্ধের একটি বিকল্প খুঁজে নিতেই হবে। এমন দিনে যখন মহাকাশযান মহাকাশের পথে সশব্দে ছুটে যায়, নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে মরণপথ তৈরি করে এগিয়ে যায়, তখন কোন জাতিই যুদ্ধে জয়ের দাবী করতে পারে না। তথাকথিত সীমিত যুদ্ধ মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং আত্মিক বিভ্রান্তির ন্যায় চরম দুর্দশার ফলশ্রুতি রেখে যায়। ভগবান না করুন একটি বিশ্বযুদ্ধ মানবজাতির ধূমায়মান ভস্মরাশিকে নির্বাক সাক্ষ্যস্বরূপ রেখে যাবে যে এই নির্বুদ্ধিতা অনিবার্যভাবে অকালমৃত্যুকে ডেকে এনেছিল। তথাপি এমন লোকও আছে যারা সত্যিসত্যি মনে করে নিরস্ত্রীকরণ নিতান্তই মন্দ জিনিস এবং আন্তর্জাতিক আলাপ-আলোচনা অনর্থক সময় নষ্ট করার মত নিন্দনীয় ব্যাপার। আমাদের এই বিশ্ব পারমাণবিক বিনষ্টির সম্ভাব্যতায় আশঙ্কিত, কেননা এখনো বহু লোক আছে যারা জানে না তারা কি করছে।

আরও দেখুন, জাতিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাইবেলীয় পাঠাংশের সত্যতা কিভাবে প্রকট হয়েছে। আমেরিকায় এই দাসপ্রথা অব্যাহত রাখা হয়েছিল শুধু মানুষের দুষ্টবুদ্ধির জন্য নয়, মানুষের অন্ধ মনোবৃত্তির জন্যও বটে। সত্য বটে, দাসপ্রথার কার্য-কারণ ভিত্তি ছিল বহুলাংশে অর্থনৈতিক। লোকেরা নিজেদের বুঝিয়েছিল যে, যে-প্রথা আর্থিক দিক থেকে লাভজনক তা নৈতিক দিক থেকে সমর্থনযোগ্য। জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের বিস্তৃত তত্ত্বসমূহ খাড়া করা হ'ল। তাদের এই তথাকথিত যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট অন্যায়কে ন্যায়ের আবরণে আবৃত করে রেখেছিল। একটি আর্থিক দিক থেকে লাভজনক ব্যবস্থাকে নৈতিক অনুমোদন দেওয়ার এই মর্মান্তিক প্রয়াস শ্বেত-সার্বভৌমত্বের জন্ম দেয়। ধর্ম ও বাইবেলের উল্লেখ করা হ'ল স্থিতাবস্থাকে পরিশীলিত করার জন্য। নিগ্রোর জৈবিক নিকৃষ্টতা প্রমাণের জন্য বিজ্ঞানকে কাজে লাগানো হ'ল। এমনকি দার্শনিক ন্যায়শাস্ত্রকে নিপুণভাবে ব্যবহার করা হ'ল দাসপ্রথাকে বুদ্ধিগতভাবে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার কাজে। জনৈক ব্যক্তি অ্যারিস্টটলীয় ন্যায় (Aristotolian syllogism) অবলম্বনে নিগ্রোদের নিকৃষ্টতা প্রমাণ করার জন্য এরূপ একটি সূত্র উদ্ভাবন করলেন—

> সকল মানুষ ঈশ্বরের অবয়বে সৃষ্ট হয়েছে ;
> ঈশ্বর, সকলেই জানে, একজন নিগ্রো নন ;
> অতএব নিগ্রো মানুষ নয়।

সুতরাং মানুষ, ধর্ম, বিজ্ঞান এবং দর্শনের মর্মগত সত্যকে সুবিধামাফিক বিকৃত করল শ্বেতকায়-শ্রেষ্ঠত্বের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। সত্বর এই ধারণা পাঠ্য-পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হল এবং গীর্জার বেদী থেকে প্রচারিত হতে থাকল। এটিকে সংস্কৃতির সাঙ্গীকৃত করা হ'ল। মানুষ এই দর্শনকে বরণ করে নিল একটি মিথ্যার আপাত যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা হিসাবে নয়, চরম সত্যের প্রকাশ রূপে। তারা সরলভাবে বিশ্বাস করে নিল যে নিগ্রোরা প্রকৃতিগত ভাবে নিকৃষ্ট এবং দাসত্ব হচ্ছে বিধিনির্দিষ্ট। দাসত্বপ্রথাকে সবচেয়ে বেশি আইনগত সমর্থন জানানো হয়েছিল ড্রেড্ স্কট মামলায় যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের রায়ে। কোর্ট এই সিদ্ধান্তে এসেছিল যে নিগ্রোর এমন কোন অধিকার নেই যেটি মান্য করতে শ্বেতকায় মানুষ বাধ্য। যে বিচারকেরা এই রায় দিয়েছিলেন তাঁরা দুষ্ট লোক ছিলেন না। বরঞ্চ তাঁরা ছিলেন সজ্জন এবং কর্তব্যবুদ্ধিপ্রণোদিত ব্যক্তি। কিন্তু তাঁরা আত্মিক এবং বৌদ্ধিক অন্ধত্বের শিকার হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা জানতেন না যে তাঁরা কি করছিলেন। সমস্ত দাসত্ব প্রথাটাই প্রধানত চালু রেখেছিলেন অকৃত্রিম অথচ আত্মিক দিক থেকে অজ্ঞ লোকেরা।

এই মারাত্মক অন্ধত্ব দেখা যায় জাতি-পৃথকীকরণের মধ্যে, যা কিনা দাসত্বের নিকট দোসর। পৃথকীকরণ নীতির দুর্ধর্ষ সমর্থকদের মধ্যে কয়েকজনের ছিল অকৃত্রিম বিশ্বাস এবং আন্তরিক প্রেরণা। যদিও কিছু লোক পৃথকীকরণ সমর্থন

করেছিল রাজনৈতিক সুবিধা আদায় এবং আর্থিক লাভের জন্য তথাপি একীকরণের বিরুদ্ধে সব প্রতিরোধ শুধু পেশাদারী গোঁড়াদেরই শেষ লড়াই নয়। কিছু লোক মনে করে পৃথকীকরণ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য তাদের চেষ্টা তাদের নিজেদের, তাদের সন্তানদের এবং দেশের স্বার্থে। অনেক সৎ যাজক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা তাঁদের মাতাপিতার বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে আছেন। তাঁদের এই বিশ্বাসের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করতে বলা হলে তাঁরা এই যুক্তি দেখান যে ঈশ্বর ছিলেন সর্বপ্রথম পৃথকীকরণবাদী। "লালপাখি এবং নীলপাখি একসঙ্গে ওড়ে না"—এই তাঁদের বক্তব্য। তাঁরা জোর দিয়ে বলেন পৃথকীকরণ বিষয়ে তাঁদের মতামত যুক্তিগ্রাহ্যভাবে ব্যাখ্যা করা যায় এবং নৈতিক দিক থেকে ন্যায়-সংগত বলে প্রতিপন্ন করা চলে। নিগ্রোদের নিকৃষ্টতায় তাঁদের বিশ্বাসের যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হলে তাঁরা কিছু মেকী বৈজ্ঞানিক রচনার উল্লেখ করে এই যুক্তি দেখান যে নিগ্রো মানুষের মস্তিষ্ক শ্বেতকায় মানুষের মস্তিষ্কের চাইতে ছোট; তাঁরা জানেন না বা জানতে চান না যে উৎকৃষ্ট জাত বা নিকৃষ্ট জাতের ধারণা নৃবিজ্ঞান অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করেছে। রুথ্ বেনিডিক্ট্, মার্গারেট মীড্ এবং মেলভিল জে· হাস্কোভিট্সের মত প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন যে সব জাতের মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট ব্যক্তিমানুষ থাকলেও উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট জাত বলে কিছু নেই। পৃথকীকরণ-বাদীরা স্বীকার করে না যে বিজ্ঞান প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে চার রকমের রক্ত আছে এবং এই চার রকমের রক্ত প্রত্যেক জাতের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। তারা অন্ধভাবে পৃথকীকরণস্বরূপ এই অতি মন্দ জিনিসটার চিরন্তন বৈধতায় বিশ্বাস করে এবং শ্বেত-সার্বভৌমত্ব বলে কথিত অবাস্তব ব্যাপারটিকে শাশ্বত সত্য বলে মনে করে। কি সাংঘাতিক ব্যাপার! লক্ষ লক্ষ নিগ্রো এই বিবেকী-অন্ধত্বের দ্বারা ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর কথা মনে রেখে আমাদের উৎপীড়কদের দিকে প্রেমের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমরা বলব: "পিতা, তাদের ক্ষমা কর; কারণ তারা জানে না তারা কি করছে।"

তিন

আমি যা বলবার চেষ্টা করেছি তা থেকে এটি প্রতীয়মান হবে যে শুধু আন্তরিকতা এবং বিবেকবুদ্ধি যথেষ্ট নয়। ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে এই মহৎ গুণগুলি মারাত্মকভাবে দোষদুষ্ট হয়ে অধঃপতিত হতে পারে। সমগ্র জগতে আন্তরিকতাপূর্ণ অজ্ঞতা বস্তু এবং বিবেকবুদ্ধিযুক্ত মূর্খতার মত ভয়ঙ্কর আর কিছু নেই। শেকস্পিয়ার লিখেছেন:

> For sweetest things turn sourest by their deeds;
> Lillies that fester
> Smell far worse then weeds.

[যা-কিছু মধুরেতম কর্মপাকে টক হয়ে যায়,
পচে-যাওয়া পদ্মফুল
আগাছার চেয়ে বেশি দুর্গন্ধ ছড়ায়।]

সমাজের নৈতিক অভিবাবক প্রতিষ্ঠিত বলে চার্চকে সৎ এবং শুভবুদ্ধি প্রণোদিত হওয়ার জন্য মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ আবেদন রাখতেই হবে এবং সহৃদয়তা এবং বিবেকবুদ্ধির মত মানবীয় গুণাবলীর উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু চলার পথে চার্চ মানুষকে নিশ্চয় স্মরণ করিয়ে দেবে যে সততা এবং বিবেকচেতনা বুদ্ধি থেকে বিচ্যুত হলে পাশবিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং লজ্জাজনকভাবে কুশাবিদ্ধ করে মানুষকে হত্যার কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে। চার্চ অক্লান্তভাবে মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেবে যে বুদ্ধির দ্বারা চালিত হওয়া তাদের একটি নৈতিক দায়িত্ব।

আমরা কি স্বীকার করব না চার্চ অনেক সময় জ্ঞানালোক সম্পাতের এই নৈতিক দাবী উপেক্ষা করেছে? সময় সময় চার্চ এমন কথাও বলেছে যে অজ্ঞতা একটি গুণ এবং বুদ্ধি বা বিজ্ঞতা একটি অপরাধ। নতুন সত্যের প্রতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, বদ্ধমনস্কতা এবং গোঁড়ামির ফলে চার্চ তার যে-সব অনুগামী যাজকবৃন্দ বুদ্ধিকে বক্রদৃষ্টিতে দেখে তাদের উৎসাহিত করেছে।

যদি আমরা নিজেদের খ্রিস্টান বলে পরিচয় দিই, তাহ'লে আমাদের বৌদ্ধিক ও নৈতিক অন্ধত্ব পরিহার করতে হবে। নিউ টেস্টামেন্টের সর্বত্র জ্ঞানালোকের বিষয় সম্বন্ধে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমাদের প্রতি নির্দেশ আছে ঈশ্বরকে ভালবাসার। ভালবাসা শুধু অন্তর এবং আত্মা দিয়ে নয়, মন দিয়েও। খ্রিস্ট-শিষ্য-পল যখন তাঁর বিরোধীদের অনেকের মধ্যে অন্ধত্ব লক্ষ্য করলেন, তিনি বললেন, "আমি শপথ করে বলতে পারি তাদের মধ্যে ঈশ্বরের জন্য ভাবাবেগ আছে, কিন্তু তা জ্ঞানানুসারী নয়।" বাইবেল জ্ঞানবিহীন ভাবাবেগ এবং জ্ঞানবিহীন আন্তরিকতা সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছে।

সুতরাং পাপ এবং অজ্ঞতা—এই দুটিকে জয় করার জন্য আমাদের উপর প্রত্যাদেশ আছে। আধুনিক মানুষ বর্তমানে একটি বিশৃংখল অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে, কেবলমাত্র মানুষের দুষ্ট প্রকৃতির জন্য নয়, মানুষের নির্বুদ্ধিতার জন্য। পাশ্চাত্য সভ্যতা যদি অধঃপাতে যেতে থাকে, যতক্ষণ না তার ২৪টি পূর্বসূরীর মত নৈরাশ্যজনক ভাবে অতল শূন্যতার মধ্যে তলিয়ে যায়, তার কারণ হবে শুধু অনস্বীকার্য পাপপরায়ণতা নয়, মারাত্মক অন্ধত্বও। এবং আমেরিকার গণতন্ত্র যদি ক্রমশ ভেঙ্গে পড়ে, তার কারণ হবে যতটুকু অন্তর্দৃষ্টির অভাব, ততটুক ন্যায়ের প্রতি দায়বদ্ধতার অভাব। যদি আজকের দিনের মানুষ নির্দ্বিধায় যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে ফাস্টিনস্টি করে চলে এবং শেষ পর্যন্ত তার ফলে পৃথিবীর বাসভূমি প্রজ্জ্বলিত নরকে পরিণত হয়, যা দান্তের কল্পনাতেও আসেনি, তবে এটি হবে ডাহা নষ্টামি এবং ডাহা বোকামির ফল।

"তারা জানে না তারা কি করছে"—বলেছিলেন যীশু। অন্ধত্বই তাদের দারুণ ঝঞ্ঝাটের মধ্যে ফেলেছিল। বিষয়টির জটিলতা এখানে যে আমাদের অন্ধ হয়ে পড়ার দরকার নেই। মানুষের নৈতিক অন্ধত্ব ঘটে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে যার উপর মানুষের কোন হাত নেই। কিন্তু বৌদ্ধিক এবং নৈতিক অন্ধত্ব এমন একটি উভয় সংকট যা মানুষ নিজের উপর চাপিয়ে দেয় স্বাধীনতার মারাত্মক অপব্যবহারের এবং নিজের মনকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে। একদিন আমরা বুঝব যে অন্তর কখনো পুরো-পুরি শুদ্ধ, নীতিপরায়ণ হয় না, মন যদি পুরোপুরি অশুদ্ধ নীতিহীন হয়। এটা বলা হচ্ছে না যে অন্তর যদি খাঁটি না হয় তা'হলে মন খাঁটি হতে পারে। কেবল মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ে সামঞ্জস্যবিধানের মধ্য দিয়ে মানুষের আপন স্বভাব পূর্ণতার স্তরে উন্নীত হতে পারে। এটাও বলা হচ্ছে না যে উত্তম জীবন আয়ত্ত করতে হলে একজন দার্শনিক হতে হবে বা বিস্তর কেতাবী শিক্ষার দরকার হবে। আমি অনেক লোককে জানি যাঁদের প্রথাগত শিক্ষা সীমিত, অথচ তাঁদের বুদ্ধি এবং দূরদৃষ্টি বিস্ময়কর। বুদ্ধি আসে উদার মানসিকতা, প্রগাঢ় বিচারবুদ্ধি এবং সত্যপ্রীতি থেকে। এটি হ'ল অনড় বদ্ধমনস্কতা এবং জরাগ্রস্ত নির্বুদ্ধিতার ঊর্ধ্বে উঠে আসার জন্য মানুষের প্রতি আহ্বান। উদারমনস্ক হওয়ার জন্য কারও অতি-বড় বিদ্বান হওয়ার দরকার হয় না। অথবা ক্লান্তিবিহীন সত্যের অনুসরণে কারও নিষ্ঠাবান শিক্ষাবিদ হওয়ারও প্রয়োজন নেই। অদূরপ্রসারী কালসীমার মধ্যে উত্থিত কণ্ঠধ্বনি মানুষকে ডেকে বলছে আলোর পথে পথচলা শুরু করতে। এই আহ্বানে সাড়া না দিলে মানুষের জীবন এক মহাজাগতিক মরণগীতিতে পরিণত হবে। জন বলেছেন, "পৃথিবীতে আলো এসে পড়েছে। এবং মানুষ আলোর চেয়ে বরং অন্ধকার ভালবাসে—এটি নিতান্ত নিন্দনীয় ব্যাপার।" যে লোকেরা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল তাদের সম্বন্ধে যীশু যা বলেছিলেন তা ছিল যথার্থ। তারা জানত না তারা কি করছিল। তারা মর্মান্তিক অন্ধত্বের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। ক্রুশের দিকে আমি যতবার তাকাই ততবার ঈশ্বরের মহত্ত্ব এবং যীশুর মানবজাতির পুনরুদ্ধারের শক্তি আমার স্মরণে উদিত হয়। আমার মনে আসে আত্মত্যাগপূত প্রেমের সৌন্দর্য এবং সত্যের প্রতি নিষ্কম্প অনুরাগের মহনীয়তা। তাই জন ব্রাউনিং-এর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি :

খ্রিস্টের ক্রুশ নিয়ে করি আমি গৌরব
কালের ধ্বংসের 'পরে যা রয়েছে জেগে,
পবিত্র কাহিনীর পুঞ্জিত আলো সব
তাঁহার সমুন্নতশিরে আছে লেগে।

কি অদ্ভুত লাগত যদি আমি ক্রুশের দিকে তাকাতাম এবং ঐ রকমের মহত্তর প্রতিক্রিয়া কেবল অনুভব করতাম। যে-ভাবেই হোক, ক্রুশ মহত্ত্বের এবং ক্ষুদ্রতার, ভাল এবং মন্দের সংমিশ্রণের প্রতীক হয়ে আছে—এই অনুভব ছাড়া আমি ক্রুশ

থেকে চোখ ফেরাতে পারি না। উত্তোলিত ক্রুশের দিকে যখন আমি তাকাই, তখন আমার মনে আসে ঈশ্বরের অসীম শক্তি এবং মানুষের ঘৃণ্য দুর্বলতার কথা। আমি শুধুমাত্র ঐশ্বরিক আলোর কথা ভাবি না, মানুষের চারিত্রিক ক্রূরতার কথাও ভাবি। আমার মনে আসে খ্রিস্টের সত্তার কথা শুধু নয়, মানুষের কদর্যতম স্বরূপের কথাও।

ক্রুশকে আমাদের দেখতে হবে হিংসা-বিদ্বেষের উপর প্রেমের, অন্ধকারের উপর আলোর উজ্জ্বল প্রতীকরূপে।

কিন্তু এই প্রোজ্জ্বল বিঘোষণার মধ্যে আমাদের ভুললে চলবে না যে মানুষের অন্ধত্বের কারণে আমাদের প্রভু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। যাঁরা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল তারা জানত না তারা কি করেছিল।

পূর্ণজীবনের তিন মাত্রা

(থ্রি ডাইমেনশনস্ অফ কমপ্লিট লাইফ)

জন্ দ্য রেভেল্যাটর-কে পাটমোস্ নামে এক নির্জন অজ্ঞাত দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। এক চিন্তার স্বাধীনতা ছাড়া সব রকমের স্বাধীনতা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। সুতরাং অনেক বিষয়ে তিনি চিন্তা করেছিলেন। তিনি রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থা এবং তার মারাত্মক অপূর্ণতা এবং ভয়ানক অন্যায্য ব্যাপারসমূহের উপর অনেক ভাবনা-চিন্তা করেছিলেন। তিনি প্রাচীন জেরুসালেম এবং তার ভাসাভাসা দয়াধর্ম এবং এলোমেলো আচার-অনুষ্ঠানের কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু বিগত দিনের যন্ত্রণাদায়ক ভাবনাচিন্তার মধ্যেও নতুন এবং মহৎ বিষয়ের উপর জনের অতি উজ্জ্বল কল্পনাও ছিল। ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত একটি নতুন জেরুসালেমকে স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখেছিলেন তিনি। এই নতুন স্বর্গীয় নগরীর একটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল এর পূর্ণতা, নিশ্চল দীর্ঘ অন্ধকারের অবসানে প্রত্যুষের ঔজ্জ্বল্য। এটি আংশিক বা একতরফা নয়, কিন্তু এর আছে ত্রি-মাত্রিক পূর্ণতা। নগরীর বর্ণনা করতে গিয়ে জন বলেছেন, "দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা সমান"। ঈশ্বরের এই নয়া নগর ভারসাম্যহীন হবে না— একদিকে অত্যুচ্চ গুণাবলী, অপরদিকে নক্কারজনক দোষসমূহ ; এটি হবে সর্বদিক থেকে পূর্ণতাপ্রাপ্ত।

অনেকের কাছে 'বুক অভ্ রিভিলেশন্' একটি অদ্ভুত গ্রন্থ যার অর্থোদ্ধার বিভ্রান্তিকর। এটিকে প্রায়ই রহস্যাবৃত হেঁয়ালী বলে সরিয়ে রাখা হয়। কিন্তু জনের বিশেষ ধরনের ভাষার দুর্বোধ্যতা এবং রহস্যোদ্ঘাটন সূচক প্রতীকতার আড়ালে রয়েছে সত্য যা চ্যালেঞ্জ্ জানায় এবং যা গভীর অর্থবহ। এমন একটি সত্য আমাদের মূলগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। জন ঈশ্বরের নয়া নগরের বর্ণনাচ্ছলে আসলে আদর্শ মনুষ্যত্ব কি তাই বর্ণনা করেছেন। তাঁর বক্তব্যের সারাংশ হ'ল এই —সর্বোত্তম জীবন সর্বদিক দিয়ে পূর্ণ।

আমাদের ব্যক্তিক এবং সমষ্টিগত জীবন হচ্ছে বিরক্তিকর অসম্পূর্ণতা এবং অস্বস্তিকর আংশিকতা। মহত্ত্বকে পূর্ণ অর্থে আমরা কদাচিৎ তুলে ধরতে পারি। মহত্ত্বের ঘোষণা করতে গিয়ে আমরা প্রায়শ 'কিন্তু' কথাটি ব্যবহার করে থাকি। ওল্ড্ টেস্টামেন্ট বলে—"নামান্ ছিলেন মহৎ ব্যক্তি, 'কিন্তু'—"। 'কিন্তু' শব্দটি মারাত্মক এবং গোলমেলে। "কিন্তু তিনি ছিলেন কুষ্ঠরোগী"। মানুষের জীবনের কতটুকুই বা এ'ভাবে বর্ণনা করা যায় ?

গ্রীস ছিল একটি মহান দেশ যে পরবর্তী প্রজন্মগুলির জন্য রেখে গেছে জ্ঞানের অফুরন্ত ধনভাণ্ডার। সে জগৎকে দিয়েছে ইস্কিলাস্, সোফোক্লিস্ এবং ইউরিপিডিসের কাব্যিক অন্তর্দৃষ্টি এবং সক্রেটিস্, প্লেটো, অ্যারিস্টটলের দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি। এই প্রতিভাবান বড় মনের মানুষদের দৌলতে আমরা উত্তরাধিকার

সূত্রে পেয়েছি সৃজনধর্মী চিন্তাধারা। গ্রীস ছিল মহান দেশ, কিন্তু সেই 'কিন্তু'ই মারাত্মক ঘটনাটিকে এই হিসেবে চিহ্নিত করে যে গ্রীস প্রকৃতপক্ষে কিছু লোকের অভিজাততন্ত্র হয়ে উঠেছিল, সমগ্র জনসাধারণের গণতন্ত্র হয়ে ওঠে নি। সেই 'কিন্তু' এই কদর্য ঘটনার দ্যোতক হয়ে উঠেছিল যে গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলি দাসত্ব-প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

পাশ্চাত্য সভ্যতা এক মহান সভ্যতা যা বিশ্বকে দিয়েছে রেঁনেশাঁসের মহান অবদান; হ্যান্ডেলের আনন্দদায়ক বজ্রনির্ঘোষ এবং শান্ত দীর্ঘশ্বাস; বিথোভেনের অপূর্ব সুরমাধুর্য, ব্যাচের মনমাতানো সংগীতসুধা; শিল্পবিপ্লব এবং বস্তুগত প্রাচুর্যের দিকে মানুষের বিস্ময়কর অভিযাত্রা। পাশ্চাত্য সভ্যতা মহান, কিন্তু—হ্যাঁ এই 'কিন্তু'ই আমাদের অন্যায্য এবং অশুভ ঔপনিবেশিকতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, এবং এটি এমন এক সভ্যতা যার আওতায় বস্তুতান্ত্রিক উপায় আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

আমেরিকা একটি মহান দেশ যা কিনা 'ডিক্লারেশন অফ্ ইন্ডিপেন্ডেন্স'-এর মাধ্যমে সবচেয়ে সোচ্চার এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মানবিক মর্যাদা প্রকাশ করেছে——যা ঐরকমভাবে আর কোন সামাজিক-রাজনৈতিক দলিলে উল্লিখিত হয়নি। প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে আমেরিকা সমুদ্রের উপর পুল এবং আকাশচুম্বী অট্টালিকা নির্মাণ করেছে। রাইট্ ভ্রাতৃদ্বয়ের মাধ্যমে তারা বিশ্বকে বিমান দিয়েছে এবং মানুষের পক্ষে দূরত্বকে জয় এবং সময়কে সীমাবদ্ধ করা সম্ভবপর হয়েছে। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের দৌলতে তার আবিষ্কৃত বহুবিধ আশ্চর্য ঔষধি অনেক মারাত্মক রোগ নিরাময় করেছে এবং মানুষের পরমায়ু লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে গিয়েছে। আমেরিকা মহান দেশ, কিন্তু—ওই 'কিন্তু'ই হচ্ছে দ্বিশতাধিককালের দাসত্বপ্রথার ফলশ্রুতি-স্বরূপ এর দু কোটি নিগ্রোর জীবন, স্বাধীনতা এবং অভীষ্ট সুখস্বাচ্ছন্দ থেকে বঞ্চনার উপর টিকা-টিপ্পনি। ওই 'কিন্তু' হচ্ছে ব্যবহারিক বস্তুবাদ যেটি মূল্য-বোধের চেয়ে বস্তুর উপর বেশি গুরুত্ব দেয়। মহত্ত্বের অভিব্যক্তি পূর্ণতার দ্বারা চিহ্নিত নয়, পক্ষপাতদোষের যতিচিহ্নে বাধাপ্রাপ্ত। আমাদের অনেক মহত্তম ব্যক্তি মহৎ কোন কোন ক্ষেত্রে, কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে হীন এবং অবনমিত।

তথাপি জীবনকে প্রতিক্ষেত্রে বীর্যশালী এবং পরিপূর্ণ করে তোলা উচিত। আমাদের শাস্ত্রে যেমন বলা হয়েছে, জীবনের তিনটি মাত্রা আছে—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা। জীবনের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য এবং উচ্চাশা পূরণের আন্তর প্রেরণা এবং উদ্যম, নিজের কল্যাণ এবং সাফল্য অর্জনের ঐকান্তিক আগ্রহ। জীবনের প্রস্থ হচ্ছে অপরের কল্যাণ সাধনের অভিপ্রায় এবং অভিপ্রচেষ্টা। জীবনের উচ্চতা হচ্ছে ঈশ্বরকে পাওয়ার সাধনা। জীবনের শ্রেষ্ঠ রূপ হ'ল একটি সুসমঞ্জস ত্রিভুজ। এক কোণে আছে ব্যক্তি মানুষ। অন্য কোণে রয়েছে বাকী সব মানুষ। সর্বোচ্চ রয়েছে অসীম ব্যক্তিসত্তা—ঈশ্বর। ত্রিভুজের প্রতি অংশের যথাযথ উন্নয়ন ব্যতীত জীবনে পূর্ণতা আসে না।

এক

আমরা প্রথমে জীবনের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ ব্যক্তির আন্তর ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। এক অর্থে এটি জীবনের স্বার্থবোধ থেকে উদ্ভূত মাত্রা। যুক্তিসম্মত এবং সুস্থ আত্মস্বার্থ বলে একটি জিনিস আছে। প্রয়াত ইহুদী যাজক যোসুয়া লইয়েরম্যান তাঁর 'পিস্ অফ্ মাইন্ড' গ্রন্থের একটি কৌতুহল উদ্দীপক অধ্যায়ে বলেছেন—অপরকে যথেষ্টভাবে ভালবাসার আগে আমাদের নিজেদেরকেই ভালবাসতে হবে। বহুলোক আবেগপূর্ণ অদৃষ্টবাদের গহ্বরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, কেননা তারা নিজেদের সুস্থভাবে ভালবাসে না।

প্রত্যেক মানুষের নিজের সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তা নিশ্চয় থাকা উচিত এবং জীবনের উদ্দেশ্য কি তা আবিষ্কারের যে দায়িত্ব আছে তা অনুভব করা উচিত। ঈশ্বর প্রত্যেক স্বাভাবিক মানুষকে শক্তি দিয়েছেন যার দ্বারা সে কোন উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে। এটা সত্যি যে কোন কোন মানুষের অন্যদের চাইতে বেশি প্রতিভা আছে, কিন্তু ঈশ্বর কাউকেও একেবারে প্রতিভাশূন্য করে রাখেননি। আমাদের সৃজনশীল ক্ষমতা আছে, এবং আমাদের কর্তব্য সেই ক্ষমতাকে আবিষ্কার করা।

যখন কেউ আবিষ্কার করবে কোন্ কার্যের নিমিত্ত তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তখন সেই কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত তার সত্তার সমস্ত শক্তি সে নিয়োগ করবে। সে সেই কাজ অন্য কারোর চাইতে ভাল করে করবে। সে তা করবে যেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ইতিহাসের এই বিশেষ মুহূর্তটিকে সেই কাজের জন্যই তাকে ডাক দিয়েছেন। এই মহিমান্বিত লক্ষ্য-চেতনা এবং সুদৃঢ় সঙ্কল্প ব্যতীত কেউ মানব-জাতির জন্য কোন অবদান রেখে যেতে পারে না। এই আন্তর প্রেরণা সঞ্জাত ক্ষমতা ভিন্ন কোন ব্যক্তি তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে না। কবি লংফেলোর কথায় :

> মহিমা-শীর্ষে মহতের অধিবাস
> হয়নি কখনো চকিত উড্ডয়নে,
> নিশীথে সাথীরা যখন মগ্ন ঘুমে,
> তখন তাঁদের সাধনা উত্তরণে।

আমি আমাদের যুবকদের একটি বিশেষ কথা বলব। দৈর্ঘ্যের মাত্রাটি একটি অদ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ্ হয়ে আছে। তোমরা অনেকে কলেজে, অনেকে উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়। এই অধ্যয়নকালীন সময়টার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। তোমাদের বোঝা উচিত যে নানা সুযোগ-সুবিধার দ্বার তোমাদের কাছে উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে, যা তোমাদের মা-বাবার বেলায় হয়নি। তোমরা যে বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছ তা এই যে উন্মুক্ত দরজা দিয়ে প্রবেশের জন্য তোমাদের তৈরি হতে হবে। কি শক্তি নিয়ে জন্মেছ তা তোমাদের আবিষ্কার করে নিতে হবে এবং নিজ নিজ

কর্মক্ষেত্রে উৎকর্ষ অর্জন করতে হবে। রাল্‌ফ্ ওয়াল্‌ডো এমার্সন বলেছেন, "যে-ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর চেয়ে ভাল একটি বই লিখতে পারে, ভাল ধর্মোপদেশ প্রচার করতে পারে অথবা ভাল একটি ইঁদুর ধরার কল বানাতে পারে, সে বনের মধ্যে বাস করলেও দুনিয়ার লোক পথ করে তার দুয়ারে যেতে থাকবে"। এটি উত্তরোত্তর সত্য বলে প্রমাণিত হবে। পূর্ণ মুক্তি না আসা পর্যন্ত জাতির জীবনে সৃজনধর্মী অবদান যোগানোর ব্যাপারে বিরত থেকো না। যদিও দাসত্বের উত্তরাধিকারজনিত ফলশ্রুতি এবং পৃথকীকরণ, নীচু মানের বিদ্যালয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্বের অভিজ্ঞতার মধ্যে চলতে গিয়ে তোমাদের উভয় সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তথাপি সুদৃঢ় সংকল্প নিয়ে বর্তমান পরিস্থিতির বাহ্যিক শৃংখল তোমাদের ভেঙ্গে ফেলতে হবে। আমাদের কাছে পূর্ব থেকেই সেসব নিগ্রোদের প্রেরণাদায়ক দৃষ্টান্ত আছে যাঁরা নির্যাতনের মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতেও কর্মোদ্যমের নতুন এবং উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে প্রতিভাত হয়েছেন। ভার্জিনিয়া হিল্‌সের পুরনো দাসকুঠির থেকে বেরিয়ে এসে বুকার টি. ওয়াশিংটন আমেরিকার অন্যতম মহান নেতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। জার্জিয়ার গর্ডন কাউন্টির লাল পাহাড় এবং নিরক্ষর মায়ের কোল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন রোণাল্ড্ হ্যাস্ বিশ্বের একজন সেরা সঙ্গীতশিল্পীরূপে, যাঁর শ্রুতিমধুর কণ্ঠস্বর রাজাদের প্রাসাদের এবং রাণীদের অট্টালিকায় শোনা যেত। ফিলাডেলফিয়ার দারিদ্র্য কবলিত পরিমণ্ডল থেকে এসেছিলেন মারিয়ান এণ্ডারসন। তাঁর কণ্ঠে ছিল সর্বাপেক্ষা খাদের সুর এবং তিনি হয়ে উঠেছিলন ওই রকম কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়িকা। টস্‌কানিনি তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন যে তাঁর কণ্ঠস্বরের মত কণ্ঠস্বর শতবর্ষে মাত্র একবারই আসে এবং সিবেলিয়াস উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছেন ঐ রকমের কণ্ঠস্বরের পক্ষে তাঁর ঘরের ছাদ নিতান্তই নীচু। পঙ্গু করা অবস্থা থেকে জর্জ ওয়াশিংটন কারভার বিজ্ঞানের ইতিহাসে অমর স্থান করে নিয়েছিলেন। কূটনীতির ক্ষেত্রে একজন ক্রীতদাস ধর্মপ্রচারকের পৌত্র রাল্‌ফ্ জে. ব্রাঞ্চ্ দুর্লভ কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন, অসংখ্য দৃষ্টান্তের মধ্যে এঁরা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতার অভাব সত্ত্বেও আমরা এখনই এখানে সেখানে আমাদের অবদান রাখতে পারি।

জীবনের কর্মক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জনের জন্য অক্লান্তভাবে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান আমাদের প্রত্যেকের কাছে এসেছে। সকল ব্যক্তিকেই যে কাজকর্ম বিশেষজ্ঞ বা পেশাদারী হতে হবে এমন কোন কথা নেই ; এমন কি অতি অল্প সংখ্যক লোক শিল্পকলা বা বিজ্ঞানে প্রতিভাধর হতে পারে ; অনেককে হতে হয় কলকারখানা, ক্ষেতখামার বা রাস্তার শ্রমিক। কিন্তু কোন কাজই তুচ্ছ নয়। যে শ্রম মানবজাতিকে উন্নীত করে, তার মর্যাদা এবং গুরুত্ব আছে এবং তা সযত্নে নিপুণভাবে করতে হবে। যে-ব্যক্তি রাস্তার ঝাড়ুদারের কাজ করে, তাকে রাস্তা সাফাই করতে হবে তেমন নিষ্ঠা এবং নৈপুণ্যের সঙ্গে যেমন করে মিকেল এঞ্জেলো ছবি এঁকেছিলেন, বিঠোভেন্ সুরসৃষ্টি করেছিলেন অথবা সেক্সপিয়ার কাব্য রচনা

করেছিলেন। তাঁর এমন নিখুঁতভাবে রাস্তা পরিস্কার করা উচিত যাতে স্বর্গ-মর্তের সকলে থমকে দাঁড়িয়ে বলবে, "এখানে বাস করতেন এমন একজন সেরা ঝাড়ুদার যিনি চমৎকারভাবে তাঁর কাজ করেছিলেন", ডগলাস ম্যালক এই কথাটি মনে রেখে লিখেছিলেন :

যদি পাহাড়ের চূড়ায় পাইন হতে না পার,
তবে উপত্যকার ঝোপ হয়ে থাক—কিন্তু
হবে ক্ষুদে নদীটির ধারে সেরা ছোট্ট ঝোপটি ;
যদি বৃক্ষ না হতে পার, তবে গুল্ম হও।
যদি তুমি রাজপথ হতে না পার, তবে হও সরু পথটি,
যদি সূর্য না হতে পার, তবে হও তারা ;
আকার তোমাকে জয় বা ব্যর্থতা এনে দেবে না—
তুমি যা—তাতেই সর্বোত্তম হয়ে ওঠ।

কি কাজের যোগ্য তুমি, একাগ্রতার সঙ্গে আবিষ্কার করে নাও। তারপর প্রবল উৎসাহের সঙ্গে সেই কাজে নিজেকে উৎসর্গ কর। আত্ম-পরিপূর্ণতার দিকে এই স্পষ্ট অগ্রগমনই হচ্ছে মানুষের জীবনের দৈর্ঘ্য।

দুই

কিছু লোক এই প্রথম মাত্রাটি অতিক্রম করতে পারে না। তারা বুদ্ধিমান মেধাবী লোক হতে পারে, যারা অতি চমৎকারভাবে আন্তর শক্তিকে উজ্জীবিত করে তোলে, কিন্তু তারা পক্ষাপাতদুষ্ট আত্মকেন্দ্রিকতার শৃঙ্খলে বন্ধ। তারা ব্যক্তিগত অভিলাষ এবং উচ্চাকাঙ্খার সীমাবদ্ধতার মধ্যে জীবনযাপন করে। একজন ব্যক্তি জীবনের প্রস্থবিহীন দৈর্ঘ্যের মধ্যে আটকে পড়ে আছে—এর চেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার আর কি হতে পারে।

জীবনকে যদি পূর্ণতায় অভিষিক্ত করতে হয়, তাহ'লে জীবনে শুধু কেবল দৈর্ঘ্যের মাত্রা থাকলে চলবে না, থাকতে হবে প্রস্থের মাত্রাও যা মানুষকে অপরের কল্যাণে ভাবিত করে। কোন মানুষ বাঁচতে শেখে না যদি না সে ব্যক্তিগত বিষয়ের উর্ধ্বে উঠে মানবসমাজের বিষয়ে উদার ভাবনার দ্বারা চালিত হয়। প্রস্থ ছাড়া দৈর্ঘ্য হচ্ছে বন্ধজলা উপনদীর মত, যার স্রোতধারা সমুদ্রের দিকে বয়ে যায় না। বন্ধ স্থির নীরস বলে এর মধ্যে জীবনের সরসতা নেই। সৃজনশীলতা নিয়ে অর্থপূর্ণভাবে বাঁচতে হলে আমাদের নিজেদের বিষয়ে ভাবনাচিন্তা অপরের বিষয়ের ভাবনাচিন্তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হওয়া চাই।

যীশু যখন সেই মহান বিচারের প্রতীকী চিত্র এঁকেছিলেন, তিনি এ'কথাটিই স্পষ্ট করে বুঝিয়েছিলেন যে মেষ এবং ছাগলের ভেদাভেদ নিরূপণের মাপকাঠি হবে পরের হিতার্থে কি করা হয়েছে। কাউকেও এ'কথা জিজ্ঞাসা করা হবে না সে ক'টা ডিগ্রি নিয়েছে বা কত রোজগার করেছে কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হবে পরের

জন্য কি করেছে। তুমি ক্ষুধার্তকে খেতে দিয়েছ কি? তুমি তৃষ্ণার্তকে এক গেলাস জল দিয়েছ কি? তুমি রুগ্নকে দেখতে গিয়েছ কি এবং কারারুদ্ধ ব্যক্তিকে সাহায্য করেছ কি? জীবনদেবতা এই সব প্রশ্নই করেন। এক অর্থে প্রতিটি দিনই হচ্ছে বিচারের দিন এবং আমরা আমাদের কাজ এবং কথা, নীরবতা এবং সরবতার দ্বারা প্রতিনিয়তই জীবন গ্রন্থ রচনা করে চলেছি।

জগতে জীবনের সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রতিটি মানুষকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে সৃষ্টিশীল পরার্থপরতার আলোতে, না ধ্বংসাত্মক স্বার্থপরতার অন্ধকারের মধ্যে পথ চলবে। এটিই হচ্ছে বিচার। জীবনের অটল এবং জরুরী প্রশ্ন, "অপরের জন্য তুমি কি করছ?"

ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাঠামো এমনভাবে গড়েছেন যে কিছুই যথাযথ ভাবে চলে না যদি মানুষ শ্রমসহকারে জীবনের দৈর্ঘ্যের মাত্রাকে পরিশীলিত না করে। 'আমি' সার্থক হব না 'তুমি' ছাড়া। আপন ব্যক্তিসত্তা কোনদিন সত্তা হয়ে ওঠে না অন্য সত্তার স্পর্শ ব্যতিরেকে। সামাজিক মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন আমরা প্রকৃত ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারি না যতক্ষণ না অপর ব্যক্তিদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয় হয়ে উঠতে পারি। সমগ্র জীবন পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ এবং সব মানুষ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। তথাপি আমরা অত্যধিক স্বার্থপরতার পিচ্ছিল পথে চলতে থাকি। আজকের দুনিয়ায় মানুষ যে-সমস্ত মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা দৈর্ঘ্যের সংগে প্রস্থের যোগসাধনের ক্ষেত্রে মানুষের ব্যর্থতার প্রকাশ।

আমাদের দেশ যে জাতিগত সংকটের মধ্যে পড়েছে তার মধ্যে এটি স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। জাতিগত সমস্যার মধ্যে যে উত্তেজনা রয়েছে তার কারণ অনেক শ্বেতাংগ ভাই বড় বেশি মাথা ঘামায় জীবনের দৈর্ঘ্য মাত্রা নিয়ে, যা হচ্ছে আর্থিক দিক থেকে তাদের সুবিধাজনক অবস্থা, তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা, তাদের সামাজিক পদমর্যাদা, তাদের তথাকথিত "জীবনযাত্রা প্রণালী"। যদি তারা দৈর্ঘ্যের সংগে প্রস্থের যোগ ঘটাত, অর্থাৎ স্বার্থ সম্পর্কিত মাত্রার সংগে পরার্থ-সম্পর্কিত মাত্রার যোগ ঘটাত, তা'হলে আমাদের জাতির বিবাদ বিসংবাদের ঢক্কানিনাদ সৌভ্রাতৃত্বের অপূর্ব সুরমূর্চ্ছনায় রূপান্তরিত হয়ে যেত।

দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ এই দুই মাত্রার সংযোগ সাধনের প্রয়োজনীয়তা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও রয়েছে। কোন জাতি একাকীত্বের মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে না। শ্রীমতী কিং এবং আমার একটি স্মরণীয় ভারত ভ্রমণের সুযোগ হয়েছিল। এই ভ্রমণের অনেকটা সময় আমার প্রেরণা এবং অভিজ্ঞতার মধ্যে কেটেছে। কিন্তু অনেক সময় বিষাদগ্রস্ত হয়েছি। যখন কেউ নিজের চোখে দেখে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ খালি পেটে শুয়ে থাকে, বিষন্নতা সে এড়াবে কি করে? যখন সে জানতে পারে যে ভারতে সাড়ে তেতাল্লিশ কোটির অধিক জনসমষ্টির মধ্যে তার পঁয়ত্রিশ কোটি লোকের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৭০ ডলার এবং যখন তাকে বলা হয় যে তাদের অনেকে কোন ডাক্তার বা দাঁতের ডাক্তার দেখেনি, তখন তার মনে বিষাদের ছায়া পড়বে না তো কি?

আমেরিকায় আমরা কি এ'সব অবস্থা সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারি ? জোর গলায় বলা যায় এর উত্তর হ'ল 'না' । জাতি হিসাবে আমাদের ভাগ্য ভারতের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত। ভারত বা অন্য কোন দেশের যদি নিরাপত্তার অভাব থাকে, সেক্ষেত্রে আমরাও কখনো নিরাপদ থাকতে পারি না। আমাদের দেশের অগাধ সম্পদ নিয়ে আমরা সাহায্য করতে পারি বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলিকে। আমরা কি আমাদের জাতীয় বাজেটের সিংহভাগ ব্যয় করেছি বিশ্বের চারদিকে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করতে এবং যৎসামান্য ব্যয় করেছি সত্যিকারের সহানুভূতি এবং সমঝোতার ভিত্তি রচনা করতে ?

সর্বশেষে বিশ্লেষণে এই দাঁড়ালো যে মানুষ পরস্পর নির্ভরশীল এবং তার-ফলে একটি মাত্র প্রক্রিয়ার মধ্যে সে জড়িয়ে আছে। পরস্পর সম্পাদিত বাস্তব সংযুক্তির দৌলতে আমরা অনিবার্যভাবে আমাদের ভাইয়ের প্রতিপালক। এই সত্যটি জন ডনের স্পষ্ট বচনে-ব্যাখ্যানে রূপলাভ করেছে :

কোন মানুষ নিজের সীমানায় ঘেরা একটি দ্বীপ নয়,
প্রতিটি মানুষ মহাদেশের একটি টুকরো, বৃহত্তের অংশ ;
যদি একটি মাটির ঢেলা সমুদ্র ধুইয়ে নিয়ে যায়,
ইউরোপ ততটুক ছোট হয়ে পড়ে, যেমনটি হয়
একটি সৈকতাংশের বেলায়, যেমনটি হল বন্ধুদের
বা তোমার নিজের খাস তালুকের বেলায় ; যে-কোন
মানুষের মৃত্যু আমাকে হ্রাস করে দেয়, কেননা
মানবজাতিতে আমি সাংগীকৃত ;
সুতরাং গীর্জার ঘণ্টা কার জন্য বাজে জানতে চেয়ো না ;
এটি বাজে তোমার জন্য।

সমগ্র মানবজাতির একত্রের এই স্বীকৃতি এবং পরের কল্যাণের নিমিত্ত ক্রিয়াশীল ভ্রাতৃসুলভ ভাব-ভাবনা হচ্ছে মানুষের জীবনের 'প্রস্থ'।

তিন

অন্য আরেকটি মাত্রা আছে যা হচ্ছে কিনা উচ্চতা, অর্থাৎ এমন কিছুতে পেঁছানোর জন্য ঊর্ধ্বদিকে উঠে যাওয়া—যেটি মানুষের চেয়ে বড়। আমরা এই পৃথিবী ছেড়ে ঊর্ধ্বে উঠে যাব এবং আমাদের চরম আনুগত্য জানাবো সেই শাশ্বত ঈশ্বরের প্রতি, যিনি যা কিছু বাস্তব তার উৎস এবং ভিত্তিভূমি। যখন দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের সঙ্গে উচ্চতা যুক্ত হবে, অর্থাৎ এই তিন মাত্রার সংযোগ ঘটবে তখন আমাদের জীবন পূর্ণতা লাভ করবে।

যেমন কিছু লোক আছে যারা কখনো দৈর্ঘ্য-মাত্রা অতিক্রম করতে পারে না, তেমনি অপর কিছু লোক আছে যারা দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের সংযুক্তির বাইরে যেতে পারে না। তারা তাদের আন্তর শক্তিকে চমৎকারভাবে জাগিয়ে তুলতে পারে এবং তাদের

থাকে সত্যিকারের মানবিক মমত্ববোধ। কিন্তু ওই পর্যন্তই। তারা জাগতিক ব্যাপারে এত জড়িত থাকে যে তারা মনে করে মনুষ্যজাতিই ভগবান। আকাশ ছাড়া তারা বাঁচতে চায়।

কেন আধুনিক মানুষ এই তৃতীয় মাত্রাটিকে উপেক্ষা করে, তার বোধ হয় কতকগুলি কারণ আছে। কিছু লোকের সত্যিকারের বুদ্ধিগত সংশয় রয়েছে। নৈতিক এবং প্রাকৃতিক অশুভ শক্তির ভয়াবহতার উপর দৃষ্টি রেখে তারা প্রশ্ন তোলেন, "যদি সর্বশক্তিমান মংগলময় কোন ঈশ্বর থাকেন, তবে তিনি অহেতুক দুঃখ-যন্ত্রণা থাকতে দেবেন কেন?" এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়ার ব্যর্থতা তাঁদের অজ্ঞেয়বাদের দিকে ঠেলে দেয়। এবং এমন সব লোক আছেন, যাঁরা বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তের সঙ্গে অবৈজ্ঞানিক ধর্মীয় মতবাদ এবং ঈশ্বর সম্বন্ধীয় আদিম ধারণাকে মেলাতে পারেন না।

যা হোক আমার সন্দেহ যে অধিকাংশ লোক অবশ্য আরেকটি শ্রেণীতে পড়ে। তারা তাত্ত্বিক নিরিশ্বরবাদী নয়; তারা হ'ল ব্যবহারিক নাস্তিক। তারা মুখে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। কিন্তু জীবনযাপনের ক্ষেত্রে তারা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে চলেছে: যেন ঈশ্বর বলে কিছু নেই—এভাবেই তারা জীবনযাপন করে। জীবনের কর্মসূচী থেকে যে তারা ঈশ্বরকে মুছে ফেলেছে তা একটি অসচেতন প্রক্রিয়া হতে পারে। বেশির ভাগ লোক বলে, "বিদায় ঈশ্বর, আমি এখন তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি।" কিন্তু জাগতিক বিষয়ে তারা এমন-ভাবে জড়িয়ে পড়ে যে তারা অসচেতনভাবে জড়বাদের তীব্র স্রোতের তোড়ে ভেসে যায় এবং ধর্মহীনতার ঘূর্ণাবর্তে হাবুডুবু খেতে থাকে। আধুনিক মানুষ বেঁচে থাকে, যাকে অধ্যাপক সোরোকিন্ বলেছেন 'সেনসেইট্ কালচার' বা 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংস্কৃতি', তার মধ্যে এবং বিশ্বাস করে কেবলমাত্র সেইসব বস্তুতে পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা যেগুলি জানা যায়।

কিন্তু মানবকেন্দ্রিক বিশ্বজগৎকে ঈশ্বরকেন্দ্রিক বিশ্বজগতের স্থলাভিষিক্ত করার এই প্রচেষ্টা শুধু আরো গভীরতর হতাশার মধ্যে নিয়ে যাবে। রেইনহোল্ড্ নাইবেবুর বলেছেন, "১৯১৪ সাল থেকে বিয়োগান্ত ঘটনা প্রবাহ যেন এটিই প্রমাণ করে যে ইতিহাস আধুনিক মানুষের নিষ্ফল ভ্রান্ত ধারণাসমূহকে খণ্ডন করতে চেয়েছে।" আমরা দিগ্‌দর্শন যন্ত্রবিহীন জাহাজে চড়ে আধুনিক ইতিহাস সমুদ্র পার হতে চলেছি। আমাদের কোন পথপ্রদর্শক নেই, নেই কোন পথের লক্ষ্য সম্বন্ধে সঠিক ধারণা। আমাদের সংশয়গুলিকেও আমরা সন্দেহ করি এবং বাস্তবতাকে বেষ্টন করে সত্যি কোন আত্মিক শক্তির অস্তিত্ব আছে কি নেই, এই ভেবে আশ্চর্য হই।

তত্ত্বগত অস্বীকৃতি সত্ত্বেও আমাদের আত্মিক অভিজ্ঞতা আছে যা বস্তুতান্ত্রিক সংজ্ঞার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। যদিও আমরা জড় প্রকৃতিতে নিয়মের রাজত্বকে মান্য করে চলি, তবুও যখন বারবার আমরা অনুভব করি যে কিছু একটা যেন

আমাদের উপর আছড়ে পড়ে, তখন আমরা ভেবে আশ্চর্য হই যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের এই বিস্ময়কর নিয়মশৃংখলা কি করে পরমাণু এবং বিদ্যুৎ পরমাণুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিণাম মাত্র হয়ে থাকে। জড় বস্তুর প্রতি অত্যধিক আস্থাযুক্ত হয়ে পড়া সত্ত্বেও মাঝেমধ্যে কিছু একটি আমাদের অদৃশ্য বাস্তব সত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রাতে আমরা নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে তাকাই যা চিরন্তন আলোর মালার মত আকাশকে সাজিয়ে রেখেছে। মুহূর্তের জন্য আমাদের মনে হয় আমরা সবকিছু দেখছি, কিন্তু কিছু একটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আমরা দেখতে পাইনি মহাকর্ষ নিয়মকে যা তাদের সেখানে ধরে রেখেছে। আনন্দের উচ্ছ্বাসে আমরা কোন গীর্জার স্থাপত্য সৌন্দর্য অবলোকন করি, কিন্তু কিছু একটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে গীর্জার সামগ্রিক বাস্তবতা আমাদের দৃষ্টিতে আসে না। যে স্থপতি নকশা তৈরি করেছে তার মনের ভিতরটা আমরা দেখতে পাইনি। যে-সব লোকের আত্মত্যাগের ফলে সৌধ নির্মাণ সম্ভব হয়েছে তাদের প্রেম এবং বিশ্বাস আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আমরা এই দ্রুত সিদ্ধান্তে আসি যে আমাদের বাস্তব শরীর দর্শন হচ্ছে কিনা আমরা যে বিদ্যমান আছি—সকলের এই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। এই যে আপনারা এখন বেদীর দিকে তাকাচেছন এবং আমাকে ধর্মোপদেশ প্রচার করতে দেখছেন, আপনাদের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে আপনারা মার্টিন লুথার কিংকে দেখছেন। কিন্তু আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে আপনারা কেবলমাত্র আমার শরীরটাকে দেখছেন, যেটি তর্ক করতে পারে না, চিন্তা করতে পারে না। আপনারা 'আমাকে' কখনো দেখতে পারেন না, যা আমাকে 'আমি করেছে' এবং আমিও 'আপনাদের' কখনো দেখতে পারি না, যা 'আপনাদের' 'আপনারা' করেছে। সেই অদৃশ্য কিছু যাকে আমরা ব্যক্তিত্ব বলি— তা আমাদের দৈহিক দৃষ্টির অতীত। প্ল্যাটো যথার্থ বলেছেন—দৃষ্ট বস্তু হচ্ছে অদৃষ্ট বাস্তব ছায়া।

ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই তো আছেন। আমাদের নতুন প্রাযুক্তিক এবং বৈজ্ঞানিক উন্নতি ঈশ্বরকে পরমাণুর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চুম্বক বা মহাকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যেকার সীমাহীন অনির্ণেয় ব্যাপ্তি থেকে নির্বাসিত করতে পারে না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেখানে মহাকাশের জ্যোতিষ্কপুঞ্জের দূরত্ব কোটি-কোটি আলোকবর্ষ দ্বারা নির্ণিত হয়ে থাকে, সেখানে বসবাসকারী আধুনিক মানুষ প্রাচীন বাইবেলীয় সঙ্গীত রচয়িতাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে উচ্চকিত কণ্ঠে বলে, "যখন আমি মনে করি মহাকাশ তোমার আঙ্গুলের দ্বারা সৃষ্ট, চন্দ্র এবং তারামণ্ডলকে তুমিই সাজিয়ে রেখেছ, তখন মানুষ এমন কি যে তুমি তার প্রতি মনযোগ দাও? এবং মনুষ্যসন্তান এমন কি যে তুমি তার কাছে আস?"

আমি আপনাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাবো ঈশ্বর-সন্ধানের কাজটিকে অগ্রাধিকার দিতে। ঈশ্বর চিন্তা আপনাদের সত্তাকে অভিষিক্ত করুক। জীবনের যত বাধাবিপত্তি এবং চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হলে ঈশ্বরকে আপনাদের প্রয়োজন হবে। আপনাদের জীবনতরী শেষ বন্দরে পৌঁছবার আগে দেখা দেবে

দীর্ঘসময়ব্যাপী ঝড়ঝঞ্ঝা ও প্রচণ্ড হাওয়ার দৌরাত্ম্য এবং গর্জন এবং বিক্ষুব্ধ সমুদ্র যা হৃদয়কে স্তব্ধ করে দেবে। যদি ঈশ্বরে আপনাদের গভীর এবং স্থির বিশ্বাস না থাকে তবে যে বিলম্ব, নৈরাশ্য এবং ভাগ্যবিপর্যয় অনিবার্যভাবে এসে যাবে, তার সম্মুখীন হওয়ার সামর্থ্য আপনাদের থাকবে না। ঈশ্বর বিনা আমাদের সব চেষ্টা ভস্মে পরিণত হবে, আমাদের সূর্যোদয় অমানিশার অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তিনি ছাড়া জীবন হয়ে পড়বে এক অর্থহীন নাটক যেখানে শেষ পরিণতির দৃশ্যগুলি থাকবে না। কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস নিয়ে যদি থাকি, তা হ'লে উদ্বেগ-উত্তেজনার উপত্যকা থেকে আমরা আন্তর শান্তির মহিমান্বিত শীর্ষে উঠে যেতে পারব এবং জীবনের বিষমতম রাত্রির অন্ধকারের বক্ষ থেকে দেখতে পাব আকাশের তারা থেকে বিচ্ছুরিত আশার আলো। সেন্ট অগাস্টিন যথার্থই বলেছেন, "তুমি তোমার জন্যই আমাদের সৃষ্টি করেছ, এবং যতক্ষণ না আমরা তোমাতে আশ্রয় নিচ্ছি হৃদয় আমাদের শান্ত হবে না।"

জনৈক জ্ঞানী বয়োজ্যেষ্ঠ ধর্মোপদেষ্টা একটি কলেজে গিয়েছিলেন স্নাতক ছাত্রদের কাছে দীক্ষান্ত ভাষণ দিতে। ভাষণের পর তিনি কলেজের চত্বরে স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রদের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। রবার্ট নামক একজন মেধাবী স্নাতক ছাত্রের সঙ্গে তিনি কথা বলছিলেন। রবার্টকে তাঁর প্রথম প্রশ্ন, "তোমার ভবিষ্যতের পরিকল্পনা কি ?" রবার্ট বলল, "আমার ইচ্ছা আইন পড়া।" "তারপর রবার্ট", ধর্মোপদেশক জানতে চাইলেন। রবার্টের উত্তর, "আজ্ঞে, আমি ঠিক করেছি বিয়ে করব, পরিবার পত্তন করব এবং তারপর আইন ব্যবসা শুরু করে পাকাপাকিভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করব।" "তারপর রবার্ট ?", যাজক বলে চললেন। রবার্ট খানিকটা বাঁকাভাবে বলল, "আমি সরাসরি বলতে চাই যে আমার ইচ্ছা ওকালতি করে অনেক টাকা পয়সা রোজগার করব এবং তারপর এই আশা আছে যে আমি বরং কিছু আগেই কাজকর্ম থেকে অবসর নেব এবং পৃথিবীর নানা জায়গায় ভ্রমণ করে আমার বেশির ভাগ সময় কাটাব। এই বিশ্ব ভ্রমণের ইচ্ছা আমি সর্বদাই পোষণ করে আসছি।" অনেকটা বিরক্তিসূচক কৌতূহলের সঙ্গে যাজক জানতে চাইলেন, "তারপর রবার্ট ?" রবরার্ট বললে, "বাস ঐ সবই হ'ল আমার ভবিষ্যতের পরিকল্পনা।" দয়া এবং পিতৃসুলভ কারুণ্যের ভঙ্গিতে রবার্টের দিকে তাকিয়ে যাজক বললেন, "ওহে যুবক, তোমার পরিকল্পনা সব নিতান্তই ক্ষুদ্র। সেগুলো ৭৫ বড় জোর ১০০ বছর পর্যন্ত চলতে পারে। তোমার পরিকল্পনা এমন বড় করে করবে যার মধ্যে ঈশ্বরও অন্তর্ভুক্ত হবেন এবং বিশেষ করে যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে শাশ্বত কাল।"

এটি হ'ল বিচক্ষণ উপদেশ। আমার সন্দেহ তোমাদের অনেকেই অনেক পরিকল্পনা নিয়ে নাড়াচাড়া কর—যেগুলি পরিমাণগতভাবে বড়, কিন্তু গুণগতভাবে ছোট, এমন পরিকল্পনা যা নড়াচড়া করে সীমিত কালের সমতল ভূমিতে, কিন্তু অনন্ত কালের উলম্ব ভূমিতে নয়। আমিও আপনাদের বলব আপনারা

আপনাদের পরিকল্পনাগুলি এমন বড় এবং ব্যাপক করে তৈরি করুন যাতে সেগুলি স্থান-কালের বেড়াজালে আট্‌কে না পড়ে। আপনাদের জীবন, আপনারা যা এবং আপনাদের যা-কিছু আছে সবটা এই নিখিল বিশ্বের অধীশ্বরকে উৎসর্গ করুন যাঁর অভীষ্ট উদ্দেশ্যের কোন হেরফের ঘটে না।

এই ঈশ্বরকে আমরা কোথায় পাব ? টেস্ট্‌টিউবের মধ্যে কি ? না। কেথায় আর যীশুখ্রিস্টের মধ্যে ছাড়া যিনি আমাদের জীবনের প্রভু ? তাঁকে জানলেই ঈশ্বরকে জানা হয়। খ্রিস্ট শুধু ঈশ্বরের মত নয়, ঈশ্বরও খ্রিস্টের মত। খ্রিস্ট শব্দটি রক্তমাংসের শরীর লাভ করেছিল। তিনি হচ্ছেন অনন্ত কালের ভাষা যা সীমিতকালের কথায় ভাষান্তরিত হয়েছে। যদি ঈশ্বর কিরূপ এবং মানুষের সম্পর্কে তাঁর উদ্দেশ্য কি আমাদের জানতে হয়, তাহলে আমাদের খ্রিস্টের শরণ নিতে হবে। এককভাবে খ্রিস্টের এবং তাঁর প্রদর্শিত পথের প্রতি অনুরক্ত হয়ে আমরা সেই বিস্ময়াবহ বিশ্বাসের শামিল হ'ব যা আমাদের কাছে নিয়ে আসবে ঈশ্বর সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানের আলো।

তাহ'লে এ'বিষয়ে কি সিদ্ধান্তে আসা গেল ? নিজেকে ভালবাস, যদি তার অর্থ হয় যুক্তিসিদ্ধ এবং সুস্থ আত্ম-স্বার্থ। তা করার জন্য তুমি আদিষ্ট। সেটিই হচ্ছে জীবনের দৈর্ঘ্য। তোমার নিজের মত করে তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাস, তা করার জন্য তুমি আদিষ্ট। সেটিই হচ্ছে জীবনের প্রস্থ। কিন্তু ভুললে চলবে না যে প্রথম এবং এমনকি মহত্তর প্রত্যাদেশ হচ্ছে, "প্রভুকে—তোমার ঈশ্বরকে—তোমার অন্তর, তোমার সমগ্র সত্তা, তোমার সমগ্র মন দিয়ে ভালবাস।" তাই হচ্ছে জীবনের উচ্চতা। কেবলমাত্র জীবনের এই তিন মাত্রার সবত্ন উন্নয়নের দ্বারা একটি পূর্ণতা-সমৃদ্ধ জীবনের আশা করতে পার।

ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ জনের জন্য, যিনি বহু শতবর্ষ পূর্বে উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন এবং সার্বিক মহিমায় সমুজ্জ্বল নতুন জেরুসালেমকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ঈশ্বর আমাদের এই অনুগ্রহ করুন আমাদের যেন তেমন দৃষ্টিলাভ হয় এবং আমরা অদম্য আবেগ আর আসক্তি নিয়ে সেই পরিপূর্ণ জীবনের রাজ্যের দিকে অগ্রসর হই, যেখানে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা—এই তিন মাত্রা সমভাবে বিরাজ করছে। কেবল সেই রাজ্যে পেঁছে আমরা অস্তিত্বের আসল স্বরূপ জানতে পারব। এই পূর্ণতা প্রাপ্তির দ্বারাই কেবল আমরা ঈশ্বরের সত্যিকারের সন্তান হতে পারব।

মানুষ কি ?

(হোয়াট ইজ্ ম্যান্ ?)

এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির উত্তরের দ্বারা বহুলাংশে নির্ধারিত হয় একটি গোটা সমাজের রাজনৈতিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামো। বস্তুত এক-নায়কতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের মধ্যে যে বিরোধ আমরা দেখতে পাই তা এই গোড়ার প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে ; মানুষ একজন ব্যক্তি, না দাবার বোড়ে ? সে রাষ্ট্র-রথচক্রের একটি খাঁজ, না একজন স্বাধীন সৃজনশীল ব্যক্তি যার দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষমতা আছে ? এই অনুসন্ধিৎসা প্রাচীন মানবের মত পুরনো, আবার সকালের খবরের কাগজের মত নতুন। যদিও এরূপ প্রশ্ন তোলার ব্যাপারে বিস্তর মতৈক্য আছে, তথাপি এর উত্তরের মধ্যে তীব্র মতানৈক্য রয়েছে।

যাঁরা মানুষকে বিশুদ্ধ জড়বাদী দৃষ্টিতে দেখেন, তাঁদের বক্তব্য হ'ল মানুষ একটি প্রাণী মাত্র, বিশাল, সতত পরিবর্তনশীল প্রকৃতি বলে কথিত জৈবজগতের একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু বিশেষ, যে প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে চেতনাহীন এবং নৈর্ব্যক্তিক। চলমান জড় বস্তুর নিরিখে মানুষের জীবনকে ব্যাখ্যা করা যায়। এ জাতীয় চিন্তাধারা থেকে এই প্রত্যয় আসে যে মানুষের আচরণ দৈহিকভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং মনের উৎপত্তি শুধুমাত্র মস্তিষ্ক থেকে।

যাঁরা মানুষ সম্বন্ধে বস্তুতান্ত্রিক ধারণা উপস্থাপিত করেন, তাঁরা নৈরাশ্যের অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষের দিকে চালিত হন। তাঁরা সাম্প্রতিককালের জনৈক লেখকের সঙ্গে এই সহমত পোষণ করেন যে "মানুষ হচ্ছে একটি বিশ্বজাগতিক আকস্মিক ঘটনা, এই গ্রহের উপর একটি দুরারোগ্য ব্যাধি।" অথবা তাঁরা জোনাথন সুইফ্‌টের সঙ্গে একমত যে "মানুষ হচ্ছে জঘন্য কীট মূষিকাদির মধ্যেকার একটি অতিকায় অনিষ্টকারী প্রজাতি যা প্রকৃতির দাক্ষিণ্যেপৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

'মানুষ কি' এই প্রশ্নের আরেকটি উত্তর যা বারংবার দেওয়া হয় তা হ'ল মানবতাবাদ। ঈশ্বরে বা কোন অপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাসী না হয়ে মানবতাবাদীরা এই বক্তব্য রাখেন যে মানুষ হচ্ছে প্রাণ-সত্তার সর্বোত্তম স্বরূপ, অভিব্যক্তির ধারায় প্রাকৃতিক জগতে যার উদ্ভব।

জড়বাদসঞ্জাত দুঃখবাদের বিপরীত ধারায় মানবতাবাদী একটি উজ্জ্বল আশাবাদ তুলে ধরেন এবং শেকস্‌পিয়ারের হ্যামলেটের সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন :

> কি আশ্চর্য সৃষ্টি এই মানুষ ! বিচারবুদ্ধি কত উদার !
> অসীম তার কর্মশক্তি ! গঠনে, গমনে কত সাবলীল, আর
> প্রশংসার্হ ! কর্মে কেমন দেবদূতের মত ! চেতনায়

কেমন দেবদার মত ! জগতের সৌন্দর্য ! প্রাণীকুলে
সর্বোৎকৃষ্ট !

এমন অনেকে আছেন যাঁরা মানুষ সম্বন্ধে খানিকটা বাস্তববোধের পরিচয় দিতে গিয়ে উভয়ের বাড়াবাড়িটুকু ছেড়ে দিয়ে পরস্পরবিরোধী এই দুই মতবাদের সার বাক্যগুলিকে সমন্বিত করার প্রয়াস পান। তাঁদের বক্তব্য এই যে মানুষ সম্বন্ধে আসল সত্যটি পাওয়া যাবে জড়বাদী দুঃখবাদের থিসিসের মধ্যে নয়। আশাবাদী মানবতাবাদের এন্টিথিসিসের মধ্যে নয়, একটি উচ্চতর সিনথিসিসের মধ্যে। মানুষ দুর্বৃত্ত নয়, আদর্শ পুরুষও নয়। সে একই সঙ্গে দুর্বৃত্তও বটে, আদর্শ পুরুষও বটে। বাস্তববাদী কার্লাইলের সাথে তাঁরা এই মত পোষণ করেন যে, 'মানুষের মধ্যে এমন নীচ ভাব আছে যা নিম্নতম নরকে নেমে যেতে পারে, আবার এমন উচ্চ ভাব আছে যা উচ্চতম স্বর্গে উঠে যেতে পারে। কারণ স্বর্গ আর নরক মানুষকে নিয়েই, যে মানুষ চিরন্তন বিস্ময় এবং রহস্য।'

বহু শতাব্দী পূর্বে বাইবেলীয় প্রার্থনাসঙ্গীত রচয়িতা সৌরজগতের অনন্ত ব্যাপ্তির দিকে তাকিয়েছিলেন। তিনি তাকিয়েছিলেন অনিন্দ্যসুন্দর চাঁদ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে। তারা বেশ অনাদিকালের আলোকবর্তিকার ন্যায় মহাকাশে ঝুলন্ত রয়েছে। তিনি যখন এই বিরাট নক্শা এবং অতি বিশাল মহাজাগতিক বিন্যাস অবলোকন করেছিলেন, সেই পুরনো অতি-প্রশ্নটি তখন তাঁর মনে উদয় হয়েছিল— "মানুষ কি ?" তাঁর উত্তর সৃজনশীল সত্যের দ্বারা উজ্জীবিত, "তুমি তাকে ঈশ্বরের থেকে ঈষৎ নতুন করে সৃষ্টি করেছে, এবং তার মাথায় পরিয়েছ গৌরব এবং সম্মানের মুকুট।"

আমরা যখন বাস্তবসম্মত খ্রিষ্টিয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মানুষকে দেখি, তখন তাঁর কথাগুলি আমাদের চিন্তার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

এক

প্রথমত, খ্রিষ্টিয় দৃষ্টিতে মানুষ একটি দেহধারী জৈব সত্তা। এক অর্থে সে একটি প্রাণী। তাই গীতিকার বলেছেন, "তুমি তাকে ঈশ্বর থেকে ঈষৎ ন্যূন করে সৃষ্টি করেছ।" আমরা ঈশ্বরকে দেহধারী বলে ভাবি না। ঈশ্বর হচ্ছেন বিশুদ্ধ চৈতন্যময় সত্তা, স্থানকালের ঊর্ধ্বে। কিন্তু মানুষ ঈশ্বরের চেয়ে ন্যূন বলে স্থান-কালের মধ্যে জড়িত। সে প্রকৃতির মধ্যে আবদ্ধ এবং প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক অস্বীকার করতে পারে না।

গীতিকার বলে চলেছেন—ঈশ্বর মানুষকে সেভাবেই সৃষ্টি করেছেন। যেহেতু এটি সত্য, মানুষের ঈশ্বরসৃষ্ট স্বভাবে আসলে মন্দ কিছু নেই, কারণ 'বুক অভ্ জেনেসিস্' থেকে আমরা জানতে পারি যে ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছেন তাই ভাল। শরীর ধারণের মধ্যে গ্লানিকর কিছু নেই। এই সুনিশ্চিত ঘোষণা অন্যতম বিষয় যা গ্রীক মতবাদের থেকে খ্রিষ্টিয় মতবাদের পার্থক্য সূচিত করে। প্ল্যাটোর প্রভাবে

গ্রীকেরা মনে করত যে দেহ আবশ্যে মন্দ জিনিস এবং আত্মা যতক্ষণ না দেহ কারাগার থেকে মুক্তি পাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করা যাবে না। অপরপক্ষে খ্রিস্টান ধর্মের প্রত্যয় এই যে দেহ নয়, ইচ্ছাই হচ্ছে মন্দত্বের কারণ। খ্রিস্টীয় চিন্তায় দেহের বিশুদ্ধতা এবং গুরুত্ব দুইই আছে।

মানুষ সম্বন্ধে যে কোন বাস্তব সম্মত মতবাদের পরিধির মধ্যে আমাদের চিরকাল তার দৈহিক এবং বৈষয়িক কল্যাণের কথা অবশ্যই ভাবতে হবে। যীশু যখন বলেছিলেন যে মানুষ কেবলমাত্র রুটি দিয়ে বাঁচতে পারে না, তিনি এটি বোঝাতে চাননি যে সে রুটি ছাড়াও বাঁচতে পারে। খ্রিস্টান হিসেবে আমাদের আকাশচুম্বী অট্টালিকার কথা ভাবলে চলবে না, ভাবতে হবে বস্তী এবং খেটোর কথাও, যা মানুষের আত্মাকে পঙ্গু করে দেয়। ভাবলে চলবে না শুধু স্বর্গে যাওয়ার পথের কথা, যেখানে 'দুধ আর মধুর প্লাবন বহে', ভাবতে হবে দুনিয়ার অগণিত মানুষের কথা, যারা রাতে খালি পেটে শুতে যায়। যে-ধর্ম মানুষের আত্মার কথা ভাবে বলে প্রচার করে, অথচ যে সামাজিক অবস্থা আত্মাকে কলুষিত করে, যে অর্থনৈতিক অবস্থা আত্মাকে পঙ্গু করে দেয়, তার কথা ভাবে না, সেই ধর্ম বাজে অ-কেজো ধর্ম, যার ভিতর নতুন রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন আছে। এই ধর্ম বুঝতে পারে না যে মানুষ একটি জীব যার দৈহিক এবং বৈষয়িক চাহিদা আছে।

দুই

কিন্তু আমরা এখানে থেমে যাব না। কোন কোন চিন্তাবিদ মানুষকে একটি জীবের বেশি কিছু কখনো ভাবতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্ক্সবাদীরা দ্বান্দ্বিক জড়বাদ তত্ত্ব অনুসরণ করে বলে থাকেন যে মানুষ একটি উৎপাদনশীল প্রাণীমাত্র যে নিজের প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহের যোগান দেয় এবং যার জীবন প্রধানত অর্থনৈতিক শক্তিগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্যদের বক্তব্য মানুষের সমগ্র জীবন অর্থভিত্তিক জড়বাদী প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

এ'ধরণের হাল্কা কথায় কি মানুষকে ব্যাখ্যা করা যায়? জড়বাদের সূত্রের সাহায্যে কি আমরা শেকস্‌পিয়ারের সাহিত্য প্রতিভা, বিথোভেনের সঙ্গীত প্রতিভা বা মিকেল এঞ্জেলের শিল্প প্রতিভার ব্যাখ্যা করতে পারি? জড়বাদের সূত্র দিয়ে কি আমরা ন্যাজরথের যীশুর অধ্যাত্মপ্রতিভার ব্যাখ্যা দিতে পারি? মানবাত্মার রহস্য ও বিস্ময়ের কি কোন জড়বাদী ব্যাখ্যা চলে? না, কখনই না। মানুষের মধ্যে এমন কিছু একটি আছে যেটিকে রসায়ন বা জীববিজ্ঞানের কোন সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা চলে না, কেননা মানুষ ঘূর্ণায়মান বিদ্যুৎ পরমাণুর ছোটখাটো খেয়ালের চাইতে বেশি কিছু একটা।

এর থেকে আমরা দ্বিতীয় বিষয়ে আসি যা মানুষ সম্বন্ধীয় যে কোন খ্রীষ্টিয় মতবাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। মানুষ এমন একটি প্রাণী যার মনন বা আত্মা

আছে। 'সে তার নিজস্ব ধারণার সিঁড়ি বেয়ে' চিন্তার বিস্ময়কর জগতে এসে পড়ে। বিবেক তার সঙ্গে কথা বলে এবং ঐশী বস্তুর বিষয়ে তাকে অবহিত করে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকার যখন বলেন যে মানুষের মাথায় পরানো হয়েছে গৌরব এবং সম্মানের মুকুট—তাতে তিনি এই সত্যটিই বোঝাতে চান।

এই আত্মিক বৈভব মানুষকে দিয়েছে এক সঙ্গে দুই স্তরে বাস করার অপূর্ব ক্ষমতা। সে প্রকৃতির মধ্যে থেকেও প্রকৃতির উর্ধ্বে উঠেছে। সে স্থান-কাল সীমার মধ্যে থেকেও তার উর্ধ্বে উঠতে পেরেছে। সে সৃজনধর্মী কর্ম করতে পারে, যা নিম্নমানের জীবেরা পারে না। মানুষ একটি কবিতা ভাবতে পারে এবং সেটি লিখতেও পারে; সে একটি মহান সভ্যতার কথা কল্পনা করতে পারে এবং তা সৃষ্টি করতে পারে। এরূপ ক্ষমতা থাকার ফলে সে সম্পূর্ণভাবে স্থান-কালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে না। সে একজন ভাল বুনিয়ান হতে পারে, বেডফোর্ড জেলের স্থানগত সীমানার মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে পারে, যার মন কয়েদখানার অর্গলকে ছাড়িয়ে যায় এবং 'পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেস্' সৃষ্টি করতে পারে। সে একজন হ্যানডেল হতে পারে, যিনি জীবনসায়াহ্নে এসে দৃষ্টিশক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলেন, কিন্তু তাঁর মানসিক দৃষ্টি আকাশ ছুঁয়েছিল এবং তিনি মহান গ্রন্থ 'মেসিয়া'র মনোরম বজ্রনির্ঘোষ এবং শান্ত দীর্ঘশ্বাসের প্রতিলিপি তৈরি করেছিলেন। মানুষ তার বিচারক্ষমতা, স্মরণশক্তি এবং কল্পনার অবদানে স্থান-কালকে অতিক্রম করতে পারে। আকাশের তারার মত মানুষের মন যা তাদের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

মানুষ ঈশ্বরের অবয়বে সৃষ্ট হয়েছে—বাইবেলের এই উক্তির তাৎপর্য এটিই। বিভিন্ন চিন্তাবিদেরা 'ঈশ্বরের অবয়বে সৃষ্ট' এই উক্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন—ভ্রাতৃত্ববোধ, প্রতিবেদনশীলতা, যুক্তি এবং বিবেক হিসেবে। মানুষের স্বাধীনতা হ'ল মানুষের উচ্চতর আধ্যাত্মিক প্রকৃতির স্থিতিশীল প্রকাশ। মানুষ হচ্ছে মানুষ, কেননা আপন নিয়তি বা ভাগ্যের পরিসীমার মধ্যে কাজ করার স্বাধীনতা তার আছে। চিন্তা করার, সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা মানুষের আছে। অন্য প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য এখানে যে তার স্বাধীনতা আছে ভাল কি মন্দ করার, সুন্দর উচ্চমার্গে পথচলার অথবা উৎসন্নে যাওয়ার।

তিন

কৃত্রিমতাজনিত ভ্রান্তির শিকার না হতে হলে এটা বলা দরকার যে আমরা ভুল করব যদি আমরা ধরে নিই যে যেহেতু মানুষ ঈশ্বরের অবয়বে সৃষ্ট, অতএব মূলত মানুষ ভাল, মন্দের প্রতি মানুষের অত্যধিক প্রবণতার জন্য মানুষ ভয়ানকভাবে ঐশ্বরীয় অবয়বকে ক্ষতচিহ্নিত করছে।

মানুষ পাপী এমন কথা বলাকে আমরা ঘৃণা করি। আধুনিক মানুষের

আত্মার প্রতি এমন অবমাননাকর উক্তি আর নেই। মানুষের পাপের ব্যাখ্যা করতে আমরা বেপরোয়াভাবে অন্য কথা খোঁজার চেষ্টা করি—স্বভাবের ভ্রম, সদ্গুণের অভাব, মানসিক ভ্রান্ত ধারণা। অচেতন মনঃপ্রকৃতি সমীক্ষণের নিরিখে পাপকে আমরা আন্তর বিরোধ, নিষেধাত্মক-প্রবৃত্তি অথবা অদস্ এবং অধিশাস্তার সংঘর্ষজনিত ফলাফল বলে বাতিল করে দেওয়ার চেষ্টা করি। এ'সমস্ত ধারণা আমাদের শুধু মনে করিয়ে দেয় যে সর্বগ্রাসী মানবপ্রকৃতি একটি মর্মান্তিক, ত্রি-মাত্রিক বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে যার ফলে মানুষ নিজের থেকে, তার প্রতিবেশীদের থেকে এবং তার ঈশ্বরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মানুষের ইচ্ছার মধ্যে নীতি-হীনতা রয়েছে।

যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে পরীক্ষার জন্য নিজেদের উন্মুক্ত করে দিই, আমরা স্বীকার করি যে যদিও আমরা সত্য কি বস্তু জানি, তথাপি মিথ্যার আশ্রয় নিই; কি করে ন্যায়পরায়ণ হতে হয় জানি, তবুও অন্যায় কাজ করি; জানি আমাদের অন্যকে ভালোবাসা উচিত, তবুও হিংসা করি। উচ্চ মার্গের সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে আছি, তবুও ইচ্ছাকৃতভাবে অধঃপাতের পথ বেছে নিই। "আমরা সকলে বিপথ-গামী ভেড়ার মত।"

সামষ্টিক জীবনে মানুষের পাপশক্তি এমন বিপর্যয়কর স্তরে নেমেছে যে রেইনহোল্ড্ নাইয়েবুর 'ময়্যাল্ ম্যান্ এণ্ড্ ইম্-ময়্যাল্ সোসাইটি' এই নামে একটি বই লিখতে প্ররোচিত হয়েছেন। মানুষ দল, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় এবং জাতির মধ্যে থেকে যূথবদ্ধ বর্বরতার এমন স্তরে নেমে যায় যা নিম্নতর প্রাণীদের বেলায়ও কল্পনা করা যায় না। এই নীতিহীন অসৎ সমাজের ভয়াবহ প্রকাশ আমরা দেখতে পাই 'শ্বেতকায়-শ্রেষ্ঠত্ব' মতবাদের মধ্যে, যা লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণকায় মানুষকে শোষণের গহ্বরে ঠেলে দিয়েছে এবং নিয়ে এসেছে ভয়ঙ্কর দু'টি মহা-যুদ্ধ যা যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছে, জাতীয় ঋণ পর্বত প্রমাণ করেছে, মানুষকে মনের দিক থেকে বিপর্যস্ত, দৈহিক দিক থেকে পঙ্গু করে দিয়েছে, বিধবা এবং অনাথ শিশুর জাতিসমূহ (ন্যাশনস্) সৃষ্টি করেছে। পাপীতাপীর প্রয়োজন ঈশ্বরের ক্ষমাযুক্ত করুণা। এটি অবক্ষয়ী নৈরাশ্যবাদ নয়; এটি হচ্ছে খ্রিস্টিয় বাস্তববাদ।

মানুষের নীচু এবং নিকৃষ্ট স্তরে বাস করার প্রবণতা সত্ত্বেও কিছু একটি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে ওই জন্যে তার সৃষ্টি হয়নি। ধূলিময় পথে তাকে কিছু একটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে আকাশের নক্ষত্রের জন্যই তার সৃষ্টি। যখন সে তার শয্যাসঙ্গিনীকে নিয়ে বোকার মত কাজ করে, একটি আন্তর কণ্ঠধ্বনি তাকে ভর্ৎসনার সুরে বলে শাশ্বত কালের জন্য সে জন্মেছে। আমাদের উপর ঈশ্বরের নিরবচ্ছিন্ন প্রভাব হচ্ছে এমন কিছু যা আমাদের অন্যায়কে ন্যায় এবং অস্বাভা-বিককে স্বাভাবিক বলে ভাবতে দেবে না।

যীশু একজন যুবকের গল্প বলেছিলেন যে বাড়ী ছেড়ে দূরে দেশে ঘুরে বেড়াত এবং একটানা দুঃসাহসিক উত্তেজনার মধ্যে জীবনের সার্থকতা খুঁজত। কিন্তু সে

তা কোনদিন পায়নি ; তার ভাগ্যে জুটেছিল কেবল হতাশা এবং বিভ্রান্তি। পিতৃগৃহ থেকে যতই দূরে যেতে থাকল, ততই সে নৈরাশ্যে গৃহের নিকটতর হতে থাকে। সে যা চায় তা যতই করতে থাকল, ততই সে যা করল তা তার পছন্দ-মাফিক হ'ল না। এই উড়নচণ্ডে যুবকের পথযাত্রা তাকে সব পেয়েছির দেশে নিয়ে গেল না, বরং নিয়ে গেল শূয়োরের আস্তানায়। এই নীতিগর্ভ রূপক কাহিনী চিরকাল এই ব্যাপারটি মনে করিয়ে দেবে যে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে পরম পিতার গৃহে অবস্থানের জন্য, এবং দূরদেশে প্রতিটি ভ্রমণই শেষ পর্যন্ত নিয়ে আসে হতাশা এবং ঘরে ফেরার আকুলতা।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এই রূপক কাহিনী আমাদের আরও অধিক কিছু বলে। উড়নচণ্ডে ছেলেটি আত্মসচেতন ছিল না, যখন সে পিতৃগৃহ ছেড়ে যায় বা যখন ভেবেছিল যে সুখই জীবনের পরম কাঙ্ক্ষিত বস্তু। কেবলমাত্র যখনই সে ঘরে ফেরার জন্য এবং বাপের ছেলেটি হয়ে থাকার জন্য মনস্থির করল, তখনই প্রকৃতপক্ষে সে নিজেকে ফিরে পেল। সেখানে সে দেখল একজন স্নেহশীল পিতা প্রসারিত বাহু এবং বুকভরা অব্যক্ত আনন্দ নিয়ে অপেক্ষা করছে। আত্মা যখন তার আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, তখন সেখানে সর্বদা বিরাজ করে অপার আনন্দ।

মানুষ ধর্মহীনতা, জড়বাদ, যৌনতা এবং জাতিগত অন্যায়ের রাজ্যে ছিটকে গিয়ে পড়ছে। তার এই গমন পশ্চিমী সভ্যতায় এনেছে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক দুর্ভিক্ষ। কিন্তু এখনও ঘরে ফেরার সময় আছে।

স্বর্গস্থিত পিতা আজ পশ্চিমী সভ্যতাকে ডাক দিয়ে বলছেন : "দূর দূরান্তের ঔপনিবেশিক দেশসমূহে ১৬০ কোটি অশ্বেতকায় ভাইয়েরা আজ নৈতিকভাবে পদদলিত, অর্থনৈতিকভাবে শোষিত এবং আপন মূল্যচেতনা থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। নিজের সম্বন্ধে সচেতন হও, ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃত্বের পরিবেশে তোমার আপন ঘরে ফিরে এস এবং আমি তোমাকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করব।" সমান ত্বরার সংগে ঈশ্বর আমেরিকাকে বলছেন : "জাতিপৃথকীকরণ এবং জাতিগত বৈষম্যের দূরদেশে তুমি তোমার ১৯ মিলিয়ন নিগ্রো ভাইদের উপর উৎপীড়ন চালাচ্ছ, অর্থনৈতিক শৃংখলে তাদের বেঁধে রেখেছ এবং তাদের ঘেটোর মধ্যে হাটিয়ে দিয়েছ এবং তুমি তাদের আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদা হরণ করেছ এবং তাদের এটা ভাবতে শিখিয়েছ যে তারা যেন কেউ নয়। ফিরে এস তোমার আপন ঘরে যেখানে আছে গণতন্ত্র, ভ্রাতৃত্ব এবং ঐশ্বরিক পিতৃত্ব, এবং আমি তোমাকে গ্রহণ করব এবং তোমাকে সত্যিকারের মহান জাতি হওয়ার সুযোগ দেব।"

ব্যক্তি হিসাবে এবং বিশ্ব হিসাবে আমরা যেন এই সত্য উপলব্ধি করি যে যা উচ্চ, মহৎ এবং মঙ্গলময় তার জন্যই আমাদের সৃষ্টি হয়েছে এবং আমাদের আসল আবাস হচ্ছে ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে। আমরা যেন সেই পথেই চলি যা আমাদের নিয়ে যাবে প্রাচুর্যময় জীবনের দিকে।

প্রতিটি মানুষের কাছে খোলা আছে
একটি পথ, এবং বহু পথ, এবং একটি পথ,

মহান আত্মা উচ্চ মার্গে উঠে যায়,
পতিত আত্মা নিম্ন মার্গে হাতড়ে বেড়ায়,
এবং মাঝখানে রয়েছে কুয়াশাবৃত সমভূমি,
অবশিষ্টেরা এখানে ঘূরপাক খায়।
কিন্তু প্রতিটি মানুষের কাছে
খোলা আছে
উচ্চমার্গ এবং নিম্ন মার্গ,
এবং প্রতিটি মানুষকে বেছে নিতে হবে
আত্মা তার কোন পথে যাবে।

ঈশ্বর এই অনুগ্রহ করুন যেন আমরা উচ্চ মার্গকেই বেছে নিই এবং যেন আমরা প্রত্যেক স্থলে এবং সর্বকালে এমন মানুষ বলে পরিচিত হই, যাদের মস্তকে রয়েছে গৌরব এবং সম্মানের শিরোভূষণ।

একজন খ্রিষ্টান সাম্যবাদকে কি দৃষ্টিতে দেখেন ?

(হাউ শুড্ এ্যা খ্রিশ্চিয়ান্ ভিউ কম্যুনিজম্)

সাম্যবাদের মত এমন কম বিষয় আছে যা বিস্তৃত এবং সংযত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। প্রত্যেক খ্রিস্টীয় যাজকের অন্তত তিনটি কারণে তাঁর লোকজনদের কাছে এই বিতর্কিত বিষয়টির উপর বক্তব্য রাখার জন্য নিজেকে দায়বদ্ধ বলে ভাবা উচিত।

প্রথম কারণ, এটি স্বীকৃত ঘটনা যে একটি জোয়ার স্রোতের মত সাম্যবাদ রাশিয়া, চীন, পূর্ব-ইউরোপ এবং এমনকি বর্তমানে আমাদের গোলার্ধে পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে, তামাম দুনিয়ার প্রায় এক’শ কোটি মানুষ সাম্যবাদী শিক্ষায় বিশ্বাসী, অনেকে এটিকে নতুন ধর্ম বলে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং এর কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছে। এমন একটি শক্তিকে উপেক্ষা করা চলে না।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে সাম্যবাদ খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাসের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী। ইহুদী-ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুধর্ম এবং ইসলাম ধর্মের মত বিশ্বের বড় বড় ধর্মসমূহ খ্রিস্টান ধর্মের বিকল্প হতে পারে, কিন্তু আধুনিক জগতের কঠিন বাস্তব সম্বন্ধে অবহিত কোন ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারবেন না যে খ্রিস্টান ধর্মের দুর্দান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে সাম্যবাদ।

তৃতীয় কারণ হচ্ছে কোন একটি মতবাদ কি শিক্ষা দেয় এবং কেন তা মন্দ, তা জানার আগে সেই মতবাদের নিন্দা করা অনুচিত এবং নিশ্চিতভাবে অবৈজ্ঞানিক।

এই ধর্মোপদেশাত্মক বক্তৃতার মূলগত প্রত্যয়টি কি তা আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই : সাম্যবাদ এবং খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে কোন মৌলিক সুসংগতি নেই। একজন সাচ্চা খ্রিস্টান সাচ্চা সাম্যবাদী হতে পারে না, কারণ এদের দর্শন মূলত পরস্পর বিরোধী এবং নৈয়ায়িকদের তর্কশাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার দ্বারা এই দুই দর্শনের সমন্বয় করা যাবে না। কেন এটি সত্যি ?

এক

প্রথমত, সাম্যবাদ জীবন এবং ইতিহাস সম্পর্কে জড়বাদী এবং মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত। সাম্যবাদ এই তত্ত্ব প্রচার করে যে মন বা আত্মা নয়, জড় বস্তুই হচ্ছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শেষ কথা। এই দর্শন প্রকাশ্যতই অনাধ্যাত্মিক এবং নিরীশ্বরবাদী। এই তত্ত্ব অনুসারে ঈশ্বর একটি উদ্ভট কল্পনামাত্র, ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে ভয় এবং অজ্ঞতা থেকে, এবং গীর্জা হচ্ছে শাসকশ্রেণীর আবিষ্কার যার দ্বারা জনগণের উপর কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেওয়া যায়। তাছাড়া মানবতাবাদের মত সাম্যবাদও স্ফূর্তিলাভ এই চটকদার ভ্রান্ত ধারণাকে আশ্রয় করে যে ভগবদ্ শক্তির সহায়তা বিনা মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে এবং একটি নতুন সমাজের পত্তন করতে পারে :

একা আমি যুঝি, জিতি বা ডুবিয়া যাই,
চাইনে কাউকে আমার মুক্তি-তরে,
আমার জন্য যীশুও ভাবুক—এ নাহি চাই,
চাইনে'ক সেও আমার জন্য মরে।

সাম্যবাদ হচ্ছে জড়বাদের পোষাকে আবৃত নিরুত্তাপ নিরীশ্বরবাদ এবং তাতে ঈশ্বর বা খ্রিস্টের কোন স্থান নেই।

খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এই সুদৃঢ় প্রত্যয় যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আছেন একজন ঈশ্বর যিনি সমস্ত বস্তুর ভিত্তি এবং সার। অনন্ত প্রেম এবং অসীম শক্তির আধার ঈশ্বর হচ্ছেন স্রষ্টা, ধারক এবং মূল্যবোধের রক্ষক। সাম্যবাদের নাস্তিক জড়বাদের বিপরীত খ্রিস্টান ধর্ম একটি আস্তিক ভাববাদকে সত্য বলে মেনে নেয়। চলমান জড়বস্তু বা অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের টানাপোড়েনের দ্বারা বাস্তব সত্যের ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। খ্রিস্টান ধর্মের সোচ্চার বক্তব্য এই যে বাস্তবের কেন্দ্র বিন্দুতে হৃদয় বলে একটি কিছু আছে, আছেন একজন পরম পিতা—যিনি ইতিহাসের মাধ্যমে কাজ করে চলেছেন তাঁর সন্তানদের মুক্তির জন্য। মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, কেননা মানুষকে দিয়ে সব কিছুর পরিমাপ করা যায় না এবং মানবসত্তা ঈশ্বর নয়। নিজের পাপ এবং সীমাবদ্ধতার নাগপাশে আবদ্ধ মানুষের প্রয়োজন আছে একজন মুক্তিদাতার।

দ্বিতীয়ত, সাম্যবাদ নৈতিক অপেক্ষবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে কোন সুস্থিত নৈতিক সার্বভৌমত্বকে গ্রহণ করে না। শ্রেণী সংগ্রামের মোকাবিলায় ভাল এবং মন্দ উপায়কে সুবিধাজনক কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। উদ্দেশ্য উপায়ের নিয়ামক এই ভয়ঙ্কর দর্শনকে সাম্যবাদ কাজে লাগায়। সাম্যবাদ মর্মস্পর্শী ভাষায় শ্রেণীহীন সমাজের তত্ত্ব ঘোষণা করে, কিন্তু হায়! এই মহৎ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রায় সময় জঘন্য উপায় অবলম্বন করে। মিথ্যাচার, হিংসা, খুনখারাপি এবং নির্যাতনকে স্বর্ণযুগের লক্ষ্যে পৌঁছানোর ন্যায়ানুমোদিত উপায় বলে মনে করে। এই অভিযোগ কি অন্যায্য এবং পক্ষপাতদুষ্ট? সাম্যবাদ তত্ত্বের প্রকৃত কুশলী প্রয়োগকর্তা লেনিনের কথা শুনুন: "কূটকৌশল, প্রতারণা, আইনভঙ্গ, সত্যকে ঠেকিয়ে রাখা এবং সত্যগোপন ইত্যাদি প্রয়োগ করার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।" আধুনিক ইতিহাস বহু কুটিল রাত্রি এবং আতঙ্কপূর্ণ দিনের মধ্য দিয়ে গেছে, তাঁর অনুগামীরা তাঁর এই বক্তব্যটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে বলে।

সাম্যবাদের নৈতিক অপেক্ষবাদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানধর্ম চূড়ান্ত নৈতিক মূল্য-ভিত্তিক একটি বিধিব্যবস্থা প্রচার করে এবং এই বক্তব্য রাখে যে ঈশ্বর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কাঠামোর মধ্যে এমন সব নৈতিক বিধি স্থাপন করেছেন যা স্থির এবং অপরিবর্তনীয়। মানুষের সব কাজকর্মের আদর্শ হচ্ছে একান্ত প্রয়োজনীয় 'প্রেম-ধর্ম'। তদুপরি বিশুদ্ধ খৃস্টধর্ম 'উদ্দেশ্য উপায়ের নিয়ামক' এই দর্শন নিয়ে চলতে চায় না। ধ্বংসাত্মক উপায় রচনাত্মক উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হবে, কেননা

উপায়ের মধ্যে নিহিত থাকে—আদর্শ রূপায়নের প্রকৃত এবং উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রগমণ। নীতিবিগর্হিত উপায় নৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে না, কেননা লক্ষ্য উপায়ের মধ্যে পূর্বাহ্নে বিদ্যমান থাকে।

তৃতীয়ত, সাম্যবাদ চূড়ান্ত মূল্যে রাষ্ট্রকে অভিষিক্ত করে। মানুষ রাষ্ট্রের জন্য, রাষ্ট্র মানুষের জন্য নয়। কেউ কেউ এই বলে আপত্তি তুলতে পারে যে সাম্যবাদ অন্বে রাষ্ট্র একটি 'অন্তবর্তীকালীন বাস্তব ব্যবস্থা যা শ্রেণীহীন সমাজের উদ্ভবের সংগে সংগে বিলুপ্ত হয়ে যাবে'। তত্ত্বগতভাবে এটি সত্য ; কিন্তু এও সত্য যে যত দিন রাষ্ট্র আছে, ততদিন রাষ্ট্রই হচ্ছে লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য সাধনে মানুষ হচ্ছে উপায় মাত্র। ছেড়ে দেওয়া অসাধ্য এমন কোন অধিকার মানুষের নেই, তার শুধু আছে সেইসব অধিকার যা রাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত। এমন একটি ব্যবস্থায় স্বাধীনতার উৎস শুকিয়ে যায়। মানুষের ইচ্ছামত সংবাদ পাওয়া এবং দেওয়ার এবং সমবেত হওয়ার স্বাধীনতা, তার ভোটাধিকার প্রয়োগের স্বাধীনতা এবং তার ইচ্ছামত কিছু শোনার এবং পড়ার স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়েছে। শিল্পকলা, 'ধর্ম', শিক্ষা, সংগীত এবং বিজ্ঞান কঠোর সরকারী কর্তৃত্বের অধীন হয়ে পড়েছে। মানুষকে হতে হবে সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের কর্তব্যপরায়ণ ভৃত্য মাত্র।

এ'সব কিছু শুধু ঐশ্বরীয় নীতির বিরোধী নয়, মানুষের খ্রিষ্টীয় মূল্যায়নেরও বিরোধী। খ্রিষ্ট ধর্মের দৃঢ় প্রত্যয় চরম এবং শেষ লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে মানুষ, কারণ মানুষ ঈশ্বরের সন্তান এবং ঈশ্বরের অবয়বে তার সৃষ্টি। মানুষ অর্থনৈতিক শক্তির দ্বারা চালিত উৎপাদনশীল জীবের চাইতে বেশি কিছু। সে আত্মসত্তা বিশিষ্ট জীব, গৌরব এবং সম্মানে মুকুট ধারণ করে আছে এবং সহজাত স্বাধীনতায় সমৃদ্ধ। সাম্যবাদের চরম দুর্বলতা এখানে যে সাম্যবাদ মানুষের সেই গুণ বা বৈশিষ্ট্য হরণ করেছে যা তাকে মানুষ করে তোলে। পল্ তিল্লিচ্ বলেছেন—মানুষ মনুষ্যপদবাচ্য, কেননা সে স্বাধীন। এই স্বাধীনতার প্রকাশ তার বিচার-বিবেচনার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং প্রতিক্রিয়ান্বিত হওয়ার ক্ষমতার মাধ্যমে। সাম্যবাদের আওতায় মানুষের ব্যক্তিসত্তা অনুরূপতার শৃংখলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে ; তার আত্মাকে দলীয় আনুগত্যের হাতকড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়। তার বিবেক ও বিচারবুদ্ধির বিলুপ্তি ঘটানো হয়। সাম্যবাদ নিয়ে বিপদ এখানে যে এর কোন ধর্মতত্ত্ব বা খ্রিষ্টীয় ধর্মদর্শনশাস্ত্র বলতে কিছু নেই ; কাজেই এটি আবির্ভূত হয় একটি তালগোল পাকানো নৃতত্ত্ব নিয়ে। ঈশ্বর সম্বন্ধে বিভ্রান্ত বলে সাম্যবাদ মানুষ সম্বন্ধেও বিভ্রান্ত। জনগণের কল্যাণ বিষয়ে প্রখর উক্তি সত্ত্বেও সাম্যবাদের কার্যপ্রণালী এবং দর্শন মানুষের মর্যাদা এবং মূল্য কেড়ে নিয়েছে। ফলে মানুষ ব্যক্তিত্বহারা হয়ে ঘূর্ণায়মান রাষ্ট্রচক্রের খাঁজে পরিণত হয়েছে।

স্পষ্টতই এ'সব কিছু খ্রিষ্টীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতিহীন, আমরা

নিজেদের বোকা বানাতে পারি না। ঐ সকল চিন্তাধারা এতই পরস্পরবিরোধী যে তাদের মধ্যে সমন্বয় ঘটতে পারে না। তারা পুরোপুরি উল্টোভাবে জগৎকে দেখে এবং জগতের রূপান্তর ঘটানোর কথা ভাবে। খ্রিস্টান হিসাবে আমরা প্রতিনিয়ত সাম্যবাদীদের জন্য প্রার্থনা করব, কিন্তু সাচ্চা খ্রিস্টান হিসাবে কখনও সাম্যবাদের দর্শনকে মেনে নিতে পারব না।

অপিচ সাম্যবাদের মূলনীতি ও ভীতিপ্রদর্শনের মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমাদের চ্যালেঞ্জ করে। প্রয়াত ক্যাণ্টারবেরির আর্চবিশপ উইলিয়াম টেম্পল্‌ সাম্যবাদকে ধর্মবিরুদ্ধ বিশ্বাস বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে সাম্যবাদ কিছু সত্যকে আঁকড়ে ধরে—যেগুলি খ্রিস্টীয় দৃষ্টিভঙ্গির অপরিহার্য অংশ, যদিও সেগুলির সংগে জড়িয়ে আছে এমন সব তত্ত্ব এবং প্রয়োগবিধি যা কোন খ্রিস্টান কদাপি গ্রহণ করতে পারে না।

দুই

সাম্যবাদের তত্ত্ব, নিশ্চিতভাবে প্রয়োগবিধি যদিও নয়, সামাজিক ন্যায়বিচার সম্বন্ধে আরো সচেতন হওয়ার আহ্বান জানায়। যতসব মিথ্যা অনুমান এবং মন্দ কার্য সাধন প্রণালী নিয়ে সাম্যবাদের উদ্ভব হয়েছে অন্যায়-অবিচারের এবং সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত মানুষের উপর অপমানের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ, 'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো' লিখেছিলেন সামাজিক ন্যায়-বিচারের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত লোকেরা। কার্ল মার্ক্স ছিলেন ইহুদী পিতা মাতার সন্তান, যাঁরা উভয়েই ছিলেন যাজক বংশোদ্ভব। নিশ্চয় হিব্রুশাস্ত্র তাঁকে পড়ানো হয়েছিল। তাই তিনি আমোজের এই কথাগুলি ভুলতে পারেননি : "জলের ধারার মত সুবিচার নেমে আসুক, এবং ন্যায়পরাণতা ব'য়ে চলুক প্রবল স্রোতস্বিনীর মত।" মার্ক্স যখন ছ' বছরের শিশু, তখন তাঁর পিতামাতা খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন, ফলে ওল্ড্‌ টেস্টামেণ্টের উত্তরাধিকারের সংগে যুক্ত হ'ল নিউ টেস্টামেণ্টের উত্তরাধিকার। তাঁর পরবর্তী কালের নাস্তিকতা এবং চার্চ্‌ বিরোধিকতা সত্ত্বেও নিম্নতম স্তরের মানুষদের জন্য যীশুর দরদভরা চিন্তাভাবনার কথা মার্ক্স ভুলতে পারেননি। তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে তিনি দরিদ্র শোষিত এবং বঞ্চিত মানুষদের পক্ষ সমর্থন করেছেন।

তত্ত্বগতভাবে সাম্যবাদ শ্রেণীহীন সমাজের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। যদিও দুঃখজনক অভিজ্ঞতার মধ্যে দুনিয়ার মানুষ জানে সাম্যবাদ নতুন শ্রেণীসমূহ সৃষ্টি করেছে এবং অন্যায়-অবিচারের নতুন অভিধান তৈরি করেছে, তবুও তাত্ত্বিক সূত্রের মধ্যে এমন এক বিশ্বসমাজের স্বপ্ন দেখে যা জাতিগত, বর্ণগত, শ্রেণীগত এবং গোষ্ঠীগত কৃত্রিমতাকে অতিক্রম করে। তত্ত্বগতভাবে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য-পদ মানুষের চামড়ার রঙ্‌ বা ধমনীতে প্রবাহিত রক্তের গুণাগুণের দ্বারা স্থিরীকৃত হয় না।

সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য যে-কোন আন্তরিক অভীপ্সাকে খ্রিস্টানদের

অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে। এই অভিপ্সা 'ঈশ্বর পিতা এবং মানুষ ভ্রাতা'—এই খ্রিষ্টীয় নীতিবোধের মূলে নিহিত আছে। দরিদ্রের কল্যাণ-বিষয়ক উক্তিতে ধর্মোপদেশমালা পরিপূর্ণ। ম্যাগ্নিফিক্যাটের কথা শুনুন, "তিনি শক্তিমানদের স্থানচ্যুত করেছেন, এবং হীন, দুর্বলদের তাদের স্থলে উন্নীত করেছেন; তিনি ক্ষুধার্তদের পেটপুরে ভাল খাইয়েছেন, এবং ধনীদের খালি পেটে দূর করে দিয়েছেন।" কোন কট্টর কম্যুনিস্ট দরিদ্র এবং নিপীড়িতদের জন্য এমন আগ্রহ প্রকাশ করেনি যা আমরা দেখি যীশুর ম্যানিফেস্টোর মধ্যে যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে: "ঈশ্বরের আত্মা আমার উপর বর্তেছে, কেননা তিনি আমাকে তাঁর প্রতিনিধি করেছেন দরিদ্রদের কাছে তাঁর ধর্মোপদেশ প্রচার করতে, আমাকে পাঠিয়েছেন ভগ্নহৃদয়দের পুনরুজ্জীবিত করতে, বন্দীদের কাছে মুক্তির বাণী পৌঁছে দিতে, এবং অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি দান করতে।"

খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের অবশ্য কর্তব্য বিশ্বমৈত্রীকে স্বীকৃতি দেওয়া, যেখানে জাতি এবং ধর্মের প্রাচীর লুপ্ত হয়ে যাবে। খ্রিষ্টধর্ম-জাতিবৈষম্য প্রত্যাখ্যান করে। গস্পেলের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থিত উদার বিশ্বজনীনতার নিরিখে তত্ত্বে এবং ব্যবহারিক প্রয়োগে জাতিবৈষম্যগত অবিচার নৈতিক দিক থেকে আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। খ্রিষ্টের মধ্যে আমাদের যে ঐক্যবন্ধন রয়েছে জাতিবিদ্বেষ তার সোচ্চার অস্বীকৃতি, কেননা, খ্রিষ্টের মধ্যে ইহুদী বা অ-ইহুদী, দাস বা স্বাধীন, নিগ্রো বা শ্বেতাঙ্গ বলে আলাদা কিছু নেই।

খ্রিষ্টধর্মের এই সুমহান ঘোষ বলী সত্ত্বেও চার্চ অনেক সময় ন্যায় নিয়ে আগ্রহ দেখায় না এবং প্রায়ই ভাল ভাল অপ্রাসঙ্গিক বুলি আওড়িয়ে ও তুচ্ছ বিষয়ে পবিত্রতার ভান দেখিয়ে তুষ্ট থাকে। চার্চ দূর ভবিষ্যতের কল্যাণের ব্যাপারে এত নিবিষ্ট থাকে যে এখানকার বর্তমান মন্দ অবস্থার কথা বেমালুম ভুলে যায়। যাহোক চার্চের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানানো হচ্ছে সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে যীশুর ধর্মোপদেশকে প্রাসঙ্গিক করে তোলার জন্যে। আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে যে খ্রিষ্টীয় ধর্মোপদেশ হচ্ছে দ্বিমুখী পথ। এক দিকে এটি চায় মানবাত্মার পরিবর্তন সাধনের মধ্য দিয়ে একে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করতে, অপর-দিকে চায় মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে যাতে পরিবর্তিত আত্মা একটি সুযোগ পায়। যে-ধর্ম মানুষের আত্মার বিষয়ে ভাবে, অথচ যে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা মানুষকে পঙ্গু করে রাখে তার সম্বন্ধে ভাবিত হয় না, তেমন ধর্মকেই মার্ক্সবাদীরা 'মানুষের জন্য আফিং' বলে বর্ণনা করেছে।

সততার তাগিদেও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে জাতিগত ন্যায়বিচারের প্রশ্নে চার্চ তার সামাজিক ব্রতপালনে ব্যর্থ হয়েছে। এক্ষেত্রে চার্চ খ্রিষ্টকে শোচনীয়-ভাবে ব্যর্থ করে দিয়েছে। এই ব্যর্থতার কারণ শুধু এই নয় যে চার্চ জাতিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনকভাবে নীরব এবং বিপজ্জনকভাবে উদাসীন রয়েছে,

কিন্তু তার চাইতে বড় কারণ জাতি-গোষ্ঠী ব্যবস্থার রূপায়ণে এবং স্পষ্টীকরণে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ঔপনিবেশিকতাবাদ চালু থাকত না যদি চার্চ তার বিরুদ্ধে দাঁড়াত। দক্ষিণ আফ্রিকায় হিংস্র জাতিপৃথকীকরণ ব্যবস্থার একটি বড় সমর্থক হচ্ছে ডাচ্ রিফর্মড্ প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ। চার্চের অনুমোদন না পেলে আমেরিকায় দাসত্বপ্রথা প্রায় আড়াইশত বৎসর টিকে থাকত না, অথবা আজকের দিনের জাতিপৃথকীকরণ এবং বৈষম্যমূলক আচরণ বজায় থাকত না যদি চার্চ এ বিষয়ে নীরব না থাকত এবং অনেক সময় এর সোচ্চার অংশীদার না হ'ত। আমাদের এই লজ্জাকর ব্যাপারের মুখোমুখি হতেই হবে যে আমেরিকার সমাজে প্রধানতম পৃথকীকৃত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে চার্চ, এবং অধ্যাপক লিস্টন পোপ যেমন বলেছেন, সপ্তাহের সবচেয়ে পৃথকীকৃত সময় হচ্ছে রবিবারের সকাল ১১টা। কত সময় চার্চ ধ্বনি না হয়ে প্রতিধ্বনি হয়ে পড়ে, সুপ্রিম কোর্ট এবং অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ সংস্থাসমূহের পশ্চাদ্‌ভাগের বাতি, কিন্তু পুরোভাগের আলোক-বর্তিকা নয়, যার দ্বারা মানুষকে উন্নততর সমঝোতার স্তরে ক্রমশ এবং নিশ্চিত-ভাবে নিয়ে যেতে পারে।

ঈশ্বরের বিচার চার্চের উপর নেমে এসেছে। চার্চের নিজের আত্মায় চিড় ধরেছে, যেটিকে তার বন্ধ করে দিতেই হবে। ইতিহাসের এটি হবে অন্যতম ট্র্যাজেডি যদি ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকেরা লেখেন যে বিংশ শতাব্দীর চূড়ান্ত পর্যায়ে শ্বেতাঙ্গ সার্বভৌমত্বের বৃহত্তম দুর্গপ্রাচীর ছিল কিনা চার্চ।

তিন

কম্যুনিস্ট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে প্রথাগত পুঁজিবাদের দুর্বলতা কি কি আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সত্যের খাতিরে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে পুঁজিবাদ প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ এবং নিরতিশয় দারিদ্র্যের মধ্যে একটি দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছে যেখানে জনা কয়েক মানুষকে বিলাস-ব্যসনে রাখার জন্য বহু মানুষের থেকে জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় বস্তু কেড়ে নিয়েছে, ক্ষুদ্র-মনের লোকদের সহানুভূতিহীন এবং বিবেকবর্জিত হতে উৎসাহিত করেছে যার ফলে তারা দারিদ্র্য-পীড়িত মনুষ্য সমাজের দুঃখদুর্দশায় অবিচলিত থাকে। যদিও সমাজ-সংস্কারের মাধ্যমে আমেরিকার পুঁজিবাদ এই প্রবণতাকে কিছু পরিমাণে লাঘব করেছে, তবুও এখনো অনেক কিছু করার আছে। ঈশ্বরের এই ইচ্ছা যে তাঁর সব সন্তান অর্থপূর্ণ এবং স্বাস্থ্যপূর্ণ জীবনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ পাবে। নিশ্চয়ই এটি একান্ত-ভাবে অখ্রিষ্টীয় এবং অনৈতিক যে কিছু মানুষ বিলাস-ব্যসনে গড়াগড়ি দেবে আর অন্যেরা দারিদ্র্যের চোরাবালিতে ডুবে যাবে।

মুনাফা লোটার মনোবৃত্তি, যা হচ্ছে অর্থনৈতিক বিন্যাসের ভিত্তি, মারমুখী প্রতিযোগিতা এবং স্বার্থান্বেষী উচ্চাশাকে উৎসাহ দেয়, তার ফলে মানুষ জীবনের

চাইতে জীবিকাকে নিয়েই বেশি ব্যাপৃত থাকে। এটি মানুষকে এমন 'আমি' কেন্দ্রিক করে তোলে যে তারা আর 'তুমি' কেন্দ্রিক থাকে না। আমাদের সাফল্য যাচাই করার ঝোঁক আমাদের বেতনের পরিমাণ এবং আমাদের মোটর গাড়ীর চাকার মাপের নিরিখে, কাজের গুণাগুণ এবং মনুষ্য সমাজের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে নয়। তাই নয় কি ? পুঁজিবাদ ব্যবহারিক জড়বাদের দিকে নিয়ে যেতে পারে যা সাম্যবাদের তাত্ত্বিক জড়বাদের মতই সমান অনিষ্টকর।

আমাদের সততার সঙ্গে মেনে নিতে হবে যে সত্যকে প্রথাগত পুঁজিবাদ বা মার্ক্সবাদের মধ্যে পাওয়া যাবে না। দু'টির প্রত্যেকটির মধ্যে আছে আংশিক সত্য। ঐতিহাসিক দিক থেকে পুঁজিবাদ সামষ্টিক উদ্যোগের মধ্যে এবং মার্ক্সবাদ ব্যক্তিগত উদ্যেগের মধ্যে সত্যকে দেখতে পায়নি। উনিশ শতকের পুঁজিবাদ অনুধাবন করতে পারেনি যে জীবন হচ্ছে সামাজিক এবং মার্ক্সবাদ ধরতে পারেনি এবং এখনো পারছে না যে জীবন ব্যক্তিত্ব-কেন্দ্রিক এবং সামাজিক। ঈশ্বরের রাজ্য ব্যক্তিগত উদ্যোগের থীসিস্ নয়, কিংবা সমষ্টিগত উদ্যোগের এ্যান্টি-থীসিস্ নয়, তা হচ্ছে সিন্থীসিস যা উভয়ের সত্যকে সমন্বিত করে।

চার

সবশেষে আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ এসেছে খ্রিষ্টের উদ্দিষ্ট কাজে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার, যেমন সাম্যবাদের জন্য করে থাকে। আমরা যারা সাম্যবাদীদের মতবাদ গ্রহণ করি না, যে আদর্শ তাদের বিশ্বাস, একটি উৎকৃষ্ট বিশ্ব সৃষ্টি করবে, সেই আদর্শের জন্য তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং দায়বদ্ধতাকে আমরা স্বীকার করি। তাদের উদ্দেশ্যবোধ এবং পরিণাম সচেতনতা আছে এবং তারা অন্যদের সাম্যবাদের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য পরিশ্রম এবং আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে। ক'জন খ্রিষ্টান খ্রিষ্টের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করার কথা ভাবে ? প্রায়শ আমাদের খ্রিষ্টের সম্পর্কে প্রবল আগ্রহ এবং তাঁর রাজ্যের জন্য রুচি বা উৎসাহ নেই। কারণ অনেক খ্রিষ্টানের কাছে খ্রিষ্টধর্ম একটি রবিবাসরীয় ব্যাপার মাত্র, যেটির কাছে সোমবারের কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই এবং গীর্জা ধার্মিকতার পাতলা আবরণের আড়ালে একটি লোকায়ত সামাজিক সংঘের বেশি আর কিছু নয়। যীশু হচ্ছেন একটি প্রাচীন প্রতীক মাত্র, যাঁকে শ্রদ্ধাভরে খ্রিষ্ট বলে থাকি। অথচ প্রভু আমাদের অসার জীবনে গৃহীত বা স্বীকৃত নন। কত ভালই না হত খ্রিষ্টীয় আগুন খ্রিষ্টধর্মীদের বুকের মধ্যে যদি তেমনভাবে জ্বলত, যেমন সাম্যবাদের আগুন সাম্যবাদীদের বুকের মধ্যে জ্বলে! সাম্যবাদ পৃথিবীতে বেঁচে আছে আমরা যথেষ্ট পরিমাণ খ্রিষ্টান নয় বলেই কি ?

খ্রিষ্টের আদর্শের প্রতি আজ আমাদের নতুন করে আনুগত্যের শপথ নিতে হবে। পুরোনো দিনের গীর্জার সত্তাকে আমাদের আবার আরম্ভ করতে হবে। প্রাচীনকালের খ্রিষ্টানেরা যেখানে গেছেন, সেখানে তাঁরা খ্রিষ্টের বিজয়বার্তা বহন

করে নিয়ে গেছেন। গ্রামের পথে থাকুন, কিংবা কয়েদখানায় থাকুন, তাঁরা সাহসের সঙ্গে গস্‌পেলের শুভ বার্তা প্রচার করে গেছেন। অসমসাহসিকতার সঙ্গে এই বাণী বহন করে নিয়ে যাবার জন্য সিংহের গুহায় প্রবেশ করার বা হাঁড়িকাঠে গর্দান যাওয়ার মত ভয়ংকর যন্ত্রণাময় মৃত্যু ছিল তাঁদের পুরস্কার কিন্তু তাঁরা এই বিশ্বাসে অটল ছিলেন যে তাঁরা এমন একটি মহৎ আদর্শের সন্ধান পেয়েছেন এবং একজন ঐশ্বরিক মুক্তিদাতার দ্বারা বিবর্তিত হয়েছেন যার ফলে এমনকি মৃত্যুও তেমন বড় আত্মোৎসর্গ নয়। যখন তাঁরা কোন নগরে প্রবেশ করেছেন, সেখানকার শাসকবর্গ বিচলিত হয়েছে। তাঁদের ধর্মোপদেশ, যে সব মানুষদের জীবন ঐতিহ্য-ধর্মিতার হিমশীতল আবহাওয়ায় জমে শক্ত হয়ে গিয়েছিল, সেই সব মানুষদের কাছে বসন্তের তেজোদ্দীপক উষ্ণতা নিয়ে এসেছিল। তাঁরা মানুষের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন প্রাচীন অন্যায্য বিধিব্যবস্থা এবং নীতিহীন সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে। শাসকবৃন্দ যখন প্রতিবাদ জানালো, তখন এই অদ্ভুত লোকগুলি মদিরায় নেশাগ্রস্ত ভগবদ্‌ করুণার ধর্মোপদেশ প্রচার করেই চললেন, এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না সিজার পরিবারের নারীপুরুষদের বিশ্বাস উৎপাদন হ'ল, কারারক্ষীরা কারাগারের চাবি ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং রাজারা রাজারাজড়ার সিংহাসনের উপর কম্পিত হলেন। টি. আর্‌. গ্লভার লিখেছেন : প্রাচীন যুগের খ্রিস্টানেরা চিন্তনে, জীবনে, মৃত্যুতে অন্য যে কোন লোককে ছাড়িয়ে গেছেন।

সে'ধরণের উৎসাহ-উদ্দীপনা আজ কোথায়? সে'রকমের সাহস, খ্রিস্টের প্রতি দুর্ধর্ষ বৈপ্লবিক দায়বদ্ধতা আজ কোথায়? এটিকে কি লুকিয়ে রাখা হয়েছে ধোঁয়াটে পর্দা এবং বেদীর আড়ালে? এটিকে কি সম্মানীয়তা এবং ভদ্র আচরণ বলে কথিত কবরে সমাহিত করা হবে? এটি কি নামহীন স্থিতাবস্থার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ এবং অচল প্রথাসর্বস্বতার রুদ্ধ কক্ষে বন্দী? আমাদের জীবনে খ্রিস্টকে আরেকবার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

সাম্যবাদের বিরুদ্ধে এটিই হবে আমাদের আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা। যুদ্ধ এর উত্তর নেই। আনবিক বোমা বা পারমানবিক অস্ত্র দিয়ে কখনো সাম্যবাদকে পরাজিত করা যাবে না। যারা 'যুদ্ধ যুদ্ধ' বলে শোরগোল তোলে এবং যারা অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধ বা আবেগের বশে যুক্তরাষ্ট্রকে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে বেরিয়ে আসতে বলে, আমরা তাদের দলে নেই। এই হচ্ছে সময় যখন খ্রিস্টানদের বিজ্ঞোচিত সংযম এবং শান্ত বিচার-বুদ্ধির আশ্রয় নিতে হবে। আজকের এই উত্তাপ অশান্ত দিনের সমস্যাবলীর সমাধান বিদ্বেষ এবং মৃগীরোগের মত আচরণের মধ্যে পাওয়া যাবে না—এ'কথা যাঁরা বলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই সাম্যবাদী বা আপোষকামী, এটি আমরা আদৌ বলব না। নেতিবাচক সাম্যবাদ বিরোধিতায় আমরা মেতে উঠব না, বরং ন্যায়বিচার এবং ন্যায়পরায়ণতার সপক্ষে আগ্রাসী কর্মসূচী নিয়ে গণতন্ত্রের দিকে সুস্পষ্টভাবে জোর কদমে এগিয়ে যাওয়াই হচ্ছে সাম্যবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে

বড় প্রতিরোধ। সাম্যবাদী দর্শনের সোচ্চার নিন্দার পর দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা, অন্যায়-অবিচার এবং জাতিবৈষম্যগত অবস্থার অবসানের জন্য আমাদের সুস্পষ্ট কর্মসূচী নিতে হবে, যে অবস্থা হচ্ছে কিনা উর্বর ভূমি যেখানে সাম্যবাদের বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং বেড়ে ওঠে। সাম্যবাদ কেবল তখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করে যখন সব সুযোগসুবিধার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং মানুষের আশা-আকাঙ্কার শ্বাসরোধ করা হয়। পূর্বতন খ্রিষ্টানদের মত আমাদের মাঝে মাঝে শত্রুভাবাপন্ন জগতে নিশ্চিতভাবে ঢুকে পড়তে হবে যিশুখ্রিষ্টের বিপ্লবাত্মক গস্পেলের দ্বারা সজ্জিত হয়ে। এই শক্তিশালী উপদেশমালা দিয়ে আমরা স্থিতাবস্থা এবং অন্যায্য রীতিনীতিকে চ্যালেঞ্জ জানাবো এবং এর দ্বারা সেদিনটিকে এগিয়ে নিয়ে আসব যখন "প্রত্যেকটি উপত্যকাকে উঁচু করা হবে এবং প্রত্যেকটি পর্বতকে নীচু করা হবে; কুটিলকে সরল করা হবে; অসমতল স্থানকে সমতল করা হবে; এবং প্রভুর মহিমাকে প্রকাশ করা হবে।"

আমাদের কাছে কঠিন চ্যালেঞ্জ এবং মহান সুযোগ এসেছে খ্রিষ্টের নীতি এবং মননের সমর্থনে এবং ভিত্তিতে একটি প্রকৃত খ্রিষ্টীয় বিশ্ব গড়ে তোলার। যদি আমরা শ্রদ্ধা এবং সাহসের সঙ্গে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারি, তবে সাম্য-বাদের জন্য ইতিহাসের শেষ ঘণ্টা বেজে উঠবে এবং আমরা বিশ্বকে গণতন্ত্রের জন্য নিরাপদ এবং খ্রিষ্টের অনুগামী মানুষদের জন্য নিশ্চিত করতে পারব।

যুবসমাজ এবং সামাজিক কর্মকাণ্ড

(ইয়ুথ্ অ্যাণ্ড্ সোশ্যাল অ্যাক্শন্)

পল গুড্ম্যান যখন ১৯৬০ সালে তাঁর 'গ্রোয়িং আপ্ অ্যাবসার্ড্' বইটি প্রকাশ করেন, তখন তিনি সমকালীন যুব সমাজের উপর সমসাময়িক সমাজের আত্মিক শূন্যতার সর্বনাশা প্রভাবের বর্ণনা দিয়ে জনসাধারণকে চমকে দিয়েছিলেন। এখন অনেক বছর পরে, যা ভীতিপ্রদ তা আত্মিক শূন্যতা নয়, তা হ'ল আত্মিক অশুভ শক্তি।

আজকের দিনে আমেরিকার যুবকেরা একটি যুদ্ধে এশিয়ার জঙ্গলে লড়াই করছে, মরছে এবং মারছে, সে-যুদ্ধের উদ্দেশ্য এত ব্যর্থবোধক যে সমগ্র জাতিই প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে। তাদের বলা হচ্ছে তাদের এই আত্মত্যাগ গণতন্ত্রের জন্য, কিন্তু তাদের মিত্রপক্ষ সায়গান সরকার হচ্ছে গণতন্ত্রের উপহাস এবং আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিকেরা নিজেরা কখনো গণতন্ত্রের স্বাদ পায়নি।

যখন যুদ্ধ বিদেশে যুবকদের গ্রাস করছে, তখন স্বদেশের সহরের, দাঙ্গা-হাঙ্গামা কৃষ্ণাঙ্গ যুবকদের সৈন্য বাহিনী এবং রক্ষীদলের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত করেছে, কেননা জাতিগত এবং অর্থনৈতিক অবিচার মানুষের সহ্যশক্তিকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। মধ্য এবং উচ্চমধ্য শ্রেণী ঐশ্বর্যে উপ্‌চে পড়ছে, অন্য দিকে তিন কোটির উপর আমেরিকাবাসী দারিদ্র্যের নিগড়ে বন্দী হয়ে আছে এবং দক্ষিণের গ্রামাঞ্চলের মানুষ একরকম অনশনে দিন কাটাচ্ছে।

সমাজের প্রতি স্তরে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে গিয়েছে। এক দিকে যেমন রোগের প্রতিকার হচ্ছে এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটছে, অন্যদিকে তেমনি জনসাধারণের মধ্যে মাদকদ্রব্য সেবন এবং মদ্যপান মহামারীর আকার ধারণ করেছে।

সমাজ থেকে তরুণ এবং যুবকদের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়াটা এক অভূতপূর্ব স্তরে এসে গেছে এবং স্বেচ্ছা নির্বাসিত মানুষ দলে দলে বেরিয়ে পড়ছে উদ্দেশ্যহীন এবং বোধহীন আধুনিক যাযাবরের মত।

এই প্রজন্মের লোকেরা একটি ঠাণ্ডা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, শুধু পূর্ববর্তী প্রজন্মের লোকদের সঙ্গে নয়, সমাজের মূল্যবোধের সঙ্গেও। এটি স্বাধীনতার সন্ধানে যুবসমাজের পরিচিত তথা স্বাভাবিক প্রতিবাদ নয়। এর মধ্যে আছে নতুন ধরনের তিক্ত বিরোধিতা এবং বিভ্রান্তি থেকে উদ্ভূত ক্রোধ, যার মানে মৌলিক ইস্যুগুলির বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা হচ্ছে।

এ'সমস্ত হালচাল, মতিগতি অভূতপূর্ব, কারণ এই প্রজন্মের লোকেরা অভূতপূর্ব অবস্থার মধ্যে জন্মেছে এবং বড় হয়েছে।

বিগত পঁচিশ বছরের মধ্যে যাদের জন্ম হয়েছে, তাদের ঠিক ঠিক বোঝা যাবে না যদি না আমরা স্মরণ করি যে তারা এই সময়-সীমার মধ্যে চার-চারটি যুদ্ধের

যারা প্রভাবিত অবস্থার মধ্যে বাস করেছে : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, "ঠাণ্ডা লড়াই", কোরীয় যুদ্ধ এবং ভিয়েতনাম। আমেরিকার আর কোন প্রজন্মের যুবকদের কাছে অতি দূর থেকেও এমন যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা প্রকটিত হয়নি, যা হয়েছে বর্তমান কালের যুবকদের কাছে। অবশ্য আত্মিক এবং দৈহিক দিক থেকে এটি যতই সাংঘাতিক হোক না কেন, সমকালীন অভিজ্ঞতায় এটিই কিন্তু শেষ কথা নয়। এটি প্রথম প্রজন্ম যা বেড়ে উঠেছে পারমানবিক বোমার যুগে এবং এও জানায় বাকী নেই যে, হয়ত মানবজাতির এটিই হবে শেষ প্রজন্ম।

এটি শুধু যুদ্ধের প্রজন্ম নয়, কিন্তু এই প্রজন্ম সেই যুদ্ধের যার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটতে যাচ্ছে। এই প্রজন্মের লোকদের আত্মগোপনের বা নিরাপদ আশ্রয়ের কোন স্থান নেই।

এ'সমস্ত অশুভ ব্যাপার যুক্তিকে ভীষণভাবে নাড়া দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। অবশ্য এ'গুলি সব নয়, এ'সব কিছু হচ্ছে সেই মৌল ছাঁচের অংশসমূহ যার মধ্যে বর্তমান প্রজন্মের চরিত্র এবং অভিজ্ঞতা গড়ে উঠেছে। এই অশুভ ঝড়ঝঞ্জার মধ্যে নিহিত আছে সেই সব বয়স্ক মানুষদের প্রশ্নের উত্তর, যারা জানতে চায় এই সব যুবসমাজ কেন এত দুর্বোধ্য, এত বিচ্ছিন্ন এবং প্রায়শ এত খেয়ালী, আজকের যুবজনের কাছে শান্তি এবং সামাজিক স্থৈর্য পুরনো দিনের বীরব্রতীদের কাজের মত অবাস্তব এবং বহু দূরবর্তী।

তাদের কালের বিশেষ সামাজিক শক্তিগুলির ঘাতপ্রতিঘাতে যুবকেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, যদিও তিনটিই পরস্পরের মধ্যে কিছুটা অংশত আবৃত।

যুবকদের বৃহত্তম শ্রেণীটি প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আমাদের সমাজের বর্তমান মূল্যবোধের সঙ্গে খাপখাইয়ে নিতে। বিশেষ কোন প্রকার উৎসাহ না দেখিয়ে তারা সরকারী কাঠামো, সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেকার অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং তজ্জনিত সামাজিক স্তর বিন্যাসকে মেনে নেয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তারা ভয়ানকভাবে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী এবং স্থিতাবস্থার কঠোর সমালোচক।

বৃহত্তম এই শ্রেণীতে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি দানা বাঁধেনি, স্থিরীকৃত হয়নি ; তা রয়ে গেছে তরল এবং সন্ধানী। যদিও সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ভিয়েতনাম যুদ্ধ হচ্ছে চিন্তাভাবনার কেন্দ্রবিন্দু, বেশির ভাগ লোক সৈন্যদলে ভর্তি করানো ঠেকাতে পারে না, অথবা হিংসা এবং অহিংসার বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিতে পারে না ; কিন্তু যুদ্ধের বিভীষিকা এবং উন্মত্ততা, জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার আত্যন্তিক প্রয়োজনীয়তা এবং আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর সমাধানের উপায়রূপে যুদ্ধকে পরিহার করার অনিশ্চতা সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী যে মনোভাব গড়ে উঠেছে তা তাদের বিবেককে স্পর্শ করে। তারা যুদ্ধকে গৌরব-ব্যঞ্জক কিছু বলে মনে না করলেও এবং আমেরিকার যুদ্ধবিষয়ক চালচলন সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্থ হলেও, এই অধিক সংখ্যক লোকের দল বৃহত্তর সমাজের বিভ্রান্তিকর মনোভাব প্রকাশ করে। ওই বৃহত্তর সমাজ বিবেকের সংক্রমণগত

অবস্থার মধ্যে আটকে গেছে এবং ধীরে ধীরে এই উপলব্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যে মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে যুদ্ধের কোনরূপ যৌক্তিকতা নেই।

দ্বিতীয় এক শ্রেণীর যুবক আছে যারা হচ্ছে কিনা আমূল-সংস্কারপন্থী। সমাজব্যবস্থায় যে-পরিমাণ পরিবর্তন তারা চায়, সেই হিসাবে নরমপন্থী থেকে উগ্রপন্থী এই দুই প্রান্তসীমার মাঝামাঝিতে তাদের অবস্থান। তারা সকলেই এই বিষয়ে একমত যে কেবলমাত্র কাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান মন্দ ব্যবস্থার অপসারণ সম্ভব, কেননা যা কিছু মন্দ তার মূল রয়েছে সমাজব্যবস্থার মধ্যে, মানুষের মধ্যে বা যুক্তিযুক্ত কার্য সম্পাদনের মধ্যে নয়। এরা হচ্ছে নতুন প্রজাতির আমূল সংস্কারবাদী। এদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক কোন প্রতিষ্ঠিত মতবাদ অনুসরণ করে। কেউ পুরনো বৈপ্লবিক নীতি অনুকরণ করে; কিন্তু কার্যত সকলেই নতুন সমাজ কি ধরনের হবে সে সম্বন্ধে কোন সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে আসেনি। তারা সক্রিয়ভাবে প্রাচীন মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, কিন্তু নতুন মূল্যবোধের স্বরূপ কি হবে সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট বক্তব্য রাখেনি। তারা পুরনো বৈপ্লবিক মতবাদগুলির পুনরাবৃত্তি করে না; তাদের অনেকে এমনকি উচ্চাঙ্গের বৈপ্লবিক রচনাবলীও পড়ে দেখেনি। হাস্যকর ব্যাপার হ'ল, বর্তমান সমাজকাঠামোর মধ্যে পরিবর্তন সন্ধান করতে গিয়ে তারা হতাশ হয়েছে এবং হতাশাই তাদের বিদ্রোহী করে তুলেছে। তারা জাতিগত সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল এবং তাতে কঠিন এবং প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়। তারা ভিয়েতনাম যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটানোর জন্য কাজ করে এবং তাতে ব্যর্থ হয়। সুতরাং একটি নতুন ব্যবস্থার মধ্যে নতুন নিয়মকানুন নিয়ে নতুনভাবে কাজ করার প্রয়াস পায়। যথার্থই বলা চলে যে তারা কি চায় তার চাইতে তারা কি চায় না এখন তারা সেটাই জানে। তাদের আমূল-সংস্কারবাদী মতবাদ প্রসার লাভ করেছে, কেননা আজ ক্ষমতার কাঠামো দৃঢ়তার সঙ্গে সমাজব্যবস্থাকে তো বটেই, এমনকি সে ব্যবস্থার যা কিছু মন্দ রয়েছে তাকে রক্ষা করে চলেছে; সুতরাং স্বভাবতই বিরোধিতা জোরদার হচ্ছে।

হিংসার সমস্যার প্রতি এই আমূল-সংস্কারবাদী দলের মনোভাব কিরূপ? এক কথায়, মিশ্র; আজকের দিনে যুবা বয়সের আমূল-সংস্কারবাদীরা আছে যারা শান্তিবাদী, এবং অন্যান্যেরা আছে যারা হচ্ছে আরাম কেদারায় আসীন বিপ্লবী, যারা মনে করে রাজনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে হিংসার প্রয়োজন আছে। হিংসার সমর্থক এই যুব তাত্ত্বিকেরা আলাপ-আলোচনার প্রক্রিয়ার প্রতি ব্যাপক অবজ্ঞা প্রকাশ করে এবং 'সংগ্রামের মুখোমুখি হওয়ার' কৌশলের সপক্ষে সমর্থন জানায়; তারা গেরিলা আন্দোলনকে বিশেষ করে এর নতুন শহীদ চে গুয়েভারাকে গৌরবের আসনে বসায়; এবং বিপ্লব চেতনা এবং রক্তপাত ঘটানোর দ্রুত প্রস্তুতিকে এক করে দেখে। কিন্তু এই যে হিংসার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত বর্ণচ্ছটা যা র‍্যাডিক্যালদের মধ্যে দেখা যায়, তার মধ্যে কোন প্রকার যোগসূত্র আছে কি? আমি মনে করি আছে। র‍্যাডিক্যালরা গান্ধী বা ফ্রানজ্ ফ্যাননের লেখা পড়ুক বা না

পড়ুক, তাদের সবাই কাজে নেমে পড়ার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে—এই প্রত্যক্ষ কর্মযজ্ঞ নিজেদের রূপান্তর এবং সমাজকাঠামোর রূপান্তরের জন্য। এটিই হচ্ছে তাদের সৃজনধর্মী সমষ্টিগত অন্তর্দৃষ্টি।

তৃতীয় দলের যুবকবৃন্দকে বলা হয়ে থাকে 'হি পি'। বিগত দিনের 'বীটনিক'-দের পঙ্‌ক্তিতে এরা দাঁড়িয়ে আছে দেখা যায়। হিপিরা কেবল আমুদে নয়, জটিলও বটে এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের উগ্র চালচলনের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় অনুভূতিপ্রবণ যুবকদের উপর সমাজের মন্দবস্তুগুলির নেতিবাচক প্রভাব। কিছু কিছু বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও যারা এই দলের সংগে যুক্ত তাদের জীবনদর্শন একটিই। তারা সমাজ থেকে নিজেদের বিযুক্ত করার জন্য কঠোর চেষ্টা চালাচ্ছে এ'কথাটি প্রকাশ করতে যে তারা সমাজকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সংগঠিত সমাজের প্রতি সব দায়দায়িত্ব তারা অস্বীকার করে। আমূল-সংস্কারবাদীদের মত তারা পরিবর্তন চায় না, তারা চায় পালাতে। যখন মাঝে মধ্যে তারা শান্তি বিক্ষোভে যোগ দেয়, তারা তা করে রাজনৈতিক জগৎকে উন্নততর করার জন্য নয়, নিজেদের জগৎটা কি তা প্রকাশ করার জন্য। উগ্র হিপি একটি উল্লেখযোগ্য স্ব-বিরোধিতা। সে মাদকদ্রব্য সেবন করে অন্তর্মুখী হতে, বাস্তবতা থেকে সরে থাকতে শান্তি এবং নিরাপত্তা খুঁজতে। তা সত্ত্বেও সে প্রেমকে সর্বোচ্চ মানবিক মূল্য বলে মনে করে—যে প্রেমের অবস্থিতি মানুষের সংগে মানুষের যোগসাধনের মধ্যে, ব্যক্তির সর্বাত্মক একাকীত্বের মধ্যে নয়।

হিপিদের গুরুত্ব তাদের প্রথাবিরুদ্ধ আচরণের মধ্যে নেই, কিন্তু আছে এই বাস্তব সত্যের মধ্যে যে লক্ষ লক্ষ তরুণ এবং যুবকদের বাস্তবতা থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টার মধ্যে রয়েছে যে সমাজ থেকে তারা উঠে এসেছে, সেই সমাজের উপর তাদের নিদারুণ অবজ্ঞাসূচক বিচার। আমাদের মনে হয় হিপিরা একটি গণ-সংগঠন বা গোষ্ঠী হিসাবে বেশিদিন টিকবে না। তারা টিকবে না, কেননা পলায়নের মধ্যে সমাধান নেই। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক একটি ধর্মনিরপেক্ষ সম্প্রদায়রূপে স্থিতি লাভ করতে পারে; তাদের আন্দোলনের ভিতর ইতিমধ্যে এরূপ অনেক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আমরা হয়ত এও দেখতে পারি যে তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক কল্পনাবিলাসী উপনিবেশ (ইউটোপিয়ান কলোনিস্)-সমূহ স্থাপন করেছে, যেমন ১৭শ / ১৮শ শতকে এক ধরনের কিছু সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেইসব উপদলের দ্বারা যারা তৎকালীন সমাজবিন্যাস এবং মূল্যবোধের বিরোধী ছিল। ওই সব সমাজ টেকেনি। কিন্তু ঐগুলি তাদের সমসাময়িক মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এজন্য যে তাদের সামাজিক ন্যায়বিচার এবং মানবিক মূল্যবোধের স্বপ্ন এখনো মানব জাতির স্বপ্নরূপে বিদ্যমান আছে।

এই প্রসংগে উল্লেখ্য যে হিপিদলের একটি স্বপ্ন খুবই অর্থবহ এবং সেটি হচ্ছে শান্তির স্বপ্ন। হিপিদের অধিকাংশ হচ্ছে শান্তিবাদী এবং কয়েকজন বিশ্বে শান্তি স্থাপনের জন্য প্রত্যয় উৎপাদনকারী এবং তারা আধুনিক মনস্তত্ত্ব সম্মত কৌশল অবলম্বনের পথে অগ্রসর হওয়ার কথা ভেবেছে, এক বা দুই শতাব্দী পূর্বের চেয়ে

আজকের সমাজ বেশি প্রস্তুত সেই স্বপ্ন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে, শান্তির সপক্ষে বক্তৃতা শুনতে, স্বপ্ন বলে নয়, একটি বাস্তব সম্ভাবনা বলে, অর্থাৎ এমন কিছু যা বেছে নেওয়া যায় এবং কাজে লাগানো যায়।

আমাদের যুবসমাজের এই তিন মুখ্য দলের উপর ক্ষিপ্র পর্যবেক্ষণের মধ্যে এটি সম্পষ্টভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এই প্রজন্ম বেশ কিছুটা উত্তেজিত। এমনকি বৃহত্তম দলটি যা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি, একটি মৌল প্রশ্ন উত্থাপন করছে এবং এর অস্থিরতা আমাদের বুঝিয়ে দেয় কেন আমূল-সংস্কারবাদীদের এই ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ এবং কেন হিপিরা সুসংবদ্ধভাবে নিজেদের সরিয়ে নেয়।

স্থিতাবস্থার প্রবল অনুভূতিসম্পন্ন সমর্থকেরা যখন এ'সব নিন্দা এবং চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে তর্ক করে, তারা সাধারণত আমাদের সমাজের বিস্ময়কর প্রাযুক্তিক উন্নতির দৃষ্টান্ত তুলে ধরে। যাহোক ওটি আমাদের আত্মিক দীনতাই প্রকাশ করে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে কম্পিউটার-মনযন্ত্র ২য় মাপের বহুমুখী সুযোগসুবিধাগুলি, বিশাল নগরসমূহ যা প্রাকৃতিক ভূচিত্রকে গিলে ফেলেছে এবং মেঘমালাকে বিদীর্ণ করেছে, বিমান সকল যা সময়ের গতিকেও অনেকটা হার মানিয়েছে—এগুলি ভীতসন্ত্রস্ত করে ঠিক, কিন্তু কোন আধ্যাত্মিক প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারে না। আমাদের যুবকদের প্রযুক্তির মধ্যে এমন কিছু নেই যা নতুন উচ্চভূমিতে উঠিয়ে নিতে পারে, কেননা বস্তুগত উন্নতিকেই একটি লক্ষ্য বানানো হয়েছে এবং একটি নৈতিক লক্ষ্যের অভাবে মানুষের সৃষ্টি যত বড় হচ্ছে মানুষ নিজে তত ছোট হয়ে যাচ্ছে।

প্রাযুক্তিক বিপ্লবের অপর একটি বিকার হচ্ছে এই যে দেশে গণতন্ত্রকে জোরদার করার পরিবর্তে এটি তার নাড়ীভুঁড়ি বের করে ফেলার কাজে সাহায্য করছে। বৃহদাকার শিল্প এবং সরকার কম্পিউটার প্রভাবিত জটিল যান্ত্রিকতায় জড়িয়ে পড়ে ব্যক্তি-মানুষকে বাইরে ফেলে রাখে। কাজে অংশগ্রহণের চেতনা লুপ্ত হয়ে যায়। সাধারণ মানুষের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে কোন প্রভাব বিস্তার করে—এই অনুভব অন্তর্হিত হয় এবং মানুষ বিচ্ছিন্ন এবং খর্ব হয়ে পড়ে।

যখন কোন ব্যক্তি কোন কাজের ব্যাপারে আর সত্যিকারের অংশগ্রহণকারী হয়ে থাকে না, যখন সে সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে আর সচেতন থাকে না, তখন গণতন্ত্রের সারবস্তু শূন্যে পরিণত হয়। যখন সংস্কৃতির অবনমন ঘটে এবং ইতর ভাঁড়ামির হয় জয়জয়কার ; যখন সমাজব্যবস্থা নিরাপত্তা গড়ে তুলতে পারে না, কিন্তু বিপত্তি ডেকে আনে, তখন ব্যক্তিমানুষ অনিবার্যভাবে একটি আত্মসত্তাবিহীন সমাজ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই প্রক্রিয়া বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়—এই বিচ্ছিন্নতাই সম্ভবত সমসাময়িক সমাজের সবচেয়ে বেশি ব্যাপক এবং জঘন্যতম অবস্থা।

বিচ্ছিন্নতা আমাদের যুবসমাজের মধ্যে শুধু সীমাবদ্ধ নয়, এটি তাদের মধ্যে অত্যধিক প্রবল হয়ে উঠেছে। অথচ বিচ্ছিন্নতাবোধ যুবকদের স্বভাব-বিরুদ্ধ

হওয়া উচিত। মানুষের বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন সংহতি এবং বিশ্বাস। বিচ্ছিন্নতা হচ্ছে এক ধরণের জীবন্ত মৃত্যু। হতাশা হচ্ছে অ্যাসিডের মত যা সমাজকে দ্রবীভূত করে দেয়।

এখন পর্যন্ত আমি গত পঁচিশ বছরের ইতিহাসে বিয়োগান্তক উপাদানসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছি. যে-সময়কার অবস্থার মধ্যে আজকের যুবকেরা টিঁকে আছে। কিন্তু অন্য একটি দিকও কি আছে? সেই পঁচিশ বছরের মধ্যে কি এমন শক্তি রয়েছে যা এই বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়াকে উল্টে দিতে পারত? ওই পঁচিশটি বছরের মধ্যে আমাদের এখন ফিরে যেতে হবে সেইসব প্রত্যক্ষ উপাদানসমূহের সন্ধানে যেগুলি আছে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাতভাবে।

প্রযুক্তিবিদ্যার তুঙ্গে অবস্থিতি সত্ত্বেও সব সময়ে একটি শক্তি উচ্চতর মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কঠোরভাবে সক্রিয় রয়েছে। বর্তমান কালের কোন মন্দ বস্তুই বিনা বাধায় উত্থিত হয়নি, বা বিনা প্রতিরোধে টিঁকে থাকতে পারছে না।

পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সৈনিকদের সঙ্গে থেকে জল্লাদের কাজটি করেছে ম্যাকার্থিজম্। কয়েক বছর ধরে এটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করেছে, মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে গলা টিপে মেরেছে এবং ভীতিপ্রদর্শনের দ্বারা উদারনৈতিক এবং আমূল-সংস্কারবাদীদের শুধু নয়, এমন কি উচ্চ এবং সংরক্ষিত স্থানে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের উপরও এক বিবর্ণ নীরবতা চাপিয়ে দিয়েছে। অতি অল্প সংখ্যক মানুষ সমাজ থেকে বহিস্করণ, কুৎসা এবং জীবিকা থেকে বঞ্চিত হওয়া অগ্রাহ্য করে প্রতিরোধ চালিয়ে গেছে। ক্রমে ক্রমে ব্যথা বেদনার মধ্য দিয়ে আমেরিকাবাসীদের গণতান্ত্রিক প্রেরণা জেগে উঠেছিল, আদর্শবাদের মোড়কে আবৃত পাশব শক্তির পরাজয় ঘটেছিল।

যা হোক ম্যাকার্থিজম্ সামাজিক পঙ্গুত্বের এক উত্তরাধিকার রেখে যায়। পরবর্তী বছরগুলিতে ভীতির প্রকোপ অব্যাহত ছিল এবং সমাজসংস্কার বাধাপ্রাপ্ত হয় ও আত্মরক্ষামূলক হয়ে পড়েছিল। একটি বশ্যতা এবং ভীতির পরিবেশ যুবক, বৃদ্ধ সকলের মধ্যে এমন একটি মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করেছিল যার ফলে তারা মধ্যম শ্রেণীর মানুষের সাধারণত্ব এবং প্রথাগত ব্যবস্থাকে বড় এবং মহিমাব্যঞ্জক বলে মনে করেছিল। সমাজব্যবস্থার সমালোচনাকে এখনো অনেকটা দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে ধরে নেওয়া হয়। কোরিয়ার যুদ্ধ মোটেই জনপ্রিয় ছিল না। কিন্তু তীব্র সমালোচনা এবং গণবিক্ষোভ, যার দ্বারা আজকের দিনে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরোধিতা চিহ্নিত হয়েছে, কোরিয়ার যুদ্ধের বেলায় তা হয়নি।

নিগ্রো যুব সমাজ যখন ভীতির পরিবেশের অবসান ঘটিয়ে তাদের সংগ্রামকে রাস্তায় নিয়ে গেল, তখন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হ'ল। নিগ্রোদের সাহস এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতায় অনুপ্রাণিত হয়ে শ্বেতাঙ্গ যুবকেরা

ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং একটি মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তুলল যা জাতির বিবেককে জাগ্রত করল।

নিগ্রো যুবকদের সৃষ্টিশীল অবদানের অতিরঞ্জন কঠিন কাজ। যে অহিংস প্রতিরোধ প্রথমে আলাবামার মন্টগোমারীতে প্রয়োগ করা হয়েছিল, তারা একে গণসংগ্রামের রূপ দিল এবং প্রয়োগবিধির মৌলিক বিকাশ ঘটাল—যেমন অবস্থান, স্বাধীনতার মিছিল, আক্রমণাত্মকভঙ্গিতে প্রবলভাবে এগিয়ে যাওয়া। এ'সব করতে গিয়ে তারা প্রথমে নিজেদের বদলে নিল। নিগ্রোরা ঐতিহ্যগতভাবে পোষাকপরিচ্ছদে, চালচলনে এবং কট্টর মধ্যবিত্ত ধাঁচের চিন্তাভাবনায় শ্বেতাঙ্গদের অনুকরণ করত। গুণার মির্ডাল তাদের অতিরঞ্জিত আমেরিকাবাসী বলে বর্ণনা করেছেন। এখন তারা অনুকরণে বিরত হয়েছে এবং কাজকর্মে উদ্যোগী হতে শুরু করেছে। নেতৃত্ব নিগ্রোদের হাতে চলে গিয়েছে এবং তাদের শ্বেতাঙ্গ সহযোগীরা তাদের কাছে শিক্ষা নিতে আরম্ভ করেছে। উভয়ের পক্ষে এটি একটি বৈপ্লবিক এবং উন্নতিসাধক উত্তরণ। এটি একটি হাস্যকর ব্যাপার যে বহু শিক্ষাব্রতী এবং সমাজতত্ত্ববিদ সামাজিক উন্নয়নের আদর্শ হিসাবে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ নিগ্রো যুবকদের মধ্যে সঞ্চারিত করার উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আসলে যখনই নিগ্রোরা মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ ঝেড়ে ফেলে দিল, তখনই তারা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অবদান রাখতে পারল। যখন তাদের কাছে সম্পদ এবং বৃত্তি গৌণ হয়ে গেল, তখন তারা ওইসব মূল্যবোধ পরিত্যাগ করল। যখন তারা সোল্লাসে জেলযুযু হয়ে পড়ল এবং গোলমাল সৃষ্টি করতে লাগল, যখন তারা দক্ষিণের বিচ্ছিন্ন গ্রামাঞ্চলে কাজ করার জন্য ব্রুকস্ ব্রাদার্স পোষাক ছেড়ে ফেলে ওভারঅল পরে নিল, তারা শ্বেতাঙ্গ যুবকদের তাদের মত হওয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ জানাল, অনুপ্রাণিত করল। অনেকে স্কুল ছেড়ে দিল, বিদ্যার্জন ছেড়ে দেওয়ার জন্য নয়, সহজ সরল উপায়ে বিদ্যার্জনের জন্য। এই স্কুল ছাড়ার কাজটি ছিল গঠনমূলক, এমন একটি প্রকরণ যা সমাজকে এবং তাদেরকে শক্তিশালী করে তুলেছিল। এ'সমস্ত নিগ্রোরা এবং শ্বেতাঙ্গ যুবকেরা ছিল 'পিসকোরের' পূর্বসূরী, এবং এ'কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে তাদের কাজ এই আন্তর্জাতিক মানের সংগঠন তৈরির পেছনে প্রেরণা জুগিয়েছিল।

নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত মৈত্রী থেকে উদ্ভূত এই সামষ্টিক প্রচেষ্টা এদেশে ষাট দশকের প্রথম বছরগুলিতে ভীষণভাবে ফলপ্রসূ হয়েছিল। নিপীড়নকারী শক্তিসমূহ, যা প্রায় এক যুগ ধরে কোন বড় রকমের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েনি, এখন এক জাগ্রত প্রতিবন্ধীর সম্মুখীন হ'ল। সারা দেশের উপর দিয়ে মানবিক চিন্তাধারা এবং কাজকর্মের স্রোত বয়ে গেল, প্রথমে ছোট ছোট এবং পরে বড় বড় জয়ের পর জয় এলো। জনজাগরণের প্রসার ঘটল, এবং বিতর্কিত ইস্যুগুলির আওতার মধ্যে অন্যান্য সামাজিক প্রশ্নসমূহ এসে গেল। এক বিরাট সক্রিয় যুব-কর্মীদল প্রতিবাদকে গোপনীয়তা থেকে প্রকাশ্যে নিয়ে এল এবং দায়িত্বশীল

বিদ্রোহের বোধ জাগিয়ে তুলল। একটি শান্তি আন্দোলনের জন্ম হ'ল।

যদি শুধুমাত্র নাগরিক অধিকারের জন্য হ'ত, তাহলেও নিগ্রো স্বাধীনতা আন্দোলনে ঐতিহাসিক এবং নৈতিক মূল্যায়নে উৎকর্ষযুক্ত হত। কিন্তু এর জয়সূচক সম্মান আরও বড় এজন্য যে এটি ব্যাপকতর সামাজিক আন্দোলনকে উদ্দীপিত করেছিল যার ফলে জাতির নৈতিক মান উন্নীত হয়েছিল। সমাজের প্রভাবসম্পন্ন অশুভশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিচ্ছন্ন মূল্যবোধ বজায় রাখা হয়েছিল। তাছাড়া যুবকদের একটি বড় অংশ বুঝেছিল যে, যে-পীড়নশক্তির দ্বারা তারা নির্জীব হচ্ছিল তাকে রুখতে গিয়ে তারা তাদের জীবনকে বড় এবং অর্থবহ করে তুলেছিল। যে নিগ্রো এবং শ্বেতাঙ্গ যুবকেরা মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, তারা পরস্পরকে একটি নৈতিক লক্ষ্যবোধে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং উভয়েই জাতির কাছে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল।

যে আন্দোলনের বর্ণনা আমি দিচ্ছি সেটির পক্ষে ষাট শতকের শেষ ক'বছর বড় সমস্যাসংকুল। এক অর্থে বলা যায় যে অন্ততত প্রথম ধরনের এবং প্রতিবাদ ধরনের নাগরিক অধিকার আন্দোলন এবং শান্তি আন্দোলনসমূহ যা প্রথম জয়ের সূচনা করেছিল তা সমাপ্ত হয়েছে। এক অর্থে যুবকদের মধ্যে যে মৈত্রী গড়ে উঠেছিল, যার প্রকাশ ঘটেছিল আন্দোলনের মধ্যে, ব্যর্থতা, নিরুৎসাহকরণ এবং তার ফলশ্রুতি স্বরূপ উগ্রবাদ এবং বিপরীতমুখীনতার কারণে তা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে। সমাজ-পরিবর্তনের আন্দোলন প্রলোভন এবং হতাশার কবলে পড়েছে, কারণ এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এই আন্দোলন যে অশুভ শক্তির মুখোমুখী হয়েছে তা কত গভীর এবং সুসংবদ্ধ। কার্যক্রম এবং কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়ার এবং প্রলাপোক্তির মধ্যে শক্তিকে নিঃশেষিত করার একটি প্রবল ঝোঁক আসে। ঝোঁক আসে পারস্পরিক সন্দেহজনক বিভিন্ন উগ্রবাদী দলে বিভক্ত হয়ে পড়ার, যেখানে কৃষ্ণাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদের আন্দোলনে অংশগ্রহণকে বর্জন করে এবং শ্বেতাঙ্গরা বর্জন করে তাদের ইতিহাসের বাস্তবতাকে।

কিন্তু ইতিমধ্যে যুবসমাজ যেই এই সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে, অমনি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ একটি কার্যসূচী তৈরি করছেন সামাজিক আন্দোলনসমূহকে গোড়ার দিককার অসম্পূর্ণ পর্যায় থেকে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে বিশাল, সক্রিয় এবং অহিংস প্রতিরোধের নবপর্যায়ে নিয়ে যেতে। এই কার্যক্রম এবং পরিকল্পনা যেমন অগ্রসর হতে থাকবে, অমনি এটি তামাম দুনিয়ার পক্ষে কি হয়ে উঠতে পারে কল্পনার দৃষ্টিতে তার একটি মস্ত বড় আভাস আমরা পেতে পারি, যদি প্রতিরোধের নতুন প্রোগ্রাম আজকের জাগ্রতমনের যুবকদের মধ্যে আরও ব্যাপকতর মৈত্রী গড়ে তুলতে পারে।

সমাজের অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ, যার মধ্যে প্রয়োজনবোধে ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলনও রয়েছে, একটি নতুন কর্মসমন্বয়ের মধ্যে

আমাদের যুবকদের উল্লিখিত তিনটি দলের সর্বোত্তম অন্তর্দৃষ্টিকে একীভূত করতে পারে। হিপিদের কাছ থেকে এ নিতে পারে শান্তিপূর্ণ উপায়ে শান্তির লক্ষ্যে পৌঁছানোর স্বচ্ছ কল্পনা এবং সেই সঙ্গে তাদের সৌন্দর্যবোধ, নম্রতা এবং প্রতিটি মানুষের অনুপম আত্মিক গুণাবলী। আমূল সংস্কারবাদীদের কাছ থেকে নেওয়া যেতে পারে তাদের ঐকান্তিক জরুরীত্ববোধ, কর্মসাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য তাদের সরাসরি এবং সামষ্টিক চেষ্টার স্বীকৃতি এবং ক্রিয়াকৌশল ও সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা। যেহেতু যে প্রোগ্রাম উঠে আসছে তা অরাজকতার বা হতাশার নয়, তা যেসব যুবকের কাজ এবং অন্তর্দৃষ্টিকে স্বাগত জানাতে পারে যারা বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে সর্বাংশে প্রত্যাখ্যান করেনি। তারা অধিকতর জঙ্গীবাদী দলগুলিকেও আহ্বান জানাতে পারে তাদের নতুন স্বপ্নদৃষ্টিকে ইতিহাস যে-ভাবে আছে, সমাজ যে-ভাবে কাজ করে—তার শামিল করে নিতে। তারা আন্দোলনকে এ'ভাবে সহায়তা দিতে পারে যাতে সমাজের নির্ভরযোগ্য অথচ অর্ধভগ্ন বস্তুটিকে একেবারে ভেংগে ফেলা না হয় এবং মূল্যবোধের ধূমায়িত সলতেটিকে নিবিয়ে দেওয়া না হয়, যেটি যে-সমাজকে আমরা বদলাতে চাই তার মধ্যে আগে থেকেই স্বীকৃত হয়ে আছে। এবং তারা আপোস মীমাংসার সম্ভাব্যতাকে খোলা রাখতে সাহায্য করতে পারে।

পূর্ববর্তী নাগরিক অধিকার আন্দোলন শান্তি বাহিনী গড়ে তোলার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যদি কিছুটা ফলপ্রসূ হয়ে থাকে, এই নতুন মৈত্রী আরো অনেক বেশি কিছু করতে পারত। ইতিমধ্যে আমাদের যুক্তরাষ্ট্রে সেরা যুবকর্মীরা আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেদের সংগঠিত করার কথা বলছে। তারা অন্যান্য দেশের তাদের সমগোষ্ঠীর লোকদের সঙ্গে সচেতনভাবে যোগাযোগ স্থাপন করার কাজ শুরু করে দিয়েছে। একজন সচেতন কর্মীর বিবেক স্থানীয় সমস্যাগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তৃপ্ত হয় না, কেননা সে দেখতে পায় যে স্থানীয় সমস্যাগুলি বিশ্বের সমস্যাবলীর সংগে সংপৃক্ত। সেই সব যুবক ভাবতে ও বুঝতে শুরু করেছে যে তারা অন্য মানুষদের সংগে যুদ্ধ করতে এবং তাদের হত্যা করতে বিদেশে পাড়ি দিতে নিশ্চয় অস্বীকার করবে। তারা স্থির করতে পারে যে তারা অন্তত কিছুকালের জন্য নিজেদের দেশ ছেড়ে অন্যত্র যাবে সেখানকার মানুষদের সুখদুঃখের ভাগীদার হতে। এই ক্রমবর্ধিষ্ণু বিশ্ববিবেক কি আকার নেবে তার রূপরেখা এখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এক যুগ আগে নিগ্রো নাগরিক অধিকার আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে কোন রূপরেখাও ছিল না। সেই মনন এবং উদ্দীপনা এখন জাগ্রত; তবে কাঠামোগত রূপায়ণ আসবে যদি আমরা সেই আন্তর অনুভূতি সম্বন্ধে সজাগ থাকি। সম্ভবত কাঠামোগত রূপ অন্য দেশে দেখা দেবে ইতিহাসকে রূপায়িত করার জন্য অন্য একটি অভিজ্ঞতার তাগিদে।

কিন্তু আমাদের হাতে যথেষ্ট সময় নেই। বৈপ্লবিক মেজাজ ইতিমধ্যে

বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিশ্বের মানুষের ক্রোধকে প্রেম-ভিত্তিক এবং সৃজনধর্মী বিপ্লবের খাতে চালিত করতে হয় তবে আমাদের এখনই জরুরী ভিত্তিতে সকল জাতি এবং সকল মানুষের সঙ্গে এক নতুন বিশ্ব গড়ে তোলার কাজ শুরু করে দিতে হবে।

অহিংসা ও সামাজিক বিবর্তন

(ননভায়োলেন্‌স্‌ অ্যাণ্ড্‌ সোশ্যাল চেইন্‌জ্‌)

যানবাহন চলাচল সংক্রান্ত আইনে যখন বলা হয় লাল আলো দেখালে তোমাকে থামতে হবে, তাতে অন্যায় কিছু নেই। কিন্তু যখন আগুন লাগে, তখন আগুন নেবানোর গাড়ী লাল আলো অগ্রাহ্য করে ছুটে চলে, এবং সাধারণ যানবাহনকে তখন পথ ছেড়ে দিয়ে সরে যাওয়া উচিত। অথবা যখন একজন লোক রক্তপাতের ফলে মরে যেতে বসেছে, তীব্রবেগে অ্যাম্বুলেন্‌স্‌ তখন লাল আলোর মধ্য দিয়ে চলে যায়।

বর্তমানে এই সমাজে নিগ্রো এবং গরীবদের জন্য আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। এক মর্মান্তিক অবস্থার মধ্যে তারা বেঁচে আছে। তার কারণ ভয়ানক অর্থনৈতিক অবিচার যা, সমাজতন্ত্রের ভাষায়, তাদের 'অন্ত্যজ শ্রেণী করে রেখেছে। সারা বিশ্বে বঞ্চিত মানুষেরা আর্থিক এবং সামাজিক দিক থেকে ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্তক্ষরণের ফলে মরে যাচ্ছে। তাদের দরকার অ্যাম্বুলেন্স্‌চালক বাহিনী যারা বর্তমান ব্যবস্থার লাল আলো অগ্রাহ্য করবে যতক্ষণ পর্যন্ত না জরুরী অবস্থায় অবসান হচ্ছে।

বড় ধরনের আইন অমান্য হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন আনার একটি সংগ্রামী কৌশল যা পুরোদমে সাইরেন বাজিয়ে যাওয়া একটি শক্তিশালী অ্যাম্বুলেন্সের মতো। বিগত দশ বছরে অহিংস আইন অমান্য যথেষ্ঠ পরিমাণে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে। আমরা এবং সাদার্ন ক্রিশ্চিয়ান লিডারশিপ কন্‌ফারেন্স্‌ ১৯৬৩ সালে যখন আলাবামার, বার্মিংহামে গেলাম, তখন আমরা 'ইন্টিগ্রেটেড্‌ পাব্‌লিক অ্যাকমোডেশন'-এর ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। সিভিল্‌ রাইট্‌স্‌ কমিশন পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়ে এবং আমাদের নাগরিক অধিকার দাবীর সমর্থনে একটি জোরালো দলিল তৈরি করেছে—এটা জেনেই আমরা গিয়েছিলাম। কিন্তু কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে কেউ কিছু করেনি। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা ইস্যুগুলি নিয়ে আন্দোলন করেছি এবং পরিবর্তন যে কত জরুরী তা সরবে উপস্থাপিত করেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই করা হয়নি। ভোটাধিকার সম্বন্ধেও এই একই কথা। যে-পরিবর্তনের জন্য আমরা পদযাত্রা করেছিলাম, আমাদের সেল্‌মা যাওয়ার তিন বছর পূর্বে সিভিল রাইটার্স কমিশন তার জন্য সুপারিশ করেছিল। কিন্তু ১৯৬৫ সালে যখন আমরা এমন এক সংকট সৃষ্টি করেছিলাম যা জাতি উপেক্ষা করতে পারেনি, তার আগে পর্যন্ত কিছুই করা হয়নি। হিংসার আশ্রয় না নিয়ে বার্মিংহামে এবং পরে সেলমাতে আমরা শাসন ব্যবস্থা, ন্যায়বিরুদ্ধ এবং সংবিধান বিরোধী আইনসহ জীবনযাপনের ধাঁচ-ধরন বিপর্যস্ত করে দিয়েছিলাম। আমাদের বার্মিংহাম সংগ্রাম নাটকীয়ভাবে চরম পরিণতি লাভ করেছিল যখন

প্রায় ৩৫০০ জন বিক্ষোভকারীর দ্বারা সহর এবং আশপাশের প্রতিটি জেল ভর্তি হয়ে গিয়েছিল, এবং প্রায় ৪০০০ লোক অহিংসভাবে কুচ্‌কাওয়াজ করে এগিয়ে যায় এবং বিক্ষোভ অব্যাহত রাখে। নগরের অধিবাসীরা এবং নগর কর্তৃপক্ষ পরিষ্কার ভাবে জানত যে নিগ্রো সম্প্রদায়ের দাবী-দাওয়া পূরণ না করলে বার্মিংহামে কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে। দু'বছর পরে সেল্‌মোতেও ওই রকমের নাটকীয় সংকট সৃষ্টি হয়েছিল। জাতীয় স্তরে এর ফলশ্রুতি হ'ল নাগরিক অধিকার বিল এবং ভোটাধিকার আইন, কারণ প্রেসিডেণ্ট এবং কংগ্রেস সুপরিকল্পিত বিক্ষোভ থেকে উদ্ভূত নাটকীয় পরিস্থিতিতে এবং সৃজনধর্মী সংকটে সাড়া দিয়েছিলেন।

অবশ্য এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে নতুন আইন-কানুনসমূহ যথেষ্ট নয়। যে জরুরী অবস্থার আমরা মুখোমুখি হয়েছি এতে অর্থনৈতিক অবস্থা এখন ভয়াবহ হয়ে উঠেছে এবং খারাপের দিকে যাচ্ছে। শুধু আমেরিকার ৩৫ মিলিয়ন দরিদ্রের পক্ষে নয়, এমনকি অন্য সব দেশের দরিদ্রের পক্ষেও একটি শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের সমাজে একজন মানুষকে তার চাকরি বা আয় থেকে বঞ্চিত করা মনস্তাত্ত্বিকভাবে তাকে হত্যা করার শামিল। সোজা কথা, তুমি সেই লোককে বলছ যে তার বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। বস্তুতপক্ষে তুমি তাকে তার জীবন, স্বাধিকার এবং সুখের অন্বেষা থেকে বঞ্চিত করছ, তার সামাজিক ধর্মবিশ্বাস কেড়ে নিচ্ছ। বর্তমানে এ'ভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে টুঁটি চেপে মারা হচ্ছে। এই সমস্যার পরিধি আন্তর্জাতিক এবং 'ধনী-সমাজ'ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান যতই বেড়ে চলেছে, ততই এই সমস্যার অবনতি ঘটছে।

আমূল পরিবর্তনকামীদের মধ্যে যে প্রশ্নটি মতানৈক্য সৃষ্টি করছে তা হচ্ছে —একটি অহিংস কর্মসূচী, তার লক্ষ্য বড় আকারের আইন অমান্য হলেও, বাস্তবিক কী ধরনের প্রচণ্ড, দৃঢ়মূল অশুভ শক্তির মোকাবিলা করতে সমর্থ হবে?

প্রথমত মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে ১৯৬৭ সালে গ্রীষ্মের পরে অহিংসা কি কার্যকরী হবে? অনেকে মনে করে নীতি হিসাবে অহিংসা গত দু'বছরের দাঙ্গাহাঙ্গামার চিতার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তারা বলে নিগ্রোরা এখন হিংসার মধ্যেই নিজেদের মনুষ্যত্ব খুঁজে পেতে আরম্ভ করেছে; দাংগাহাংগামার মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে যে নিগ্রোরা শ্বেতাংগদের শুধু ঘৃণা করে তা নয়, তাদের একেবারে শেষ করে ফেলা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এই রক্তলোলুপ ব্যাখ্যা সহরের দাংগাহাংগামার সবচেয়ে লক্ষণীয় একটি বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করে। তারা নিঃসন্দেহে হিংস্র হয়ে উঠেছিল বৈকি। কিন্তু এই হিংসা কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠেছিল সম্পত্তির উপর, মানুষের উপর নয়। মানুষকে আঘাত করার ঘটনা খুব কমই ছিল, এবং হাংগামাকারীদের একটি অতি বড় অংশ লোকজনদের আক্রমণ করার মধ্যে জড়িত ছিল না। দাঙ্গায় বহুল প্রচারিত 'মৃতের সংখ্যা' এবং বহুলোকের আহত হওয়ার ঘটনা বহুলাংশে

হাঙ্গামাকারীদের উপর মিলিটারির আক্রমণের ফল। পুলিশী তৎপরতার উদ্দেশ্য ছিল লোককে আহত করা, এমনকি মেরে ফেলা, দাঙ্গাহাঙ্গামা ভীষণ আকার ধারণ করেছিল। যারা চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালিয়েছিল, তাদের সম্পর্কে বলা যায় যে চোরাগোপ্তা আক্রমণে এক ডজন বা দু' ডজন লোকের বেশি লোক জড়িত ছিল —এমন কথা দাঙ্গার বিবরণের মধ্যে ছিল না। ঘটনাপ্রবাহ থেকে যে অবিসংবাদিত তথ্য বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে মুষ্টিমেয় কয়েকজন নিগ্রো বিশেষ করে ভয় দেখানোর জন্য গুলি চালিয়েছিল, হত্যা করার জন্য নয় ; এবং অন্য সব হাঙ্গামাকারীদের লক্ষ্যবস্তু ছিল সম্পত্তি।

আমি জানি এমন অনেকে আছেন যাঁরা লোক এবং সম্পত্তির পার্থক্যকে মেনে নিতে চাইবেন না, তাঁরা দুটিকেই পূতপবিত্র অলঙ্ঘনীয় মনে করেন। আমার মতামত এত কট্টর নয়। একটি জীবন পবিত্র। জীবনের সেবার জন্যই সম্পত্তি। আমরা সম্পত্তিকে যত অধিকার এবং মর্যাদায় পরিবৃত করি না কেন, এর কোন ব্যক্তিসত্তা নেই। যে-পৃথিবীর উপর দিয়ে মানুষ হেঁটে বেড়ায়, এটি তার অংশ বটে ; এটি মানুষ নয়।

১৯৬৭ সালের হাঙ্গামায় সম্পত্তির উপর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হওয়াটা আকস্মিক কিছু ছিল না। এটি একটি বার্তা বহন করে আনে ; এটি কিছু একটা বলতে চায়।

যদি শ্বেতাঙ্গ বিরোধিতা একজন নিগ্রোর হাবভাবকে প্রভাবিত করার জন্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং খুনখারাপির মাত্রায় নিয়ে যায় তাহলে এরকমটি নিশ্চয় ঘটবে দাঙ্গাহাঙ্গামার সময়। রক্তপাতের এই বিরল সুযোগ কিন্তু অগ্নি-সংযোগে উন্নীত হয়ে পড়ে অথবা বিনা পয়সায় জিনিসপত্র বিতরণের এক ভয়ংকর উৎসবে পরিণত হয়। কেন হাঙ্গামাকারীরা ব্যক্তিগত আক্রমণ থেকে বিরত থাকে ? প্রতিশোধভীতি বলে একে ব্যাখ্যা করা যাবে না, কারণ সম্পত্তির উপর আক্রমণের মধ্যে যে দৈহিক বিপত্তি ছিল তা ব্যক্তির উপর আক্রমণের চেয়ে কম কিছু নয়। সামরিক বাহিনীর কাছে ছোটখাটো চুরিচামারি ছিল নরহত্যার সমান। বেশিরভাগ আক্রমণকারী অন্যের প্রাণ নেওয়ার চেয়ে সম্পত্তির উপর আক্রমণ করে জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিল বেশি। তবে তারা সম্পত্তি নিয়ে এত হিংস্র হয়ে উঠেছিল কেন ? কারণ সম্পত্তি ছিল ক্ষমতা-কাঠামোর প্রতীক, তা তারা আক্রমণ করছিল এবং ধ্বংস করে ফেলার চেষ্টা করছিল। কিছু লোক যারা লুট-পাটে অংশ নিয়েছিল তাদের সম্পর্কে লুটপাটের প্রতীকী দিকটার একটি কৌতুক-কর প্রমাণ হ'ল এই যে দাঙ্গার পর লুণ্ঠিত দ্রব্য ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে নিগ্রোদের কাছ থেকে পুলিশের কাছে শত শত অনুরোধবার্তা এসেছিল। যে সম্পত্তি ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতার প্রতীক তার প্রতিকারের জন্য সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়ার অভিজ্ঞতা পেতে চেয়েছিল সেইসব লোকেরা। সম্পত্তি নিজেদের হেফাজতে রাখাটা ছিল আসলে গৌণ ব্যাপার।

বিরোধিতার গভীর স্তরে ছিল অগ্নিসংযোগ যা ছিল লুটেতরাজের চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক। কিন্তু এটিও ছিল একটি বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং সতর্কীকরণ। এটি চালিত হয়েছিল শোষণের প্রতীক চিহ্নের বিরুদ্ধে এবং সমাজে পুঞ্জীভূত ক্রোধ প্রকাশের জন্য এটি করা হয়েছিল। আমাদের ভবিষ্যৎ রণ-নীতির পক্ষে গ্রীষ্মের দাংগাহাংগামায় এই সংযম কি ইংগিত বহন করে?

এমনকি দাংগাহাংগামার সময় যখন মানুষ আবেগে ফেটে পড়ছিল, তখন যদি কেউ মানুষের প্রতি অহিংস অনুভূতির চিহ্নমাত্র দেখে থাকে, তা'হলে বুঝতে হবে যে নিগ্রো জীবনে একটি শক্তি হিসাবে ভবিষ্যতে অহিংসাকে বাতিলযোগ্য বলে গণ্য করা উচিত হবে না। অনেক মনে করে সহরবাসী নিগ্রোরা এমন ক্রুদ্ধ এবং আধুনিকমনা যে তারা অহিংস হতে পারে না। ঐসব লোকেরা দক্ষিণাঞ্চলের অহিংস অভিযানগুলিকে খারিজ করে দেয় এবং ঐগুলিকে ধর্মপ্রাণা বয়স্কা মহিলাদের মিছিল বলে বর্ণনা করে। আসল ব্যাপার হ'ল আমাদের সংগঠিত অভিযানগুলিতে আমরা কিছু হিংসা-প্রবণ লোকদের শামিল করে নিয়েছি। বিক্ষোভের আগে আমরা শত শত ছোরা আমাদের লোকজনদের কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছি, পাছে তাৎক্ষণিক দুর্বলতা তাদের পেয়ে বসে। এবং গত বছর চিকাগোতে আমরা প্রচণ্ড হিংসাত্মক মনোভাবের কিছু সংখ্যক লোককে অহিংস নিয়মানুবর্তিতা গ্রহণ করতে দেখেছি। চিকাগো অভিযানকালে আমি দিনের পর দিন মিছিলের সারিতে হেঁটেছি এবং কাউকেও হিংস্র হয়ে প্রতিশোধ নিতে দেখিনি। অথচ যথেষ্ট প্ররোচনা ছিল। শ্বেতাঙ্গ গুণ্ডারা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে চীৎকার তো করছিলই, অধিকন্তু নিগ্রো জঙ্গিবাদী দলগুলি গেরিলা যুদ্ধের হুমকি দিয়েছিল। মিছিলে আমাদের সঙ্গে কিছু সংখ্যক দুর্বৃত্ত দলের সর্দার এবং সদস্য ছিল। আমার মনে পড়ছে যখন ব্ল্যাকস্টোন র‍্যাঘাসদের সঙ্গে হেঁটে চলেছি, পথের পাশ থেকে আমাদের উপর বোতল ছোঁড়া হচ্ছে এবং তাদের নাক-মুখ কেটে গিয়ে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে। আমি দেখলাম তারা হেঁটেই চলেছে, একজনও হিংস্র হয়ে উঠে পাল্টা আক্রমণ করছে না। আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল যে এমনকি হিংস্র মেজাজকেও অহিংস শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে চালিত করা যায়, যদি আন্দোলন চলতে থাকে, যদি তারা গঠনমূলকভাবে কাজ করতে পারে এবং একান্ত ন্যায়সংগত ক্রোধকে একটি কার্যকরী পন্থার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে।

পরিবর্তনকামী প্রতিবাদীদের সংশয় হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে—অহিংসা যুক্তি সিদ্ধ হলেও সরকার এবং স্থিতাবস্থার ধারক বাহকেরা যারা 'আমরা দাঙ্গা-হাঙ্গামাকারীদের পুরস্কৃত করব না,—এই যুক্তির ভিত্তিতে এই গ্রীষ্মে উপস্থাপিত দাবীগুলি এ'পর্যন্ত অগ্রাহ্য করেছে, তাদের বিরুদ্ধে নীতি বা কৌশলের দিক থেকে অহিংসা কি কার্যকরী হবে? দাংগাহাংগামাকারীদের পুরস্কৃত করায়, এমনকি তাদের ন্যায়সংগত এবং জরুরী দাবীদাওয়ার উপর তাদের বক্তব্য শোনার কথা দূরে থাকুক, যে-কারণে দাংগাহাংগামা ঘটেছে তার জন্য প্রশাসন নিজের দায়িত্বকে উপেক্ষা করেছে এবং পরিবর্তে দাঙ্গাহাঙ্গামার নেতিবাচক দিকগুলিকে

মূলগত ইস্যুগুলি সম্বন্ধে নিষ্ক্রিয় থাকার অজুহাত হিসাবে কাজে লাগাচ্ছে। প্রশাসন থেকে যতটুকু বাস্তব সাড়া মিলেছে তা হচ্ছে একটি অনুসন্ধানের কাজ শুরু করা এবং একদিনের প্রার্থনার আহ্বান জানানো। একজন যাজক হিসাবে প্রার্থনাকে কাজ এবং দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করাকে আমি অত্যন্ত গর্হিত বলে মনে করি। যখন একটি সরকারের, যা পৃথিবীর ইতিহাসে অভূতপূর্ব সম্পদ এবং ক্ষমতার অধিকারী, তার এর চাইতে বেশি কিছু দেওয়ার থাকে না, তখন সেই সরকার অন্ধের চাইতেও খারাপ হয়, প্ররোচনা যোগায়। হেঁয়ালির মত শোনালেও বলে রাখা ভাল যে নিগ্রো সন্ত্রাসবাদের প্ররোচনা খোটোর রাস্তার মোড় থেকেও বেশি করে আসবে কংগ্রেসের সভাঘর থেকে।

আমি দেখাতে চেয়েছি যে অহিংসা কার্যকরী হবে, কিন্তু মাত্র তখনই যখন এটি আকারে এবং মাত্রায় প্রকাণ্ড হয়ে উঠবে, এর পেছনে থাকবে সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা, এবং জাতীয় পর্যায়ে একটি শক্তসমর্থ, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ভিত্তিক আইন অমান্য আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে থাকবে এর দায়বদ্ধতা।

এই দেশের দীনদরিদ্র সর্বহারারা, যাদের মধ্যে নিগ্রো আছে, শ্বেতাঙ্গ আছে, যারা একটি নির্মম ন্যায়বোধহীন সমাজে বাস করে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের লড়তে হবে বিপ্লবের মাধ্যমে, কিন্তু তাদের স্বদেশীয় নাগরিকদের জীবনের বিরুদ্ধে নয়, বিপ্লব সেই কাঠামোর বিরুদ্ধে যার মারফতে সমাজ দারিদ্র্যের দুর্ভার অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অস্বীকার করে, অথচ যা হাতের কাছেই আছে।

লোকে বলে সত্যিকারের বিপ্লবী হচ্ছে সেই মানুষ যার হারানোর কিছু নেই। এ'দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে যাদের হারানোর মত খুব কমই আছে, অথবা এমনকি কিছুই নেই। তাদের যদি একজোট করে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা যায়, তাহ'লে তারা এমন মুক্তি প্রেরণা নিয়ে তেজোদ্দীপ্ত হয়ে সংগ্রাম করবে যা আমাদের আত্মতৃপ্ত জাতীয় জীবনে একটি নতুন এবং স্থায়িত্ব বিনষ্টকারী শক্তি হিসাবে দেখা দেবে। নববর্ষ থেকে শুরু করে আমরা দশটি সহর এবং গ্রামীণ এলাকা থেকে তিন হাজার দরিদ্রতম নাগরিককে দলে ভর্তি করে নেব ওয়াশিংটনে একটি শক্তসমর্থ বড় রকমের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ভিত্তিক আন্দোলনের সূত্রপাত এবং পরিচালনার উদ্দেশ্যে। যারা এই প্রারম্ভিক তিন হাজারের সংগে, এই অহিংস সেনাহিনীর সংগে, দরিদ্র মানুষদের এই স্বাধীনতা-অভিযানের সংগে যুক্ত হতে চায়, তারা অহিংস সংগ্রামের কৌশল আয়ত্ত করার জন্য আমাদের সাথে কাজ করবে। তারপর আমরা ওয়াশিংটনের দিকে এগিয়ে যাব, সুদৃঢ় সংকল্প নিয়ে সেখানে অবস্থান করব যতদিন পর্যন্ত না সরকারের প্রশাসন এবং আইন দপ্তর যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে চাকরি এবং রুজিরোজগার সম্পর্কে ব্যবস্থা নিচ্ছে। সমবেতভাবে এবং যত্নসহকারে তৈরি দাবীদাওয়ার একটি তালিকা নিয়ে দরিদ্র লোকদের একটি প্রতিনিধি দল একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর অফিসে ঢুকে

পড়বে। (তুমি যদি গরীব হও, তুমি যদি কোনপ্রকারে বেকার হও, যতদিন পর্যন্ত সংগ্রামে তোমাকে দরকার, ততদিন তুমি ওয়াশিংটনে থাকতে পার)। এবং যদি কর্মচারী মশাই বলেন, "কিন্তু এটির জন্য কংগ্রেসের অনুমোদন দরকার", অথবা "ওটা নিয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে", তোমরা বলতে পার, "ঠিক আছে, আমরা অপেক্ষা করব"। এবং যতক্ষণ দরকার ততক্ষণ তোমরা তাঁর অফিসে বসে থাকবে। ধর, তোমরা মিসিসিপির গ্রামাঞ্চল থেকে এসেছ এবং সেখানে চিকিৎসার সুযোগ তোমরা কখনো পাওনি এবং তোমাদের সন্তানেরা অপুষ্টি এবং স্বাস্থ্যহীনতায় ভুগছে, তোমাদের সন্তানদের ওয়াশিংটনের হাসপাতালগুলিতে নিয়ে যেতে পার এবং সেখানে স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে অবস্থান করবে যতক্ষণ না তারা শিশুদের প্রয়োজনের মোকাবিলা করছে। এ'রকম কাজের দ্বারা তোমাদের সন্তানেরা এই দেশের সামনে এমন একটি দৃশ্য তুলে ধরবে যার ফলে দেশ তার সমস্ত ব্যস্ততার মাঝখানে থমকে দাঁড়াবে এবং সে কি করছে তা নিয়ে নিবিড়ভাবে চিন্তা করবে। অনেক লোক যারা দেশের জনজীবনের বিভিন্ন দল-উপদল থেকে এসে এই তিন সহস্রের সঙ্গে যুক্ত হবে, তাদের ভূমিকা হবে সমর্থকের, সাময়িকভাবে বঞ্চিতদের সহযোগী হয়ে গরীবের ভূমিকা নেবে, যে-বঞ্চিতেরা কাজ এবং রুজিরোজগারের অধিকার দাবী করে—তারা চাকরি রুজিরোজগার চায়, ভেঙ্গে ফেলতে চায় সেসব বস্তী যেখানে তারা বাস করে এবং তার জায়গায় নিজেরাই গড়ে তুলতে চায় নতুন সামাজিক বাসভূমি। মোটকথা, তারা চায় গরীবদের জন্য নতুন অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা।

কেন ওয়াশিংটনে আমাদের শিবির থেকে এ'সব কিছু দাবী করা হবে? কারণ ফেডারেল কংগ্রেস এবং প্রশাসনই দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে আসল লড়াই'এর জন্য শতশত কোটি ডলার খরচ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আমাদের প্রয়োজন নতুন আইন নয়, পরন্তু জাতীয় স্তরে অতিবড় ধরণের নতুন প্রোগ্রাম। এই কংগ্রেস এ'ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে কিছুই করেনি, বরং এ'সব ব্যবস্থা যাতে না নেওয়া হয় তার জন্য অনেক কিছু করেছে। আমাদের মরণোন্মুখ সহরগুলিকে নিয়ে কংগ্রেস মাথা ঘামাবে কেন? কংগ্রেসে এখনো দক্ষিণের গ্রামাঞ্চলের বর্ষীয়ান প্রতিনিধিদের প্রাধান্য এবং তারা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টির জন্য প্রগতিবোধী উত্তরাঞ্চলীয়দের সংগে হাত মিলিয়েছেন, যাতে কেন্দ্রের অর্থ সেই স্থানে না যায় যেখানে সমাজোন্নয়নের স্বার্থে তার প্রয়োজন রয়েছে। সেই যুথবদ্ধতা আমরা ১৯৬৩ এবং ১৯৬৪ সালে ভেঙ্গে দিয়েছিলাম, যখন নাগরিক অধিকার এবং ভোটাধিকার আইন পাশ হয়েছিল। আমাদের আন্দোলনের আকার এবং শক্তি দিয়ে এটিকে আবার ভাঙ্গতে হবে এবং তা করার প্রকৃষ্ট স্থান হবে সেই সব কংগ্রেস সদস্যদের চোখের সামনে এবং তাদের সভাগৃহের অভ্যন্তরে। লাও হ্যারিসের সাম্প্রতিক জনমত সমীক্ষায় যেমন প্রকাশ পেয়েছে, কংগ্রেস সদস্যেরা না হলেও এদেশের জনগণ বস্তী এবং বেকারিত্বের উপর অর্থনৈতিক আক্রমণ চালাতে তৈরী

হয়ে আছে। অতএব গরীবদের দুরবস্থার ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে কংগ্রেসকে প্রস্তুত করে তুলতে হবে। আমরা আইন-প্রণেতা, প্রশাসক এবং ক্ষমতার প্রয়োগকারীদের খোঁচা দেব এবং সংবেদনশীল করে তুলব যতক্ষণ না তাঁরা এই একান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির মুখোমুখি হচ্ছেন।

আমি বলেছি যে-সমস্যা, যে-সংকট আমাদের সামনে এসে পড়েছে তার একটি আন্তর্জাতিক পটভূমি রয়েছে। বস্তুতপক্ষে এটি একটি আন্তর্জাতিক জরুরী অবস্থা থেকে অভিন্ন, যার সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে সমগ্র বিশ্বের দরিদ্র, বঞ্চিত এবং শোষিত মানুষেরা।

আন্তর্জাতিক স্তরে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যাসমূহের মোকাবিলার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ সংগ্রামভিত্তিক অহিংস আন্দোলন কি চালানো যায়? আমার কাছে এটি পরিষ্কার যে আন্দোলনের পরবর্তী অধ্যায় হবে আন্তর্জাতিক। যে-শক্তি প্রধানত লন্ডন বা প্যারিস বা ওয়াশিংটন বা অটোয়াতে কেন্দ্রীভূত সেই সব শক্তিধর দেশের সরকারের পক্ষে উন্নয়নশীল দেশসমূহকে প্রয়োজনীয় বড় আকারের আর্থিক সাহায্য দেওয়া অবশ্যই রাজনৈতিকভাবে সম্ভবপর করে তুলবে উন্নত দেশ-সমূহে জাতীয় আন্দোলন। এটি দরকার যদি উন্নয়নশীল দেশগুলিকে তাদের দারিদ্র্যের শৃঙ্খল ভেঙে ফেলতে হয়। পাশ্চাত্যে আমাদের মনে রাখতে হবে যে গরীব দেশগুলি গরীব, কারণ আমরা তাদের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ঔপনিবেশিকতার মাধ্যমে শোষণ করেছি। বিশেষকরে আমেরিকানদের দেখতে হবে যেন তাদের দেশ তার আধুনিক অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের জন্য অনুতপ্ত হয়।

কিন্তু কেবলমাত্র আমাদের দেশগুলির আন্দোলন যথেষ্ট বিবেচিত হবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে ল্যাটিন আমেরিকায় জাতীয় সংস্কার আন্দোলন অহিংস উপায় সম্বন্ধে হতাশ হয়েছে। অনেক তরুণ, এমনকি অনেক ধর্মযাজকও পাহাড়ী অঞ্চলে গেরিলা আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। ল্যাটিন আমেরিকার অনেক সমস্যার মূলে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। অতএব আমাদের অহিংসার ভিত্তিতে পরিকল্পিত একটি শক্ত-সমর্থ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালিয়ে নিতে হবে যাতে সমস্যার উভয় দিক থেকে রাজধানী এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষমতার কাঠামোর উপর অবিলম্বে চাপ সৃষ্টি করা যায়। আমি মনে করি আজ ল্যাটিন আমেরিকার সমস্যার অহিংস সমধানের এটিই একমাত্র ভরসা; এবং অহিংসার একটি শক্তিশালী প্রকাশ ঘটতে পারে সরকারী প্রশাসন কাঠামোর বাইরে সমাজ-সচেতন শক্তিসমূহের আন্তর্জাতিক স্তরে মিলিত প্রক্রিয়ার মধ্যে।

এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের সৃষ্ট, গভীরভাবে প্রোথিত সমস্যাবলীর এবং এর জাতিবৈষম্যমূলক নীতির মোকাবিলাও এই স্তরে করা যেতে পারে। যদি যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেন কেবলমাত্র এই দু'টি দেশকে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের সঙ্গে সবরকমের আর্থিক লেনদেন বন্ধ করতে রাজী করানো যেত, তবে তারা অল্প সময়ের মধ্যে সেই সরকারকে তার নীতি বদলাতে বাধ্য করতে পারত। তত্ত্বগত-

ভাবে বৃটীশ এবং আমেরিকান সরকার সেই রকমের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। দুই দেশের প্রায় প্রত্যেকটি বৃহদাকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেনের সংগে সংপর্ক আছে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের সঙ্গে। সেই সংপর্ক ছিন্ন করা তার চলে না। কার্যত এ'রকমের একটি সিদ্ধান্ত হবে অগ্রাধিকারের পুনর্বিন্যাস বা কোন আন্দোলনই এক বা দুই বছরের মধ্যে ঘটাতে পারে না। যদিও এটা সুস্পষ্ট যে সামাজিক পরিবর্তনের জন্য অহিংস আন্দোলনগুলিকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যেতে হবে, কেননা যে-সমস্ত সমস্যার মুখোমুখি এগুলিকে হতে হচ্ছে, সেগুলি একটি আমেরিকার সংগে জড়িয়ে আছে এবং অন্যথায় সে-সমস্ত সমস্যা যুদ্ধ ঘটাবে। কিন্তু আমাদের সামাজিক ন্যায় বিচারের আন্দোলনকে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার মত দক্ষতা এবং নীতিগত কৌশল, অথবা এমনকি বাধ্যবাধকতা আমরা আদৌ গড়ে তোলার কাজ শুরু ক'রতে পারিনি।

আজকের পৃথিবী এমন যা ঈশ্বরের অগণিত ছিন্নবস্ত্রপরিহিত এবং ক্ষুধার্ত সন্তানদের বিদ্রোহের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে ; যা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের, শ্বেতাঙ্গ এবং অশ্বেতাঙ্গদের, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী এবং সমষ্টিবাদীদের মধ্যেকার উত্তেজনাকর টানাপোড়েনে ছিন্নভিন্ন, যার সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তি প্রাযুক্তিক শক্তির অনেক পেছনে পড়ে রয়েছে যেটির ফলে আমরা প্রতিদিন ছুটে চলেছি পারমানবিক বিনাশের কিনারায় ; এই বিশ্বে অহিংসা কেবলমাত্র বৌদ্ধিক বিচার বিশ্লেষণের অভীপ্সামাত্র নয়, পরন্তু সংগ্রামের একান্ত প্রয়োজনীয় হাতিয়ার।

অহিংসার পথে তীর্থযাত্রা (২)

(পিল্‌গ্রিম্যাজ্‌ টু নন্‌ভায়োলেন্‌স্‌)

থিওলজিক্যাল সেমিনারিতে অধ্যয়ন কালের শেষের দিকে আমি বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনার সংগে নানা ধর্মীয় তত্ত্বের উপর পড়াশুনা করেছিলাম। কিছুটা কঠোর মৌলবাদী ঐতিহ্যের মধ্যে লালিত হয়ে আমি মাঝে মাঝে শংকিত হয়ে পড়তাম যখন আমার বৌদ্ধিক অভিযাত্রা আমাকে নতুন এবং অনেক সময় জটিল মতবাদের রাজ্যের মধ্য দিয়ে নিয়ে যেত। কিন্তু এই তীর্থযাত্রা ছিল উদ্দীপনাময় এবং আমাকে দিল বাস্তব অবস্থা অনুধাবনের এবং যুক্তিবাহী বিশ্লেষণের নতুন প্রেরণা। আমাকে যেন একটা ঝাঁকুনি দিয়ে অন্ধ মতাদর্শের তন্দ্রা থেকে জাগিয়ে দিল।

এই উদারতাবাদ আমাকে এমন একটি বৌদ্ধিক তৃপ্তি দিল যা আমি কখনো মৌলবাদের মধ্যে পাইনি। উদারতাবাদের অন্তর্দৃষ্টি আমাকে এতটা আবিষ্ট করে ফেলেছিল যে এর পরিধির মধ্যে যা কিছু আসে সেসব কিছুই নির্বিচারে গ্রহণ করার ফাঁদে প্রায় পড়ে গেলাম। মানুষের প্রকৃতিগত সততা এবং মানবীয় যুক্তির স্বাভাবিক ক্ষমতার উপর আমি পুরোপুরি আস্থাশীল হয়ে পড়লাম।

এক

আমার চিন্তাধারার মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন দেখা দিল যখন তথাকথিত উদার ধর্মতত্ত্বের সংগে সম্পৃক্ত কিছু তাত্ত্বিক মতবাদ সম্বন্ধে আমার মনে প্রশ্ন জাগল। অবশ্য উদারতাবাদের এমন কিছু দিক আছে যা আমি চিরকাল ধরে থাকব বলে আশা করি। যেমন সত্যানুসন্ধানের প্রতি এর অনুরাগ, মনকে মুক্ত এবং বিশ্লেষণমুখী রাখার উপর জোর দেওয়া এবং যুক্তির আলো থেকে সরে আসতে না চাওয়া। বাইবেলীয় সাহিত্যের দর্শন এবং ইতিহাসভিত্তিক বিচারের ক্ষেত্রে উদারতাবাদের অবদানের মূল্য অসাধারণ এবং ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক অনুভবে তা সমর্থনযোগ্য।

কিন্তু মানুষের উদার মতবাদ সম্পর্কে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল। আমি যতই ইতিহাসের বিয়োগান্তক ঘটনাবলী এবং নিম্নগামী পথে মানুষের চলার ঝোঁক সম্বন্ধে অবহিত হতে থাকলাম, ততই পাপের শক্তি এবং গভীরতা আমার চোখে পড়ল। রেইনহোল্‌ড্‌ নাইয়েবুরের রচনাবলী পড়ে মানুষের মানস-প্রবণতার জটিলতা এবং মানুষের অস্তিত্বের প্রতি স্তরে পাপের বাস্তব অবস্থিতি বিষয়ে আমি সজাগ হয়ে উঠেছিলাম। তাছাড়া সমাজের সঙ্গে মানুষের জড়িত থাকার মধ্যে যে জটিলতা আছে এবং মানুষের যৌথ দুর্বৃত্তি যে অতি স্পষ্ট বাস্তব ব্যাপার—তা আমাকে মেনে নিতে হয়েছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম

যে উদারতাবাদ মানবচরিত্র সম্বন্ধে ভাবপ্রবণতা দ্বারা চালিত এবং এর ঝোঁক রয়েছে কিছুটা আদর্শবাদের দিকে।

আমি এও দেখতে পেলাম যে মানবচরিত্র সম্বন্ধে উদারতাবাদের এই লঘু আশাবাদ পাপ যে বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রাখে এই ব্যাপারটিকে দেখতে পারনি। মানবচরিত্র সম্বন্ধে যতই ভেবেছি ততই আমি দেখতে পেয়েছি পাপের প্রতি এই সর্বনাশা ঝোঁক কেমন করে যতসব গর্হিত কাজকে যুক্তির উপর দাঁড় করাতে আমাদের অনুপ্রাণিত করে। নিছক যুক্তি যে মানুষের চিন্তাধারাকে ন্যায়সংগত প্রমাণ করার হাতিয়ার ছাড়া আর কিছুই নয়—উদারতাবাদ এটি দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। যে-যুক্তির মধ্যে পবিত্র বিশ্বাসের শক্তি নেই তা কখনো সত্যের বিকৃতিকে বুদ্ধিগ্রাহ্য করার অপচেষ্টা থেকে মুক্ত নয়।

যদিও আমি উদারতাবাদের কিছু কিছু দিক বর্জন করেছিলাম, তথাপি নয়া গোঁড়া-মতবাদের সবকিছু আমি মেনে নিতে পারিনি; এ নয়া গোঁড়া-মতবাদ ভাবপ্রবণ-উদারতাবাদের কিছুটা প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করেছিল। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল এটি মৌল প্রশ্নগুলির সঠিক জবাব দিতে পারেনি। উদারতাবাদ যদি মানবচরিত্র সম্বন্ধে অতিমাত্রায় আশাবাদী হয়ে থাকে, নয়া গোঁড়ামী ছিল তেমনি নৈরাশ্যবাদী। কেবলমাত্র মানুষ সম্পর্কিত প্রশ্নে নয়, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও নয়া গোঁড়া-মতবাদের বিদ্রোহের মধ্যে বড় বাড়াবাড়ি ছিল। উদারতাবাদ ঈশ্বরের সর্বব্যাপিতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে ঈশ্বরের অলৌকিকতাকে কিছুটা লঘু করে দেখে ছিল। নিও-অর্থোডক্সি আবার ঈশ্বরের অলৌকিকতাকে প্রতিপন্ন করতে গিয়ে ঈশ্বরকে প্রচ্ছন্ন, অজ্ঞেয়, সম্পূর্ণভাবে অন্য সত্তাবিশিষ্ট করে তুলেছিল। উদারতাবাদের যুক্তিনির্ভরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে নয়া গোঁড়া-মতবাদ যুক্তিবাদ-বিরোধিতা এবং আধা-মৌলবাদের শিকার হয়ে পড়েছিল, বাইবেলে উল্লিখিত সবকিছুকেই নির্বিচারে গ্রহণ করার সংকীর্ণতার মধ্যে আটকে পড়েছিল। আমার মতে এ'ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি চার্চের বা ব্যক্তিজীবনের পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে না।

কাজেই উদারতাবাদ মানব প্রকৃতির প্রশ্নে আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তথাপি আমি নিও-অর্থোডক্সিতেও কোন আগ্রহ খুঁজে পাইনি। আমি এখন বুঝতে পেরেছি যে মানুষের আসল সত্য রূপটি কি তা উদারতাবাদের বা নয়া-গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে পাওয়া যাবে না। উভয়ের মধ্যে সত্যের আংশিক স্বরূপটি মাত্র পাওয়া যাবে। প্রতিবাদী উদারতাবাদের এক অংশ মানুষের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছে অপরিহার্য মানব প্রকৃতির নিরিখে, যা নাকি ভাল করার শক্তি রাখে। অন্য দিকে নয়া গোঁড়া-ধর্মবাদের সংখ্যানুসারে মানুষের অভিন্নবাদী প্রকৃতিতে মন্দ করার ঝোঁক এবং শক্তি রয়েছে। মানুষকে সঠিকভাবে জানতে এবং বুঝতে হবে লিবারেলিজমের থিসিসের মধ্যে নয়, নিও-অর্থোডক্সির এন্টিথিসিসের মধ্যেও নয়, পরন্তু এই দু'য়ের সিনথিসিসের মধ্যে।

মাঝখানের বছরগুলিতে আমি অস্তিত্ববাদী দর্শনের একটি নতুন মানে খুঁজে

পেলাম। প্রথমে আমি কিকেগার্ড এবং নীটশের রচনার মাধ্যমে এই দর্শনের সংস্পর্শে আসি। পরে আমি জ্যাসপার্স, হাইডেগার এবং সার্ত্রের রচনাবলী পাঠ করি। এই সব চিন্তাবিদ আমার চিন্তা-ভাবনাকে উদ্দীপ্ত করে দেন। এঁদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন তুলে প্রকৃতপক্ষে আমি তাঁদের লেখা পড়ে অনেক কিছু জানলাম। শেষে যখন আমি পল টিলিচের লেখা গভীরভাবে পড়তে শুরু করি, তখন আমার এই ধারণা জন্মাল যে অস্তিত্ববাদ এক ধরনের ফ্যাশানে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও এই দর্শন মানুষ এবং মানুষের অবস্থান সম্বন্ধে কিছু মৌল সত্যকে ধরতে পেরেছে যা কোনমতেই উপেক্ষণীয় নয়।

মানুষের 'সীমাবদ্ধ স্বাধীনতার' ধারণাটি অস্তিত্ববাদের অন্যতম অবদান। অস্তিত্বের বিপদসংকুল এবং দ্ব্যর্থক তথা অনিশ্চিত কাঠামো মানুষের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক-জীবনে যে উদ্বেগ এবং সংঘাত সৃষ্টি করে—এই ব্যাপারটিকে অস্তিত্ববাদ যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছে তা আমাদের এই যুগে বিশেষ অর্থবহ। নাস্তিক অস্তিত্ববাদ এবং আস্তিক অস্তিত্ববাদের মধ্যে সাধারণ বিভাজক এই যে মানুষের অস্তিত্বসম্পৃক্ত অবস্থিতি এবং মানুষে অপরিহার্য প্রকৃতির মধ্যে বিরোধ রয়েছে। হেগেলের অপরিহার্যবাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে অস্তিত্ববাদীরা বলেন যে বিশ্ব খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত। ইতিহাস হচ্ছে অসমহিত সংঘর্ষ পরম্পরা এবং মানুষের অস্তিত্ব উদ্বেগাকীর্ণ এবং তার নিরর্থক হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। অস্তিত্ববাদী বক্তব্যের মধ্যে চরম খ্রিস্টিয় প্রত্যয় পাওয়া যাবে না বটে, তবুও এর মধ্যে এমন কিছু আছে যার দ্বারা ধর্মবেত্তারা মানুষের অস্তিত্বের আসল স্বরূপ কি তা বোঝাতে পারেন।

যদিও আমার প্রথাগত অধ্যয়ন ছিল সুসংবদ্ধ ধর্মতত্ত্ব এবং দর্শনশাস্ত্র, তথাপি সামাজিক নীতিশাস্ত্রের প্রতি আমার কৌতুহল এবং অনুরাগ বেড়ে যেতে লাগল। ১৬।১৭ বছর বয়সে জাতিগত সমস্যা আমাকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল। আমার বিবেচনায় জাতিপৃথকীকরণ বিচারসিদ্ধ এবং নৈতিক দিক থেকে ন্যায়সঙ্গত ছিল না। বাসে পেছনের আসনে বা ট্রেনে আলাদা জায়গায় বসার ব্যাপারটিকে আমি মেনে নিতে পারিনি। প্রথমবার আমাকে যখন খাওয়া-দাওয়ার গাড়ীতে পর্দার পেছনে বসানো হ'ল, তখন আমার এই অনুভব এসেছিল, যেন আমার নিজের সত্তার উপর পর্দা টেনে দেওয়া হয়েছে। আমি এও বুঝেছিলাম যে জাতিগত অন্যায় এবং অর্থনৈতিক অন্যায় একটি আরেকটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। আমি দেখতে পেলাম কেমন করে জাতি-পৃথকীকরণ নীতির দ্বারা নিগ্রো এবং গরীব শ্বেতাঙ্গদের সমানভাবে শোষণ করা হচ্ছে। গোড়ার দিকের এই সমস্ত অভিজ্ঞতার ফলে সমাজের নানাবিধ অন্যায় অত্যাচার সম্বন্ধে আমি গভীরভাবে সচেতন হয়ে উঠলাম।

ধর্মীয় শিক্ষায়তনে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত সমাজ থেকে অশুভ শক্তির বিলোপ সাধনের উপায় সম্বন্ধে যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে বৌদ্ধিক অনুসন্ধান আমি শুরু করিনি। খ্রিস্টিয় সামাজিক উপদেশমালা আমাকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রভাবিত

করেছিল। ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে ওয়াল্টার রওচেনবুচের 'ক্রিশ্চিয়ানিটি অ্যান্ড্ দ্য সোস্যাল ক্রাইসিস্' বইটি আমি পড়ি। এই বই আমার চিন্তাধারার উপর একটি স্থায়ী ছাপ রেখে যায়। অবশ্য তাতে এমন সব বিষয় ছিল যাতে রওচেন-বুচের সঙ্গে আমি একমত হতে পারিনি। আমার মনে হয়েছিল তিনি উনিশ শতকীয় 'অনিবার্য অগ্রগতির' শিকার হয়ে পড়েছিলেন, যার ফলে মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে অহেতুক আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। তাছাড়া অনেকটা বিপজ্জনকভাবে তিনি একটি বিশেষ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ভগবানের রাজ্যের সঙ্গে অভিন্ন ভেবে বসেছিলেন। এ'ধরনের প্রলোভনের কাছে চার্চের আত্মসমর্পণ করাটা কখনো সংগত হতে পারে না। এসব ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও রওচেনবুচ আমেরিকান প্রোটেস্ট্যান্ট্‌বাদের মধ্যে একটি সমাজবোধ জাগিয়েছিলেন—যা কখনো হারানো উচিত হবে না। আসল কথা, খ্রিস্টিয় উপদেশমালার আওতায় আসে সমগ্র মানুষটি, শুধু তার আত্মা নয়, দেহও, শুধু তার আত্মিক কল্যাণ নয়, ব্যবহারিক কল্যাণও। যে ধর্ম শুধুমাত্র মানুষের আত্মার বিষয়ে ভাবে এবং তাদের অতিকদর্য বস্তিজীবন, তাদের শ্বাসরোধকারী অর্থনৈতিক অবস্থা, যে সামাজিক অবস্থা তাদের পংগু করে রেখেছে—সে সম্বন্ধে অনুরূপভাবে মাথা ঘামায় না, তেমন ধর্ম আত্মিক দিক থেকে মৃতপ্রায়।

রওচেনবুচের রচনাবলী পড়ার পর আমি গভীর মনোযোগের সংগে অন্যান্য মহান দার্শনিকদের সামাজিক এবং নৈতিক তত্ত্বসমূহ পড়েছিলাম। এই সময়ে সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধানে প্রেমের শক্তি সম্বন্ধে এক রকম হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল অন্য গাল পেতে দাও বা তোমার শত্রুকে ভালবাস—এ'জাতীয় দর্শনের মূল্য আছে কেবলমাত্র ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংঘর্ষের বেলায়। গোষ্ঠীগত বা জাতিগত সংঘর্ষের ক্ষেত্রে আরো বেশি বাস্তবসম্মত দৃষ্টি-ভঙ্গির প্রয়োজন রয়েছে।

এমন সময় গান্ধীর জীবনী এবং শিক্ষার সংগে আমার পরিচয় ঘটে। তাঁর রচনাসমূহ পড়ে আমি তাঁর অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম। গান্ধীর সত্যাগ্রহ মতবাদ আমার কাছে গভীর অর্থবহ হয়ে দেখা দিল। (সত্যাগ্রহের অর্থ হ'ল সত্যের শক্তি বা প্রেমের শক্তি)। গান্ধীদর্শনের যতই গভীরে প্রবেশ করতে থাকলাম, ততই প্রেমের শক্তি সম্বন্ধে আমার সন্দেহের নিরসন হতে থাকে। এবং দেখতে পেলাম খ্রিস্টিয় প্রেম-নীতি গান্ধীর অহিংস পদ্ধতির মধ্যে ক্রিয়াশীল হলে নিপীড়িত মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি অতি শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হবে। অবশ্য তখনকার পরিস্থিতিতে এ'বিষয়ে আমার ধারণা এবং মূল্যায়ন ছিল নিতান্তই বুদ্ধিগত। সামাজিক ক্ষেত্রে একটি ফলপ্রসূ সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার উপর একে দাঁড় করানোর দৃঢ় মনোভাব আমার মধ্যে তখন ছিল না।

১৯৫৪ সালে আলাবামার অন্তর্গত মন্ট্‌গোমারীতে যখন যাজক হয়ে গেলাম, তখন আমার এতটুকু ধারণাও ছিল না যে পরবর্তী কালে এক সংকটের মধ্যে গিয়ে

পড়ুক যেখানে অহিংস প্রতিরোধ প্রয়োগ করা হবে। সেখানকার সমাজে বছর-খানেক বাস করার পর বাস ধর্মঘট শুরু হল। মণ্টগোমারীর নিগ্রো অধিবাসীরা বাসে চড়তে গিয়ে বরাবর যে গ্লানিকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হত, তাতে অতিষ্ট হয়ে ওরা বড় আকারের অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের মুক্ত করার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করল। তারা দেখল অপমানকর অবস্থার মধ্যে বাসে চড়ার চেয়ে আত্মমর্যাদা বজায় রেখে হেঁটে পথ চলাটাই ঢের বেশি সম্মানজনক। এই বিরোধিতা প্রকাশের শুরুতে জনগণ আমাকে তাঁদের মুখপাত্র হয়ে কাজ করতে বলেন। এই দায়িত্ব গ্রহণ করে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমার মনে এলো সারমন্ অফ্ দ্য মাউণ্ট্ এবং গান্ধী নির্দেশিত অহিংস প্রতিরোধের কথা। এই আদর্শ আলোকবর্তিকাস্বরূপ আমাদের আন্দোলনের দিশারী হয়ে রইল। যীশু-খৃষ্ট আমাদের দিলেন প্রেরণা এবং উদ্দীপনা আর গান্ধী দিলেন অহিংসার প্রয়োগ কৌশল।

আমি এ'পর্যন্ত যত বই পড়েছি তার চেয়ে মণ্ট্গোমারীর অভিজ্ঞতা অহিংসার প্রশ্নে আমার চিন্তাকে অনেক বেশি স্বচ্ছ করে তুলেছিল। যতই দিন যেতে লাগল অহিংসার শক্তি সম্বন্ধে আমার প্রত্যয় ততই দৃঢ় হতে থাকে। বুদ্ধি-গতভাবে যে উপায় বা প্রক্রিয়াকে আমি স্বীকার করে নিয়েছিলাম, অহিংসা তার চেয়ে ঢের বেশি কিছু বলে আমার কাছে প্রতিভাত হ'ল। এটি হয়ে দাঁড়াল একটি স্বীকৃত জীবনযাত্রা প্রণালী। অহিংসার ব্যাপারে যে-সব বিষয় আমার কাছে ঘোলাটে ছিল, ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সেগুলির এখন সমাধান পেয়ে গেলাম।

ভারত ভ্রমণের সুযোগ ব্যক্তিগতভাবে আমার উপর প্রভাব ফেলেছিল। কারণ স্বাধীনতা অর্জনে অহিংস সংগ্রামের ফলাফল সরাসরি একটি সজীব অভিজ্ঞতা। সাধারণত অহিংস আন্দোলন যে বিদ্বেষ এবং তিক্ততার রেশ রেখে যায়, ভারতে কোথাও তা দেখা যায়নি এবং পরিপূর্ণ সমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি মৈত্রী-বন্ধন ভারত ও বৃটেনের অধিবাসীদের মধ্যে স্থাপিত হয়েছে কমনওয়েলথের আওতার মধ্যে।

অহিংসা রাতারাতি ঐন্দ্রজালিক কিছু একটা করে ফেলবে—এ'রকমের একটি ধারণা সৃষ্টি আমি করতে চাই না। মানুষকে তার মানসিক অভ্যাসের অবরুদ্ধ নিগড় থেকে সরিয়ে আনা বা তার সংস্কারাচ্ছন্ন অযৌক্তিক অন্ধ ভাবনা থেকে মুক্ত করা সহজ ব্যাপার নয়। বঞ্চিত মানুষেরা যখন স্বাধীনতার দাবী তোলে, সুবিধা-ভোগী শ্রেণীর প্রথম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তিক্ততা এবং প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে। এমনকি দাবীর ভাষা যখন হিংসাবর্জিত হয়, সেক্ষেত্রেও প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া একই রকম হয়ে থাকে। আমার নিশ্চিত ধারণা মণ্ট্গোমারীর এবং সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলের আমাদের অনেক শ্বেতাঙ্গ ভাই এখনও নিগ্রো নেতাদের প্রতি বিদ্বেষের ভাব পোষণ করে, যদিও এই নেতারা অহিংসার পথে চলছে। কিন্তু যারা অহিংসার

প্রতি অনুরক্ত, অহিংস দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের হৃদয় এবং আত্মাকে কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করে। তাঁদের মধ্যে নতুন আত্মসম্মানবোধ জাগায়। এটি তাঁদের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সাহসকে জাগিয়ে তোলে, যেটির বিষয়ে তাঁরা ইতিপূর্বে সজাগ ছিলেন না। শেষ কথা, এটি বিরুদ্ধবাদীর বিবেককে এমনভাবে নাড়া দেয় যার ফলে একটি আপোস মীমাংসা বাস্তব রূপ নেয়।

তিন

সাম্প্রতিক কালে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অহিংস কার্য পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা আমি উপলব্ধি করেছি। যদিও জাতির সঙ্গে জাতির সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি কতদূর ফলপ্রসূ সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম না, তথাপি আমার মনে হয়েছিল যে অশুভ শক্তির সৃষ্টি এবং প্রসার রোধ করার ব্যাপারে অহিংস পদ্ধতি নেতিবাচকভাবে কল্যাণকর হতে পারে। যুদ্ধ ভয়াবহ হলেও একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণের চাইতে অধিকতর কাঙ্ক্ষিত হতে পারে। কিন্তু এখন আমি মনে করি আধুনিক সমরাস্ত্রের সর্বাত্মক ধ্বংসক্ষমতা যুদ্ধের এমনকি নেতিবাচকভাবে কিছু ভাল করার সম্ভাব্যতাকে বাতিল করে দিয়েছে। আমরা যদি ধরে নিই যে মনুষ্যজাতির বেঁচে থাকার অধিকার আছে, তাহ'লে আমাদের অতি অবশ্যই যুদ্ধ এবং ধ্বংসের একটি বিকল্প খুঁজে বার করে নিতে হবে। এই মহাকাশযান এবং ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের যুগে আমাদের অহিংসা অথবা অনস্তিত্ব—এই দু'টির একটিকে বেছে নিতে হবে।

আমি নীতিবাগীশ শান্তিবাদী নই। কিন্তু আমি এমন এক বাস্তবসম্মত শান্তিবাদ আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করেছি, যে শান্তিবাদী অবস্থান বিশেষ পরিস্থিতিতে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর। একজন খ্রিস্টান অ-শান্তিবাদী যে নৈতিক উভয় সংকটের মধ্যে পড়ে, আমি নিজেকে তার থেকে মুক্ত বলে দাবী করি না। কিন্তু আমার প্রত্যয় এই যে যখন পারমাণবিক অস্ত্রের আঘাতে সমগ্র মনুষ্যজাতির নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, তখন চার্চ কোনমতেই নির্বাক হয়ে থাকতে পারে না। যদি চার্চের তার আদর্শের প্রতি সত্যিকারের অনুরাগ থাকে, তবে তাকে অস্ত্রপ্রতিযোগিতা বন্ধ করার আহ্বান জানাতেই হবে।

গত কয়েকবছর ব্যক্তিগত যা-কিছু নিপীড়ন আমার উপর চলেছে, তাতে আমার চিন্তাধারাও একটি বিশেষ রূপ পেয়েছে। পাছে কিছু ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়, তাই আমি এই সব অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করতে দ্বিধা বোধ করি। যে-ব্যক্তি হামেশাই দুঃখকষ্ট ধরণের কথা বলে বেড়ায় এবং সেই সবের প্রতি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে, সেই ব্যক্তির মধ্যে নিজেকে শহীদ বানানোর মত এক ধরনের মনোবিকৃতি দেখা দেয় এবং মনে হয় সে যেন সচেতনভাবে মানুষের সহানুভূতি যাচনা করে। বিপদটা এখানেই। কোন ব্যক্তির পক্ষে তার আত্মত্যাগের মধ্যে কেন্দ্রিভূত হয়ে পড়া সম্ভব। তাই আমি আমার ব্যক্তিগত ত্যাগের কথা

উল্লেখ করতে সর্বদাই অনিচ্ছুক। কিন্তু এই প্রবন্ধে এই সবের উল্লেখ যুক্তিযুক্ত বলেই আমি মনে করি, কেননা আমার চিন্তাভাবনার উপর এই সবকিছুর প্রভাব পড়েছে।

জনগণের স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামের মধ্যে আমার জড়িত হয়ে পড়ার জন্য গত কয়েক বছর প্রায় খুব কম দিনই আমার শান্তির মধ্যে কেটেছে। আলাবামা এবং ভার্জিনিয়া জেলে আমাকে ১২ বার বন্দী করে রাখা হয়েছে। আমার বাড়ীতে দু'ই বার বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে। এমন দিন যায়নি যেদিন আমাকে এবং আমার পরিবারকে হত্যা করার হুমকি দেওয়া হয়নি। আমাকে ছোরা মারা হয়েছিল, যার ফলে আমার প্রায় মৃত্যু হতে যাচ্ছিল। তাই প্রকৃত অর্থে অত্যাচারের ঝড়-ঝঞ্জার মধ্যে আমি একরকম বিধ্বস্ত হয়ে গেছি। স্বীকার করতে বাধা নেই মাঝে মাঝে আমার মনে হয়েছিল এতবড় ভার আমি বহন করতে পারব না, পশ্চাদ-পসরণ করে শান্ত এবং নির্বিঘ্ন জীবনে ফিরে যাওয়ার প্রলোভনও আমাকে পেয়ে বসেছিল। কিন্তু যখনই এ'রকমের প্রলোভন এসেছে, তখনই এমন কিছু এসে পড়েছে যা আমার মনোবল সুদৃঢ় এবং অক্ষুন্ন রেখেছে। আমি এখন বুঝতে পেরেছি যে প্রভুর দেওয়া বোঝা হাল্কা হয়ে যায়, যখন তাঁর জোয়াল নিজের কাঁধে তুলে নিই।

যে যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার মধ্য দিয়ে আমি গিয়েছি, তার ফলে যে দুঃখ বা পীড়ন প্রাপ্য নয় তার মূল্য যে কি—সে শিক্ষা আমি পেয়েছি। নিপীড়নজাত দুঃখ-যন্ত্রণা আমার যতই বাড়তে লাগল, আমার এই প্রতীতি জন্মাল যে দু'ভাবে আমি যন্ত্রণার মোকাবিলা করতে পারি, হয় তিক্ত প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, নয়তো এই দুঃখ যন্ত্রণাকে একটি সৃজনশীল শক্তিতে রূপান্তরিত করে। আমি দ্বিতীয় পন্থাটি অনুসরণ করব ঠিক করলাম। দুঃখবরণের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিয়ে আমি একে এক পুণ্যময় কর্মে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। অন্তত নিজেকে তিক্ততার হাত থেকে বাঁচাতে আমি আমার ব্যক্তিগত দুঃখ-কষ্টকে নিজেকে রূপান্তরিত করার এবং যারা এখনকার ভয়াবহ অবস্থার খপ্পরে পড়েছে তাদের দুঃখ-দুর্দশাকে লাঘব করার কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছি। এই ক'বছর এই প্রত্যয় নিয়ে আমি চলেছি যে অমার্জিত দুঃখভোগ মানুষকে অন্তরের দিক থেকে বিশুদ্ধ করে তোলে। এমন ব্যক্তিরা আছেন যাঁরা খ্রিষ্টের ক্রুশচিহ্নকে একটি বিরাট প্রতিবন্ধক বলে মনে করেন, অন্যেরা মনে করেন এটা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আমার এই বোধ ক্রমশ দৃঢ়তর হচ্ছে যে এটি ব্যক্তির এবং সমাজের মুক্তির জন্য ভগবৎদত্ত শক্তি। সুতরাং ঋষি প্রথম পলের মত আমি বিনম্র শ্রদ্ধায় অথচ গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, "প্রভু যীশুর ক্ষতচিহ্ন আমি আমার নিজের দেহেই ধারণ করে আছি।"

যে মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে আমি গত বছর চলেছি, তা আমাকে ঈশ্বরের আরও সান্নিধ্যে নিয়ে গেছে। আগের চাইতেও ঈশ্বরের ব্যক্তিসত্তার সম্বন্ধে আমি

আরো বেশি আস্থাবান হয়েছি। এ'কথা সত্য যে ঈশ্বরের ব্যক্তিসত্বায় আমি বরাবরই বিশ্বাসী ছিলাম। কিন্তু অতীতে ব্যক্তিসত্বাবিশিষ্ট ঈশ্বরের ধারণা ছিল মাত্র আধিবিদ্যক ধাঁচের যা ছিল আমার কাছে ধর্মতাত্বিক এবং দার্শনিক দিক থেকে মনোহারী। কিন্তু এখন এটি একটি জীবন্ত সত্য যা প্রাত্যাহিক অভিজ্ঞতার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ঈশ্বর আমার কাছে পরম সত্য বস্তু। বাইরের চরম বিপদের মধ্যেও আমার অন্তর শান্ত থাকে। নিঃসঙ্গ দিনে এবং বিষণ্ণ রাত্রিতে আমি শুনেছি সেই আন্তর্ধ্বনি যা বলছে, "দেখ, আমি তোমার সাথে থাকব।" যখন ভয় এবং হতাশার নিগড়ে আমার সমস্ত চেষ্টা আটকে যায়, তখন আমি অনুভব করি ঐশী শক্তি আমার হতাশার শ্রান্তিকে আশার উচ্ছ্বাসে রূপান্তরিত করে দেয়। আমি এই বিশ্বাসে অটল আছি যে এই বিশ্বসংসার একটি প্রেমময় অভীপ্সার দ্বারা চালিত হচ্ছে এবং ন্যায়ের সংগ্রামে এই নিখিল বিশ্ব সংগ্রামী মানুষদের সঙ্গে রয়েছে। বিশ্বের ব্যাহ্যিক উৎকট চেহারার পশ্চাতে আছে একটি শুভ শক্তি। ঈশ্বরকে ব্যক্তিসত্তাবিশিষ্ট বলার অর্থ এই নয় যে অন্যান্য বস্তুসমূহের মত ঈশ্বরকে সীমাবন্ধ বস্তু বলে মনে করা বা মানবীয় ব্যক্তিত্বের সীমাবন্ধতা ঈশ্বরে আরোপ করা। এর অর্থ হচ্ছে আমাদের মানস-লোকে যা কিছু সুন্দরতম এবং মহত্তম তা গ্রহণ করা এবং ঈশ্বরের মধ্যে পূর্ণতম স্থিতি উপলব্ধি করা। এটা নিশ্চিতভাবে সত্য যে মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে সীমাবন্ধতা আছে, কিন্তু ব্যক্তিত্বের নিজস্ব সত্তা যে সীমাবন্ধ হবেই এমন কোন কথা নেই। ব্যক্তিত্বের অর্থ আত্মবিবেক এবং আত্মনির্দেশনা। অতএব প্রকৃত অর্থে ঈশ্বর হচ্ছেন জীবন্ত ঈশ্বর। তাঁর মধ্যে অনুভূতি আছে, এষণা আছে —যা মানুষের আন্তর আকুতিতে সাড়া দেয়। ঈশ্বর প্রার্থনার ইচ্ছা জাগান, প্রার্থনার জবাব দেন।

বিগত দশকটি ছিল অত্যন্ত উত্তেজনাকর। এই সময়কার স্নায়বিক চাপ এবং অনিশ্চয়তা সত্বেও গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কিছু একটা ঘটে চলেছে। শোষণ এবং অত্যাচারমূলক পুরনো সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে; ন্যায় এবং সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নতুন সমাজব্যবস্থার উদ্ভব হতে চলেছে। সঠিক অর্থে এটাই সেরা সময় যখন অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে। সুতরাং আমি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরুৎসাহ বোধ করছি না। ধরে নেওয়া যাক যে বিগত দিনের স্বচ্ছন্দ আশাবাদ অসম্ভব কিছু একটি বস্তু। ধরা যাক যে বিক্ষুব্ধ জীবনসমুদ্রের কলকোলাহলের মধ্যে আমরা একটি বিশ্ব সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু প্রত্যেক সংকটের মাধ্য যেমন বিপদ আছে, আবার সুযোগও আছে। এটি মুক্তিও দিতে পারে, আবার সর্বাত্মক ধ্বংসও আনতে পারে। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন বিভ্রান্তিকর বিশ্বে মানুষের হৃদয়ে 'ঈশ্বরের রাজ্য'ও তো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

আমার স্বপ্ন

(আই হ্যাভ্ অ্যা ড্রীম)

(২৮.৮.১৯৬৩ তারিখে ওয়াশিংটনে লিন্‌কন্ মেমোরিয়েলে প্রদত্ত বক্তৃতা)

পাঁচ কুড়ি বছর পূর্বে একজন মহান আমেরিকান, যাঁর প্রতীকী ছায়ায় আজ আমরা দাঁড়িয়ে আছি মুক্তি ঘোষণা পত্রে (Emancipation Proclamation) স্বাক্ষর করেছিলেন। যে লক্ষ লক্ষ নিগ্রো দাস ক্ষয়িষ্ণু অবিচারের আগুনে তাপ পীড়িত হয়ে পড়েছিল, এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ অনুজ্ঞা তাদের কাছে এসেছিল আশার আলোকবর্তিকা রূপে। এটি এসেছিল দাসত্বের সুদীর্ঘ অন্ধকার রাত্রির অবসানে আনন্দোজ্জ্বল সকালের মত।

কিন্তু একশ' বছর পরেও নিগ্রোরা স্বাধীন নয়। একশ' বছর পরেও নিগ্রোদের জীবন জাতিপৃথকীকরণের হাতকড়িতে এবং বৈষম্যের শৃঙ্খলে দারুণভাবে পঙ্গু হয়ে আছে। একশ' বছর পরেও আমেরিকার সমাজের এক কোণে নিগ্রোরা অবসন্ন হয়ে পড়ে আছে এবং আপন দেশে নির্বাসিতের জীবন যাপন করছে। তাই আমরা এসেছি এই লজ্জাজনক অবস্থাকে নাটকীয়ভাবে তুলে ধরতে।

এক অর্থে আমরা দেশের রাজধানীতে এসেছি একটি চেক্ ভাঙাতে। যখন প্রজাতন্ত্রের স্থপতিরা সংবিধানের এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের ঝক্‌ঝকে কথাগুলি লিখেছিলেন, তাঁরা একটি প্রমিসার নোটে স্বাক্ষর করেছিলেন, যার উত্তরাধিকারী হয়েছিল প্রতিটি আমেরিকান। এই নোটটি মানুষকে, হ্যাঁ—কালো মানুষ এবং সাদা মানুষ সবাইকে অবিচ্ছিন্ন জীবনের, স্বাধীনতার এবং সুখের অন্বেষণে চেষ্টান্বিত হওয়ার অধিকার দেবার অংগীকার।

এটি সুস্পষ্ট যে আমেরিকা অশ্বেতবর্ণ নাগরিকদের বেলায় এই প্রত্যর্থপত্র (প্রমিসরি নোট) কার্যকরী করার ক্ষেত্রে অবহেলাজনিত অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। এই পবিত্র দায়দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে আমেরিকা নিগ্রো জনগণকে একটি অচল চেক্ দিয়েছে, যেটি 'অর্থ-তহবিল অপ্রচুর' চিহ্নিত হয়ে ফেরত এসেছে।

কিন্তু ন্যায় বিচারের ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে গেছে—এটা আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি না জাতির সুযোগ-সুবিধার কোষাগারে অর্থের অপ্রাচুর্য আছে। তাই আমরা এই চেক্ ভাঙাতে এসেছি—যে চেক্ চাওয়া মাত্র আমাদের দেবে স্বাধীনতার সম্পদ এবং ন্যায়ের নিরাপত্তা।

আমরা এই পবিত্র স্থানে এসেছি বর্তমানের এই শঙ্কাজনক জরুরীত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে। বিলাসব্যসনে মেতে থেকে মেজাজ ঠাণ্ডা রাখার এবং সব কিছু ধীরে সুস্থে হবে এমন একটি ভাব নিয়ে স্নায়ুর উত্তেজনা কমানোর দাওয়াই খেয়ে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকার সময় এটা নয়। এখন গণতন্ত্রের অংগীকারকে

বাস্তবায়িত করার সময়। এখন জাতিপৃথকীকরণের অন্ধকার উপত্যকা থেকে জাতিগত ন্যায়বিচারের সূর্যকরোজ্জ্বল পথে উত্তরণের সময়। এখনই সময় আমাদের দেশকে জাতিগত অন্যায়ের চোরাবালি থেকে সৌভ্রাতৃত্বের শক্ত পাথুরে জমির উপর তুলে আনার। এখনই সময় ন্যায়বিচারকে ঈশ্বরের সকল সন্তানের জন্য বাস্তব করে তোলার।

আন্দোলনের জরুরীত্বকে উপেক্ষা করার এবং নিগ্রোদের সংকল্পকে লঘু করে দেখার ফল মারাত্মক হবে। নিগ্রোদের ন্যায্য অসন্তোষের এই ঘামঝরানো গ্রীষ্ম উবে যাবে না যাবৎ না স্বাধীনতা এবং সাম্যের জীবনদায়িনী শরৎ দেখা দিচ্ছে। ১৯৬৩ সাল সমাপ্তি নয়, বরং শুরু। যারা আশা করে আছে যে নিগ্রোদের ভেতর থেকে অসন্তোষের রুদ্ধ বাষ্প বেরিয়ে যাওয়ার দরকার ছিল এবং এখন তারা শান্ত হয়ে যাবে, তারা একটি কঠিন আঘাতে জেগে উঠবে যদি দেশ যথারীতি কাজকর্মে ফিরে যায়।

আমেরিকায় বিশ্রাম বা শান্তি কোনটাই আসবে না যতদিন না নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার দেওয়া হচ্ছে।

যতদিন না ন্যায়ের উজ্জ্বল দিনের আবির্ভাব হচ্ছে, ততদিন আমাদের জাতির ভিত্তিকে কাঁপিয়ে দেওয়ার জন্য বিদ্রোহের ঘূর্ণিঝড় বয়ে যাবে।

যারা ন্যায়ের প্রাসাদের উষ্ণ দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে আছে, আমাদের সেই সব লোককে আমার কিছু বলার আছে। আমাদের ন্যায়-সংগত স্থান দখল করতে গিয়ে আমাদের কোন অন্যায় কাজ করে অপরাধী হওয়া চলবে না।

তিক্ততা এবং বিদ্বেষের পানীয়ের দ্বারা আমাদের তৃষ্ণা যেন আমরা না মেটাই। মর্যাদা এবং শৃঙ্খলার উচ্চ ভূমিতে দাঁড়িয়েই চিরকাল আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। আমাদের সৃজনধর্মী প্রতিবাদকে আমরা কখনও দৈহিক হিংসায় পর্যবসিত হতে দেবনা। বারবার আমরা আত্মিক শক্তির দ্বারা দৈহিক শক্তির মোকাবিলা করে মহিমায় উন্নীত হ'ব।

যে আশ্চর্য সংগ্রাম-মনস্কতা নিগ্রো সমাজকে আচ্ছন্ন করে আছে তা সমস্ত শ্বেতাঙ্গ মানুষদের অবিশ্বাস করার দিকে আমাদের চালিত করতে দেবে না, কারণ আজ এখানে আমাদের অনেক শ্বেতাঙ্গ ভাইয়ের উপস্থিতি এটাই প্রমাণ করে যে তাঁদের এই উপলব্ধি হয়েছে যে তাঁদের ভাগ্য আমাদের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত এবং তাঁরা এও উপলব্ধি করেছেন যে তাঁদের স্বাধীনতা আমাদের স্বাধীনতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম নিশ্চয় চালিয়ে নেবে একটি দ্বি-জাতীয় সৈন্যবাহিনী। আমরা একাকী চলতে পারি না।

এবং আমরা যখন চলতে থাকব, আমরা এই শপথ নেব যে আমরা সর্বদা এগিয়ে যাব। আমরা পিছন ফিরতে পারি না. এমন লোক আছে যারা নাগরিক অধিকার অনুরাগীদের প্রশ্ন করে, "তোমরা কখন সন্তুষ্ট হবে?" আমরা কখনও

সন্তুষ্ট হ'ব না যতক্ষণ পর্যন্ত নিগ্রো মানুষ পুলিশী বর্বরতার অকথ্য শিকার থাকছে।

আমরা কখনও সন্তুষ্ট হতে পারি না যতক্ষণ নিদারুণ পথশ্রমে শ্রান্তক্লান্ত আমরা রাজপথের হোটেলে বা সহরের হোটেলে রাত্রি যাপনের অধিকার না পাচ্ছি। আমরা সন্তুষ্ট হতে পারি না যতদিন পর্যন্ত নিগ্রোদের যাতায়াতের অধিকার সীমাবদ্ধ থাকবে ছোট ঘেটোর থেকে বড় ঘেটোর মধ্যে।

আমরা কখনও সন্তুষ্ট হতে পারি না যতক্ষণ পর্যন্ত "কেবল শ্বেতাঙ্গদের জন্য"—এ'ধরনের স্মারকচিহ্নের দ্বারা আমাদের সন্তানদের আত্মবোধ ক্ষুণ্ণ করা হতে থাকবে, তাদের আত্মসম্মান কেড়ে নেওয়া হবে। আমরা সন্তুষ্ট হতে পারি না যত দিন পর্যন্ত মিসিসিপির নিগ্রোদের ভোটাধিকার থাকবে না এবং নিউ-ইয়র্কে'র নিগ্রোদের এই বিশ্বাস থেকে যাবে যে তাদের ভোট দেওয়ার মত এমন কিছু নেই। না, আমরা সন্তুষ্ট নই, এবং আমরা সন্তুষ্ট হতে পারি না যতক্ষণ পর্যন্ত না ন্যায়-বিচার জলের ধারার মত নেমে আসছে এবং ন্যায়পরায়ণতা খর-স্রোতা স্রোতস্বিনীর মত বয়ে চলেছে।

এটা আমার অজানা নয় যে আমাদের কেউ এসেছেন অনেক দুঃখদুর্দশার মধ্য থেকে, কেউ কেউ সদ্য ছাড়া পেয়ে এসেছেন কয়েদখানার সংকীর্ণ কক্ষ থেকে। কেউ কেউ এমন এলাকা থেকে এসেছেন যেখানে স্বাধীনতার অভীপ্সার জন্য নির্যাতনের ঘূর্ণি তাঁদের বিধ্বস্ত করে দিয়েছে এবং পুলিশী বর্বরতার ঘূর্ণিবার্তা তাঁদের করেছে বিহ্বল, বিপর্যস্ত। সৃজনধর্মী দুঃখবরণে আপনারা প্রবীণ। অনার্জিত দুঃখবরণ মানুষকে পরিশুদ্ধ করে এই বিশ্বাস নিয়ে আপনারা কাজ করে যান।

বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে এবং হবে—এই প্রত্যয় নিয়ে ফিরে যান মিসিসিপিতে ; ফিরে যান আলাবামায় ; ফিরে যান জর্জিয়ায় ; ফিরে যান লুইসিয়ানিয়ায় ; ফিরে যান উত্তরাঞ্চলের সহরগুলির বস্তিতে এবং ঘেটোতে। আমরা যেন হতাশার জলাভূমিতে গড়াগড়ি না দিই।

তাই, বন্ধুগণ, আমি আপনাদের বলছি যে যদিও আমাদের আজকের এবং আগামী দিনের বাধাবিপত্তির সামনাসামনি হতে হবে, তথাপি আমার একটি স্বপ্ন আছে। এই স্বপ্ন আমেরিকার স্বপ্নের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত। তা হচ্ছে এক-দিন এই জাতি জেগে উঠবে ; তা হচ্ছে আমরা এই সত্যকে স্বতঃসিদ্ধ বলে তুলে ধরব যে সব মানুষ জন্ম থেকেই সমান।

আমার স্বপ্ন—এক দিন জর্জিয়ার লাল পাহাড়ের উপর বিগতদিনের ক্রীতদাস-দের সন্তানেরা এবং ক্রীতদাসদের মালিকদের সন্তানেরা একসঙ্গে ভাই ভাই হয়ে এক টেবিলের চারদিকে উপবেশন করবে।

আমার স্বপ্ন—একদিন এমনকি যে মিসিসিপি রাজ্যে অবিচারের তপ্ত হাওয়া বইছে, বইছে অত্যাচারের তপ্ত হাওয়া, সেই মিসিসিপি স্বাধীনতা এবং ন্যায়ের

মরূদ্যানে রূপান্তরিত হবে।

আমার স্বপ্ন—আমার চারটি সন্তান একদিন একটি দেশে বাস করবে যেখানে তাদের গায়ের রঙ্ দিয়ে তাদের বিচার করা হবে না, হবে তাদের চারিত্রিক উপাদানের মাপকাঠিতে। আজকের দিনে এই আমার স্বপ্ন।

আমার স্বপ্ন—ওই আলাবামায় যেখানে রয়েছে হিংস্র জাতিবিদ্বেষীরা, যেখানকার গবর্ণর কথায় কথায় হস্তক্ষেপ করে এবং নাকচ করে দেয়, সেই আলাবামায় এক দিন ছোট ছোট কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট শ্বেতাঙ্গ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভাইবোনের মত হাত মেলাবে। আজকের দিনে এই আমার স্বপ্ন।

আমার স্বপ্ন—এক দিন প্রতিটি উপত্যকা উঁচু হয়ে উঠবে, প্রতিটি পাহাড়-পর্বত নীচু হয়ে পড়বে, অমসৃণ ভূমি মসৃণ হবে, সমস্ত আকাবাঁকা স্থান সরল হয়ে যাবে এবং প্রভুর মহিমার প্রকাশ হবে এবং একাত্মবোধে মিলিত হয়ে সকল মানুষ তা দেখবে।

এই আমাদের আশা। এই বিশ্বাস নিয়ে আমি দক্ষিণে ফিরে যাচ্ছি।

এই বিশ্বাস নিয়ে আমরা শুনতে পাব হতাশার পাহাড় থেকে ভেসে আসা একটি আশার প্রতিধ্বনি। এই বিশ্বাস নিয়ে বিবাদের কলকোলাহলকে আমরা ভ্রাতৃত্বের শ্রুতিমধুর সংগীতে রূপান্তরিত করতে পারব। আমরা জানি—আমরা এক দিন স্বাধীন হ'ব এবং এই বিশ্বাস নিয়ে আমরা পারব সকসংগে কাজ করতে, প্রার্থনা করতে, স্বাধীনতার জন্য এক সংগে উঠে দাঁড়াতে। এটিই হবে সেদিন যখন ঈশ্বরের সব সন্তান নতুন অর্থ-সংযোজিত গান গাইবে—"তুমিই আমার এই দেশ; স্বাধীনতার মাধুর্যময় দেশ; আমি তোমারই গান গাই; সেই দেশ যেখানে আমার পূর্বপুরুষেরা দেহ রেখেছে, যে-দেশ তীর্থযাত্রীদের গৌরব; প্রতিটি পর্বতের সানুদেশ থেকে স্বাধীনতার সংগীত ভেসে আসুক"—এবং আমেরিকাকে যদি একটি মহান জাতি হয়ে উঠতে হয়, এ'টি সত্য হয়ে উঠবেই।

অতএব স্বাধীনতার সংগীত ভেসে আসুক নিউ হ্যাম্পসায়ারের বিশাল পর্বত-শৃংগ থেকে।

স্বাধীনতার সংগীত ভেসে আসুক নিউইয়র্কে'র বৃহৎ পর্বতমালা থেকে।

স্বাধীনতার সংগীত ভেসে আসুক পেনসিলভেনিয়ার আলেঘেনি সমূহ থেকে।

স্বাধীনতার সংগীত ভেসে আসুক কোলোরাডোর বরফ ঢাকা পাহাড়পুঞ্জ থেকে।

স্বাধীনতার সংগীত ভেসে আসুক ক্যালিফোর্নিয়ার আকাবাঁকা ঢালু স্থান-গুলি থেকে।

শুধু তাই নয়।

স্বাধীনতার সংগীত ভেসে আসুক জর্জিয়ার স্টোন্ পর্বত থেকে।

স্বাধীনতার সংগীত ভেসে আসুক টেনেসির লুক্-আউট্ পর্বত থেকে।

স্বাধীনতার সংগীত ভেসে আসুক মিসিসিপির প্রতিটি পাহাড় এবং মাটির ঢিবি থেকে, ভেসে আসুক পর্বতের প্রতিটি সানুদেশ থেকে।

যখন আমরা স্বাধীনতার গীতধ্বনি বাজতে দেব, যখন সেই ধ্বনি ভেসে আসবে প্রতি ছোট-বড় গ্রাম থেকে, প্রতিটি রাজ্য এবং সহর থেকে, তখন সেই দিনটিকে দ্রুত এগিয়ে আনতে পারব, যেদিন ঈশ্বরের সকল সন্তানেরা—কৃষ্ণাংগ এবং শ্বেতাংগ, ইহুদী এবং অ-ইহুদী, ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্ট, সকলেই পরস্পরের সংগে হাত মেলাবে এবং বয়োঃবৃদ্ধ নিগ্রো অধ্যাত্মবাদীর রচিত কথায় গেয়ে উঠবে—অবশেষে আমরা স্বাধীন, অবশেষে আমরা স্বাধীন ; সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অবশেষে আমরা স্বাধীন হয়েছি।

পরিশিষ্ট

নোবেল পুরস্কার গ্রহণ উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতা।

(১০ই ডিসেম্বর, ১৯৬৪, বৃহস্পতিবার। নোবেল শান্তি পুরস্কার অনুষ্ঠান, অসলো, নরওয়ে)

আমি শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করছি এমন একটি মুহূর্তে যখন ২২ মিলিয়ন নিগ্রো আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে জাতিবৈষম্যগত অন্যায়ের দীর্ঘ রাত্রির অবসানের জন্য একটি সৃজনধর্মী সংগ্রামে লিপ্ত আছে। আমি এই পুরস্কার গ্রহণ করছি নাগরিক অধিকার আন্দোলনের পক্ষে যা দৃঢ়তার সঙ্গে এবং ঝুঁকি এবং বিপদের প্রতি মহিমাপূর্ণ অবজ্ঞা দেখিয়ে এগিয়ে চলেছে স্বাধীনতার রাজত্ব এবং ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য। আমি জানি যে মাত্র গতকাল আলাবামার বার্মিংহামে আমাদের ছেলেরা ভ্রাতৃত্বের আওয়াজ তুলছিল, এবং তার জবাবে তাদের উপর হোস্ পাইপ থেকে আগুন ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাদের দিকে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং এমনকি মৃত্যুর ঘটনাও ছিল। আমি জানি যে মাত্র গতকাল মিসিসিপির ফিলাডেলফিয়া সহরে যুবকেরা ভোটাধিকার দাবী করাতে তাদের উপর পৈশাচিক নির্যাতন চলেছিল, তাদের খুন করা হয়েছিল। এবং মাত্র গতকাল কেবল মিসিসিপি রাষ্ট্রেই চল্লিশটিরও বেশী প্রার্থনা গৃহ বোমা ছুঁড়ে বিধ্বস্ত করা হয়েছে অথবা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কেননা যারা জাতিপৃথকীকরণ নীতি মেনে নিতে রাজী নয় সেখানে তাদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। আমি জানি যে দারিদ্র্য আমার লোকদের নির্জীব করে দিচ্ছে, পিষে মারছে এবং তারা আর্থিক সিঁড়ির শেষ ধাপে বাঁধা পড়েছে।

সেজন্য আমার জিজ্ঞাসা এই পুরস্কার কেন একটি আন্দোলনকে দেওয়া হচ্ছে যা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং যা নিরলস সংগ্রাম চালাতে দায়বদ্ধ, এমন একটি আন্দোলনকে যেটি এখনও শান্তি এবং ভ্রাতৃত্ব জিতে নিতে পারেনি, যা হচ্ছে কিনা নোবেল পুরস্কারের সারমর্ম।

বিচার-বিবেচনার পর আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে এই যে পুরস্কার আমি সেই আন্দোলনের পক্ষে গ্রহণ করছি, তা হচ্ছে একটি পরম স্বীকৃতি যে আমাদের কালের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে অহিংসা— মানুষকে অত্যাচার এবং হিংসাকে জয় করতে হবে অত্যাচার এবং হিংসার আশ্রয় না নিয়ে। সভ্যতা এবং হিংসা হচ্ছে পরস্পর বিরোধী ধারণা। আমেরিকার নিগ্রোরা ভারতের জনগণের অনুসরণে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে যে অহিংসা নিস্ফল নিষ্ক্রিয়তা নয়, পরন্তু একটি প্রবল নৈতিক শক্তি যা সামাজিক রূপান্তরকে সম্ভব করে তোলে। এক দিন না এক দিন বিশ্বের সকল মানুষকে শান্তিতে বাস করার পথ খুঁজে বের করতে হবে এবং তদনুসারে এই অপেক্ষমান

মহাজাগতিক শোকসংগীতকে সৌভ্রাত্রের প্রার্থনা সংগীতে রূপান্তরিত করবে। এটা করতে হ'লে মানুষকে সকলপ্রকার মানবীয় সংঘর্ষ সম্পর্কে এমন একটি উপায় উদ্ভাবন করতে হবে যা প্রতিহিংসা, আক্রমণ এবং প্রতিশোধ বর্জন করবে। এই উপায়ের ভিত্তিতে আছে প্রেম।

যে সর্পিল পথ আলাবামার মণ্টগোমারীর থেকে অসলোতে এসে পৌঁছেছে তা এই সত্যের সাক্ষ্য বহন করে। এই পথ ধরেই নতুন মর্যাদাবোধের সন্ধানে চলেছে লক্ষ লক্ষ নিগ্রো। এই একই পথ সমস্ত আমেরিকাবাসীর জন্য প্রগতি এবং প্রত্যাশার নতুন যুগ উন্মোচিত করেছে। এই পথ ধরে আমরা পেয়েছি নাগরিক অধিকার বিল এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যতই অধিকতর সংখ্যক নিগ্রো এবং শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে তাদের সাধারণ সমস্যার সুরাহার জন্য মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে উঠবে, ততই এই পথ প্রসারিত এবং দীর্ঘায়িত হয়ে বিরাট এক রাজপথের আকার নেবে।

আমেরিকার প্রতি অনড় বিশ্বাস এবং মানবজাতির ভবিষ্যতের প্রতি দুঃসাহসপূর্ণ আস্থা নিয়ে আমি পুরস্কার গ্রহণ করছি। আমি এই আইডিয়াকে মেনে নিতে চাই না যে মানুষের বর্তমান স্বভাবের মধ্যে যা আছে তা মানুষকে নৈতিকভাবে অসমর্থ করে দিয়েছে সেই চিরন্তন 'যা উচিত' তাতে পৌঁছতে। ওই ঔচিত্যই চিরকাল মানুষের মুখোমুখি হয়ে আছে। আমি এই আইডিয়াকে মানতে চাই না যে মানুষ জীবননদীতে ভাসমান মালিকহীন টুকিটাকি জিনিস মাত্র, যে তার চারপাশের ঘটনা প্রবাহকে প্রভাবিত করতে পারে না। আমি এই মত মানতে পারি না যে মনুষ্যজাতি বৈষম্যবাদ এবং যুদ্ধের নক্ষত্রহীন গভীর রাতের অন্ধকারে এমন অসহায়ভাবে আটকে পড়েছে যে শান্তি এবং ভ্রাতৃত্বের উজ্জ্বল প্রভাত কখনও বাস্তব হয়ে উঠতে পারে না।

জাতির পর জাতি সর্পিল পথে জঙ্গীবাদের শিঁড়ি বেয়ে পারমানবিক বিনাশের প্রশস্ত কক্ষে নেমে আসবেই—এমন এমটি অসংযুক্ত ধারণা আমার কাছে আদৌ গ্রহণীয় নয়। আমি বিশ্বাস করি অস্ত্রহীন সত্য এবং শর্তহীন প্রেম হবে বাস্তবের শেষ কথা। এজন্য সাময়িকভাবে পরাজিত শুভশক্তি বিজয়ী অশুভ শক্তির চেয়ে বলবান। আমি বিশ্বাস করি আজকের দিনের মর্টারের বিস্ফোরণ এবং ছুটন্ত বুলেটের ফোঁসফোঁসানির মধ্যেও উজ্জ্বলতর আগামী দিনের আশা এখনও আছে। আমি বিশ্বাস করি আমাদের দেশের রক্তপ্লাবিত পথে পড়ে থাকা আহত ন্যায়-বিচারকে লজ্জার ধুলোবালি থেকে উঠিয়ে আনা যায় মনুষ্যসন্তানদের মধ্যে সার্বভৌম প্রতিষ্ঠানিক শক্তি হিসাবে বিরাজ করার জন্য। আমার বিশ্বাস করার মত এই ধৃষ্টতা আছে যে সব দেশের জনগণ শরীর রক্ষার্থে তিন বেলা খেতে পারবে, মানসিক উন্নতির জন্য পাবে শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং আত্মিক উন্নতির জন্য পাবে মর্যাদা, সমতা ও স্বাধীনতা। আমি বিশ্বাস করি আত্ম-কেন্দ্রিক লোকেরা যা ছিঁড়েছুঁড়ে ফেলেছে, অন্য-কেন্দ্রিক লোকেরা তা গড়ে তুলতে পারে। আমি এখনও বিশ্বাস করি যে এক দিন মানবজাতি ঈশ্বরের বেদীতে মাথা

নোয়াবে এবং যুদ্ধ ও রক্তপাতের ঊর্ধ্বে উঠে বিজয় গৌরবে ভূষিত হবে এবং অহিংস, পাপমুক্ত কল্যাণধর্মিতা দেশের বিধিনিয়ম বলে ঘোষিত হবে। "এবং সিংহ এবং মেষশাবক একসঙ্গে শুয়ে থাকবে এবং প্রতিটি মানুষ তার নিজের আঙ্গুরলতা এবং ডুমুর গাছের তলায় বসবে এবং কেউ ভীত হবে না।" আমি এখনও বিশ্বাস করি—আমরা করব জয়।

এই বিশ্বাস ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হতে আমাদের সাহস জোগাবে। আমরা যখন স্বাধীনতার মহানগরীর দিকে দ্রুতপদে এগিয়ে যেতে থাকব, তখন এই বিশ্বাস আমাদের ক্লান্তপদে শক্তি সঞ্চার করবে। আকাশে নীচু মেঘের আনাগোনায় আমাদের দিনগুলি যখন ক্লান্তিতে ভরে উঠবে, এবং যখন আমাদের রাতগুলি হাজার মধ্যরাতের চেয়েও বেশি অন্ধকারে কালো হয়ে উঠবে, তখন আমরা জানব যে একটি সাচ্চা সভ্যতার আসন্ন জন্মলগ্নে আমরা একটি সৃজনশীল প্রচণ্ড আলোড়নের মধ্যে বেঁচে আছি।

আজ আমি অসলোতে এসেছি একজন অছি হিসাবে, মানবতার সেবায় উৎসর্গীত হওয়ার প্রেরণা নিয়ে। আমি এই পুরস্কার গ্রহণ করছি এই সমস্ত মানুষের হয়ে, শান্তি এবং ভ্রাতৃত্বের প্রতি যাদের ভালবাসা আছে। আমি বলছি আমি এসেছি—একজন অছি হিসাবে, কারণ আমার অন্তরের গভীরে এই চেতনা আছে যে এই পুরস্কার আমার প্রতি ব্যক্তিগত সম্মাননার চেয়ে অনেক বেশি কিছু।

প্রত্যেকবার আমি যখন বিমানে উড়ে চলি, আমার মনে থাকে যে অনেক মানুষ মিলে একটি বিমানযাত্রার সাফল্যকে সম্ভব করে তোলে এবং তারা হচ্ছে চেনা বিমান চালকেরা এবং বিমান বন্দরের অজানা-অচেনা কর্মীরা।

অতএব আপনারা সম্মানিত করেছেন আমাদের উৎসর্গীকৃত প্রাণ সংগ্রামের চালকদের যারা কক্ষপথে উত্থিত স্বাধীনতা আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে বসে আছে। আবার বলছি—আপনারা সম্মান দেখিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার চীফ্ লুথুলির প্রতি, দেশের জনগণের সঙ্গে এবং জনগণের জন্য যাঁর সংগ্রামের মোকাবিলা করা হচ্ছে মানুষের প্রতি মানুষের অমানবিকতার চরম পাশবিক প্রকাশের দ্বারা। আপনারা সম্মান প্রদর্শন করছেন সেই সব বিমানক্ষেত্রের কর্মীদের প্রতি যাদের শ্রম এবং ত্যাগ ব্যতিরেকে স্বাধীনতার জেট্ বিমান কখনও মাটি ছেড়ে আকাশে উড়তে পারত না। এই সব ব্যক্তির অধিকাংশের নাম কখনও সংবাদপত্রের শিরোনামে দেখা যাবে না এবং তাদের নাম লিখিত হবে না 'হু ইজ্ হু' গ্রন্থে। তথাপি যখন বছরের পর বছর গড়িয়ে যাবে এবং যখন সত্যের প্রখর আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে আমাদের এই অত্যাশ্চর্য যুগ—পুরুষ এবং নারীরা জানবে এবং শিশুদের শেখানো হবে যে আমাদের আছে একটি সুন্দরতর দেশ, আছে উৎকৃষ্টতর জনগণ, আছে অধিকতর উদার এক সভ্যতা, কেননা ঈশ্বরের এই সব বিনম্র সন্তানেরা ন্যায়ের স্বার্থে স্বেচ্ছায় ত্যাগস্বীকারে তৎপর ছিল।

আমি মনে করি যে আলফ্রেড নোবেল বুঝে থাকবেন কি অর্থে আমি বলছি যে আমি এই পুরস্কার গ্রহণ করছি মূল্যবান পুরুষানুক্রমিক পুরোবস্তুর তত্ত্বাবধায়কের মনোভাব নিয়ে, যেন অছি হিসাবে ওইসব বস্তু তার জিম্মায় রাখছে প্রকৃত মালিকদের হয়ে—যে সব ব্যক্তির কাছে সুন্দর হচ্ছে সত্য এবং সত্য হচ্ছে সুন্দর এবং যাঁদের দৃষ্টিতে অকৃত্রিম সৌভ্রাতৃত্ব এবং শান্তি সোনা-রুপা-হীরার চেয়ে ঢের বেশি মূল্যবান।